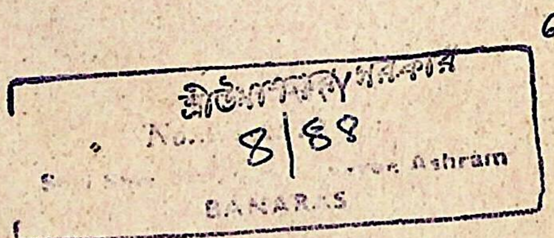
শ্রীশ্রীললিতা সখী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

(সখী-জীবন-কাহিনী)



শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

শ্রীশ্রীললিতা সখী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

(সখী-জীবন-কাহিনী)

শ্রী[illegible] সরকার

৫।৫৪

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

প্রকাশক
শ্রীনিমাইচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মাশিলা "ভক্তি-নিকেতন"
আন্দুল-মৌড়ী পোঃ, জেলা হাওড়া

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২। শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা

মূল্য ২॥০ টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড (বেলগাছিয়া)
কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত

৪|৪৪

গ্রন্থকারের নিবেদন

'ভক্তি' মাসিক পত্রিকার কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া বাধ্যবাধকতার মধ্যে আর আমাকে লেখনী চালনা করিতে হয় নাই। অবসরমত নিজের খেয়াল-খুসীতে যখন যাহা মনে হইয়াছে সময় সময় তাহা লিখিয়া রাখিয়াছি মাত্র। কিন্তু সেগুলি যে ছাপার হরফে পুস্তকাকারে বাহির হইয়া জনসমাজে প্রচার হইবে—এ ধারণা লিখিবার সময় আদৌ করিতে পারি নাই। অপর যে যাহাই মনে করুন না কেন, আমি আমার নিজের বিদ্যাবুদ্ধির খবর যতটা জানি, ততটা যে একমাত্র অন্তর্য্যামী ভিন্ন অন্য কেহ জানেন না—এ কথা আমি চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রাখিয়া হলফ্ করিয়া বলিতে পারি।

পূজনীয়া ললিতা সখী দিদির জীবনী আলোচনায় কেন প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার কারণ বিস্তৃতভাবেই প্রথম খণ্ডের নিবেদনে জানাইয়াছি। তথাপি আর একটু নিবেদন না জানাইয়া আমি তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। সেইজন্যই আমার আবার লেখনী ধারণ। সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইয়াও এমন একজন সমাজ-বিপ্লবী ভক্ত সাধিকার জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় অনেকে হয়তো আমাকে কিছু জিজ্ঞাসু হইয়াও চক্ষুলজ্জায় বলিতে পারিতেছেন না, সেইজন্য আমি নিজেই তাহার জবাব দিতেছি।

সাধুগুরু মুখে শুনিয়াছি—'ভালবাসা যোগ্যতা-অযোগ্যতার অপেক্ষা করে না।' আমি বাল্যকাল হইতেই দিদিকে ভালবাসি। (অবশ্য তখন দিদি হন নাই, দাদাই ছিলেন।) তারপর তাঁহার বেশ-পরিবর্ত্তন এবং কঠোর নিয়মনিষ্ঠার সহিত আচার-ব্যবহার ও আলাপ-আলোচনা সমস্তই আমার চক্ষে এক অপার্থিব আনন্দের ঢেউ তুলিয়া দিত। আজ কয়েক বৎসর প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সঙ্গ-সুখে বঞ্চিত হইলেও যখনই সুখ-সঙ্গের আনন্দকণা মনের কোণে উঁকি মারে তখনই আমি কেমন যেন বিহ্বল হইয়া যাই। ইচ্ছা হয় শতমুখে

সে আনন্দের বার্ত্তা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করি। তাই আমি যোগ্য না হইলেও দিদির জীবনী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া নিজের অতৃপ্ত বাসনা মিটাইতে চেষ্টা করিলাম। ভাল হউক, মন্দ হউক, সে বিচার পাঠকগণ করিবেন। আমি আলোচনা করিয়াই সন্তুষ্ট।

পাঠকগণের কি ধারণা জানি না। প্রথম খণ্ড জীবনী পাইয়াই দ্বিতীয় খণ্ড কবে প্রকাশ হইবে তাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে দ্বিতীয় খণ্ডের লেখা আরম্ভ করিলাম। করুণাময় শ্রীগুরুদেবের কৃপায় লেখা শেষও হইল, কিন্তু গ্রন্থমুদ্রণের অর্থ-সংগ্রহ ব্যাপারে আমি মহাসমস্যায় পড়িলাম। কাজেই গ্রন্থ প্রকাশ হয় হয় করিয়াও দীর্ঘদিন হইল না। দুই-দুইবার কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ছাপাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক দুর্ঘটনায় সে আশা সফল হইল না।

নিঃসম্বল অবস্থায় গ্রন্থ প্রকাশে হতাশ হইয়া বসিয়া ছিলাম। কি জানি রঙ্গিয়া প্রভুর কি ইচ্ছা, হঠাৎ একজন বিদেশী ভক্ত অযাচিতভাবে কিছু অর্থ-সাহায্য করিতে চাহিয়া গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমাকে তাগিদ দিতে লাগিলেন। এমন কি, কিছু সাহায্য পাঠাইয়াও দিলেন। এবার আর কোনদিকে না চাহিয়া গ্রন্থমুদ্রণ করিতে ছাপাখানায় দিলাম। বলা বাহুল্য, তিনি এইভাবে এ সময় সাহায্য না করিলে কোন রকমেই দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণ করিয়া এত শীঘ্র প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইত না।

দুঃখের বিষয়, সাহায্যকারী নিজ নাম ধাম প্রকাশ করিতে দিলেন না। যাহা হউক, মঙ্গলময় শ্রীভগবান নীরব দাতার সর্ব্ববিধ মঙ্গলবিধান করুন—ইহাই আমার সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা। অচিরস্থায়ী কাগজের উপর নশ্বর কালিতে দাতার নাম ধাম লিখিত না হইলেও সর্ব্বকারণকারণ আনন্দরসঘন বিগ্রহ শ্রীগৌর-গোবিন্দের অকালস্পৃষ্ট চরণ-কমল-পত্রে যে দাতার নাম অনন্তকালের জন্য অপার্থিব অক্ষরে অঙ্কিত রহিল, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

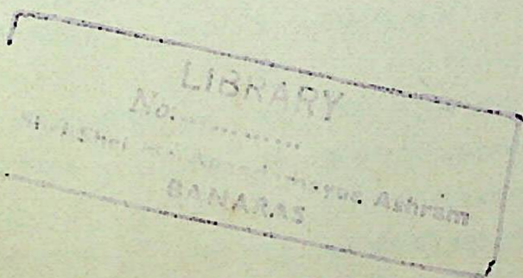
বৈচিত্র্যময় জগতে সকল বিষয়েই ভিন্নরুচির লোক দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

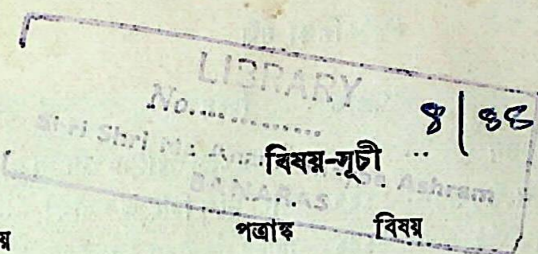
কেহ কার্য্য করিয়া নিজেকে সর্ব্বদা গোপন রাখিতে চাহেন, আবার কেহ অপরের কৃত-কর্ম্ম ছলে, বলে, কৌশলে নিজের ঘাড়ে লইয়া আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু আমার মত নির্লজ্জ কয়জন আছেন জানি না। আমি নিজের ঢাক নিজে পিটাইয়া গ্রন্থমধ্যে বহু স্থানে বহু ভাবে নিজের নাম জাহির করিয়াছি। এ অপরাধ ক্ষালনের জন্য যে কোন প্রকার শাস্তি আমি মাথা পাতিয়া লইবার অপেক্ষায় রহিলাম।

দ্বিতীয় খণ্ডের সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তব্য গ্রন্থমধ্যেই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্থানে বলা হইয়াছে। এখন আমার সকল প্রকার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে যদি গ্রন্থপাঠে পাঠকগণের কিঞ্চিৎমাত্রও আনন্দলাভের কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা হয়। অদোষদর্শী কৃপাসিন্ধু বৈষ্ণবগণের নিকট এবার আমার এইটুকুই নিবেদন। অলমিতি।

মাশিলা "ভক্তি-নিকেতন"
পোঃ আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া
১৩৬২। শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবদাসানুদাস
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য





বিষয়-সূচী



শ্রীশ্রীললিতা সখী

॥ শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ॥

শ্রীশ্রীললিতা সখী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

(সখী-জীবন-কাহিনী)

—ঃ গ্রন্থারম্ভ ঃ—

'শ্রীশ্রীললিতা সখী' পূর্ব্বাশ্রম-কাহিনী প্রকাশ করিয়া গ্রন্থশেষে নিবেদনে জানাইয়াছিলাম যে, পরবর্ত্তী কাহিনী প্রকাশে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি। আমার এই আবেদন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক স্থান হইতে সহযোগিতার স্বীকৃতি পাইলেও যে ভাবের ফললাভ আশা করিয়াছিলাম অনেক ক্ষেত্রেই তাহা পাই নাই; তারপর যে ভাবের সংযোগ স্থাপন করিতে পারিলে আমার অভীষ্ট লাভ হইতে পারিত, নিজ স্বাস্থ্যের অপটুতা ও পারিবারিক নানাপ্রকার গোলযোগ বশতঃ সকল ক্ষেত্রে তাহাও করিতে পারি নাই; তথাপি যেখানে যেটুকু সংগ্রহের সুযোগ হইয়াছে তাহাই সাধ্যমত সাজাইয়া যথাযথ স্থানে প্রকাশের চেষ্টা করিলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি তাহা মঙ্গলময় শ্রীভগবানই জানেন। আমার নিজ অযোগ্যতা বশতঃ কোথাও কিছু অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইলে অদোষদর্শী সহৃদয় পাঠকগণ কৃপা করিয়া তাহা সংশোধনপূর্ব্বক জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার ইচ্ছা রহিল।

আর একটা কথা—জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়া আমি একটু ভাবনায় পড়িয়াছি। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, জীবনচরিত-লেখকেরা অনেক সময় কতকগুলি সন তারিখ, কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার সমাবেশ বা কতকগুলি ভিত্তিহীন কিংবদন্তি সংগ্রহ করিয়া জীবনীর পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া দেন।

বর্ণিত ব্যক্তির জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সারাজীবনে কোনরূপ ক্রটী বিচ্যুতি ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে, এই ভাবনায় সারাজীবন যেন তিনি বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটা ভাল ভাল কাজই করিয়া গিয়াছেন এই ভাবের প্রবন্ধ দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করেন। আমি আমার বর্ণিত জীবনীতে সে ভাবের আলোচনা করিতে পারিলাম না, ঘটনার পারম্পর্য্য বজায় রাখিয়া ধারাবাহিকভাবে পর পর ঘটনা বর্ণন করাও সকল সময় সম্ভব হইল না। কেবল যতটুকু দেখিবার বা সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট শুনিবার সুযোগ হইয়াছে তাহারই কিছু কিছু বর্ণনের চেষ্টা করিলাম মাত্র। ভাষার পারিপাট্য বা লোকরঞ্জনযোগ্য কোন কিছু আমার লেখার মধ্যে নাই। তবু সত্য ঘটনা প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য বলিয়া যথেষ্ট সঙ্কোচের সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। বর্ণিত ব্যক্তিকে সিদ্ধ মহাপুরুষ, পুণ্যাত্মা, মহর্ষি বা মহাত্মা প্রভৃতি আখ্যাদান করিলেই যে যথেষ্ট বলা হয়, আমি তাহা স্বীকার করিতে পারি নাই। যথাযথ ঘটনা পাঠকগণের নিকট তুলিয়া ধরিলাম, যাহা করিতে হয় তাঁহারাই করিয়া লইবেন। সকল সময়ই আমি সকলের নিকট আমার ধৃষ্টতার জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি।

গোপালকৃষ্ণের সখীবেশ ধারণের পর আমরা আর তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ব্যবহার করিব না। এখন হইতে ললিতা সখী, সখীমা বা দিদি এই ভাবের পরিচয়ই দিব। দীন লেখক সখীজীকে 'দিদি' বলিয়াই সম্বোধন করিত। অনেক স্থলে হয়তো শুধু ঐ দিদি শব্দই ব্যবহার হইয়াছে, সে সকল স্থানেও ঐ ললিতা সখীকেই উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ঝাঁঝপেটায় অবস্থান

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণচরণদাস দেব অর্থাৎ বড় বাবাজী মহারাজ ৺পুরীধামে ঝাঁঝপেটা মঠে স্বগণ-সঙ্গে মহানন্দে বিরাজ করিতেছেন। ললিতা সখী ও অন্যান্য ভক্তগণ, যিনি যে জাতীয় সেবার অধিকার পাইয়াছেন তাহা করেন আর সুযোগমত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে নামসংকীর্ত্তন প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। নানাবিধ তত্ত্বকথায়, উপদেশে, কীর্ত্তনে বড় বাবাজী মহাশয় পুরীবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই কৃতার্থ করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে কটক, বালেশ্বর, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে ভক্তগণ বড় বাবাজী মহাশয়কে লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, বাবাজী মহাশয়ও বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া সঙ্গীগণ-সঙ্গে ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করিতে গমন করেন।

সকল সময় যদিও ললিতা দিদির মঠ ছাড়িয়া বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হয় না, তথাপি কোন রকমে সুযোগ সুবিধা করিতে পারিলেই পরমানন্দে ভক্তগণ-সঙ্গে বাহির হইয়া পড়েন। যখন মঠে থাকেন তখন বড় বাবাজী মহাশয়ের নির্দ্দেশমত সেবার কার্য্যাদি করেন বটে, কিন্তু তাঁহার অদর্শনজনিত বিরহে সর্ব্বদাই যেন কেমন ম্রিয়মাণ ভাব। এমন কি এক একবার এমনও হইত যে, যে কয়দিন বাবাজী মহাশয় মঠে না থাকিতেন সে কয়দিন দিদি অন্নজল গ্রহণ করিতেন না। বাবাজী মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া প্রসাদ গ্রহণের আদেশ দিলে তবেই দিদি প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এইভাবে কিছু দিন চলিবার পর বাবাজী মহাশয় অন্যত্র যাইবার সময় দিদির ভাবপুষ্টির জন্য যাঁহাদিগকে কাছে রাখিয়া যাইতেন ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বিষয় যথাসাধ্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে।

বড় বাবাজী মহাশয় স্বগণ-সঙ্গে এইভাবে নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা ও নামগুণলীলা কীর্ত্তন প্রসঙ্গ দ্বারা গৌরগোবিন্দলীলাকে প্রমূর্ত্ত করিয়া অসংখ্য

ভগবদ্‌বিমুখী, নাস্তিক, মদ্যপায়ী, অসচ্চরিত্র, মায়ামুগ্ধ জীবকে ধর্ম্মপথের পথিক করিয়া ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যমণ্ডিত অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ প্রকট থাকিয়া যে রসাল চরিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা 'চরিতসুধা' গ্রন্থে বিশেষভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ঝাঁঝপেটা মঠে অবস্থানকালে ললিতা দিদির বেশোচিত ভাবপুষ্টির জন্য বড় বাবাজী মহাশয় যাঁহাদিগকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কুসুম দিদি, কিশোরী দিদি, বিনোদিনী দিদি, দয়াল দাদা, অদ্বৈত দাদা প্রভৃতি কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য নবদ্বীপ দাদা ও গোবিন্দ দাদা প্রভৃতি যদিও সেই সময় মঠেই থাকেন, কিন্তু তাঁহারা সকল সময় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। বড় বাবাজী মহাশয়ের সহিত অধিকাংশ সময়ই তাঁহাদিগকে বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে হইত। কুসুম দিদি ও কিশোরী দিদি ললিতা দিদির মতই সখীবেশ ধারণ করিয়া সেবার কার্য্যে সহায়তা করিতেন। কিশোরী দিদি শ্রীশ্রীরাধাকান্তের নিয়মিত সেবা করিতেন আর কুসুম দিদি ললিতা দিদির সহিত ভোগাদি প্রস্তুতের ও অন্যান্য সেবার কার্য্যে সময়োচিত সহযোগিতা করিতেন। কিছুদিন পরে হরিদাস বাবাজী মহাশয় সখীবেশ ধারণ করিয়া বৃন্দাসখী নাম গ্রহণ করিয়া ইঁহাদের সহিত মিলিত হন। কিন্তু খুব বেশীদিন তিনি এই বেশে থাকিতে পারেন নাই। কোনও বিশেষ কারণে তাঁহাকে পুনরায় সংসারাশ্রমে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।

উৎসব-পর্ব্বাদির সময় শ্রীশ্রীরাধাকান্তের অপূর্ব্ব বেশাদি দর্শনে ভাবাবেশে দয়াল দাদা মাথায় কাপড় দিয়া এমন সুন্দর নৃত্য করিতেন যে, উৎসবপর্ব্ব যেন মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশ পাইত। দর্শকমণ্ডলী আনন্দে আত্মহারা হইয়া ঘন ঘন 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি করিতেন। ললিতা দিদিও ভাবাবেশে এক-একবার সময়োচিত পদকীর্ত্তনে সেই লীলারসকে আরও পুষ্ট করিয়া দিতেন। ইঁহাদের এই নৃত্যকীর্ত্তন কে দেখিল না-দেখিল সে দিকে আদৌ কাহারও লক্ষ্য থাকিত না। ইঁহারা ভাবাবেশে বাহ্যস্মৃতি বিস্মৃত হইয়াই নৃত্যকীর্ত্তন করিতেন।

বড় বাবাজী মহাশয় কখন কখন আড়ালে থাকিয়া এই মধুরাদপি মধুর ভাব আস্বাদনে পরমানন্দ উপভোগ করিতেন। অবসর সময় দিদি বা নগেন দাদা দয়াল দাদাকে ডাকিয়া "তোমার খুব কষ্ট হইয়াছে" বলিলে দয়াল দাদা বলিতেন, "ইহার (বড় বাবাজী মহাশয়ের) সুখের জন্যই আমার সব। ইনি যদি কণামাত্রও সুখ অনুভব করেন, আমি তার জন্য আমার এ ছাড় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারি। সামান্য নৃত্যকীর্ত্তন ক'রে কষ্ট হচ্ছে—এ কথা তোমরা কেন বলছ ?"

কিশোরী দিদির শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা-পারিপাট্য, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং সময়োচিত বেশাদি রচনানৈপুণ্য দর্শনে ললিতা দিদি তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সময় সময় দুইটি হাত ধরিয়া প্রেমগদগদ কণ্ঠে বলিতেন, "দিদি, তুমি সত্য সত্যই ব্রজে ব্রজরাজনন্দনের কুঞ্জসেবিকা ছিলে।"

কৃপা-শাসন

ঝাঁঝপেটা মঠের সেবা তখন ভিক্ষা দ্বারাই নির্ব্বাহ হইত। বড় বাবাজী মহাশয়ের নির্দ্দেশ ছিল—কোনরূপ মাসিক বন্ধানি (বৃত্তি) লওয়া হইবে না, যেদিন ভিক্ষায় যাহা কিছু মিলিবে তাহার দ্বারাই সেবার কার্য্য চলিবে। বেশী হইলেও কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা হইবে না। তখন মঠে এক বেলা অন্নভোগ হইত এবং রাত্রে কয়েকখানি রুটীভোগ লাগিত। এই ভোগের প্রসাদ দ্বারাই মঠবাসীগণকে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইত। কেহ যে বাহিরে কোথাও গিয়া প্রসাদ পাইয়া আসিবেন বা কাহারও নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু চাহিয়া লইবেন তাহা পারিতেন না। এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা ও শাসন ছিল বলিয়াই মনে হয়, তখনকার সেবক-সেবিকারা এক-একজন আদর্শ হইয়া ছিলেন। বহুদিন অদ্ভুত অদ্ভুত বহু ঘটনা ঘটিয়াছে, যথাস্থানে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইবেন। এখানে একদিনের একটি ঘটনা বলি। পাঠকগণ বড় বাবাজী মহাশয়ের শাসনের নমুনা দেখুন।—

একদিন অপরাহ্নে বড় বাবাজী মহাশয় ভক্তগণকে লইয়া ঝাঁঝপেটার এমন স্থানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন যে, সেখান হইতে রসুইঘর ও ভাণ্ডার-ঘর দুইটিই বেশ দেখা যায়। কিছু সময় কথোপকথন করিতে করিতে বড় বাবাজী মহাশয় যেন কেমন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং ঘন ঘন ভাণ্ডার-ঘরের দিকে চাহিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তগণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিছু সময় পরে একজন সেবককে বলিলেন, "ললিতাকে ডাক্ তো।" ভক্তটি ললিতা দিদিকে ডাকিয়া আনিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "ভাণ্ডার-ঘরে ঐ কলসীটায় কি আছে ললিতা? একটা ছোট ইঁদুর একবার ওর ওপরে উঠছে আবার নেমে যাচ্ছে কেন?"

ললিতা।—আজ্ঞে, ওটার মধ্যে কিছু ভিক্ষার চাল কালকের জন্যে রাখা হয়েছে। ওপরের ঢাকা খোলা ছিল, ইঁদুর ভিতরে ঢুকে খায় ব'লে আমি একটা সরা ওর মুখে চাপা দিয়ে রেখেছি। তাই আর ভিতরে যেতে না পেরে নেমে যাচ্ছে।

"হুঁ, বুঝেছি।"—এই বলিতে বলিতেই বাবাজী মহাশয়ের নয়নযুগল আরক্তিম হইয়া উঠিল, খুব রূঢ়স্বরে বলিলেন, "এই যদি করবে তবে আর ঘরবাড়ি ছেড়ে এসে এ ভাবে লোক হাসানো কেন? ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে যাও না?"

দয়াল দাদা।—আজ ভিক্ষায় কিছু চাল বেশী পেয়েছিলাম তাই আজকের মত নিয়ে কালকের জন্যে কিছু রেখে দিয়েছি, তাতে দিদির কোন দোষ নেই—আমিই রেখেছি।

বাবাজী।—(ক্রোধভরে ধমক দিয়া) থাক্, তোমাকে আর সাফাই গাইতে হবে না, যত সব গাঁটকাটার দল। আচ্ছা, যিনি আজ জুটিয়ে দিয়েছেন তিনি যে কালও দিতে পারেন এ বিশ্বাসটুকুও নেই? এই জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বৈরাগী হয়েছ?"

সঙ্গে সঙ্গে নিজে উঠিয়া একটা চালা কাঠ দিয়া কলসীটাকে ভাঙিয়া দিয়া

বলিলেন, "যেদিন যা ভিক্ষায় পাবে বা মঠে অযাচিতভাবে উপস্থিত হবে তার কিছু কেউ জমা ক'রে রাখতে পারবে না। যে এর অন্যথা করবে তার এখানে স্থান নেই, সে যেখানে খুশী চ'লে যেতে পারে, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।" ললিতা দিদির দিকে চাহিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, ললিতা! বল দেখি, ইঁদুরটা ঐভাবে বার বার হতাশ হ'য়ে ফিরে যাওয়ায় ওর মনে কি কষ্ট হয় নি? তোমরাই না বল—'কায়মনে প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দিবে।' তারপর ঐ চালগুলি কি তোমার জমিদারীর? ও তো ভিক্ষার চাল, ওতে তোমারও যেমন অধিকার ওরও ঠিক তেম্‌নি অধিকার আছে। ওকে তুমি ওর অধিকার থেকে বঞ্চিত কর কোন্ সাহসে? বুঝেছি, মঠবাসী তোমাদের ভিতর কলি প্রবেশ করেছে। আজ সকলে উপবাসী থেকে সারা-রাত নাম করবে, ভোরে নাম করতে করতে সমুদ্রে গিয়ে স্নান ক'রে সিদ্ধ বকুল, গম্ভীরা ও জগন্নাথ দর্শন এবং দণ্ডবৎ ক'রে শ্রীমন্দিরের বাইরে তিনবার প্রদক্ষিণ ক'রে ও সাষ্টাঙ্গ দিয়ে এসে তবে প্রসাদ পাবে।"

উপস্থিত ভক্তগণ নির্ব্বাক নিস্পন্দ। বাবাজী মহাশয়ের এরূপ কঠোর শাস্তির কথা শুনিয়াও কেহ কোন মন্তব্য করিতে সাহস পাইল না। ললিতা দিদি ও দয়াল দাদা বাবাজী মহাশয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু বাবাজী মহাশয় অচল অটল। "যাও, আদেশমত কাজ কর" বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তগণের সহিত কথা বলিতে চলিয়া গেলেন।

বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ কঠোর আদেশের কথা শুনিয়া হয়তো আমরা তাঁহাকে নির্ম্মম নিষ্ঠুর মনে করিব; কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই কৃপা-শাসনের কঠোরতার মধ্যেও বাবাজী মহাশয়ের হৃদয়ের মাধুর্য্য ও স্নেহবিগলিত কণ্ঠস্বরের কোমল প্রতিধ্বনি অহরহই ধ্বনিত হইতেছে।

অদ্বৈত দাদার প্রতি

৺পুরীধামে আউলিয়া মঠে রঘুনাথ দাদা ও অদ্বৈত দাদা এক সঙ্গে থাকেন এবং সেবার কার্য্যাদি করেন। একদিন সকালে অদ্বৈত দাদা ঝাঁঝপেটায় আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন যে, রঘুনাথ দাদা প্রস্রাব করিয়া কুল্লা না করিয়াই ভোগের ঘরে গিয়াছেন। বাবাজী মহাশয় শুনিলেন কিন্তু রঘুনাথ দাদার সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া অদ্বৈত দাদার দিকে চাহিয়া একটু রূঢ় স্বরেই বলিলেন, "এখনই মঠ থেকে বের হও, চার ধাম ক'রে তবে আমার কাছে আস্‌বে।"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে বসিয়া কথা-প্রসঙ্গে অদ্বৈত দাদা আমাকে বলিয়াছিলেন, "ভাই দীনেশ! চার ধাম করা কাকে বলে আমি তখন তাও জান্‌তাম না। ঘর ছেড়ে এসে যাঁর চরণে আশ্রয় পেয়েছি সেই অধমতারণ পতিতপাবন বাবাজী মহাশয় ছাড়া আর যে জগতে কোথাও কিছু আছে বা থাক্‌তে পারে, সে জ্ঞানও আমার তখন ছিল না। দিদি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি সজলনয়নে তাঁর দিকে চাইলাম যদি তিনি কোন প্রতিকার করেন এই আশায়। কিন্তু তিনিও মুখ নীচু ক'রে চ'লে গেলেন। তখন আমি কি করব ভেবে ঠিক করতে পারছিলুম না—ইতস্ততঃ করছি দেখে বাবাজী মহাশয় খুব দৃঢ়স্বরে আঙ্গুল দিয়ে বাইরের দরজা দেখিয়ে বললেন—'যাও।' কি আর করব, আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ডবৎ ক'রে মঠ থেকে বাইরে বের হ'য়ে গেলাম।

"বের তো হলাম, এখন যাই কোথায়? ভাবতে ভাবতে 'নারাণছাতায়' গিয়ে সেখানকার মহান্ত মহারাজকে সমস্ত বল্‌লাম। তিনি সব শুনে বল্‌লেন, 'ওপরের ঘরে গিয়ে ব'সে ব'সে নাম কর, পরে যা হবার হবে।' আমি তাঁর আদেশমত মালা ঝোলা হাতে ক'রে ওপরে উঠে রাস্তার দিকে জানলার কাছে

ব'সে নাম করতে লাগলাম। কিছু সময় পরে দেখি, বাবাজী মহাশয় দ্রুতপদে 'নারাণছাতা'র দিকেই আসছেন। আমি তো ভয়ে জড়সড়। তিনি সেখানে এসে বাইরে থেকেই মহান্ত মহারাজকে ডেকে বললেন—'আমার সম্পর্কিত কেউ এখানে এলে যেন ঠাঁই না পায়।' শুধু এই কথা কটি ব'লেই তিনি চ'লে গেলেন।

"হরিবোল হরি। আমি ওপরে ব'সে আদেশ শুনেছি, কিন্তু মহান্ত মহারাজ কি করবেন তখনও বুঝতে পারি নি। তবে বুঝতে বেশী বিলম্ব হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গেই মহান্ত মহারাজ আমাকে ডেকে সেখান থেকে চ'লে যেতে আদেশ করলেন। আমিও ধীরে ধীরে দণ্ডবৎ ক'রে সেখান থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। দুঃখে কি কিসে বলতে পারি না, দুটো চোখ দিয়ে অবিরত জল গড়াতে লাগল, জগৎটা যেন আমার কাছে কেমন শূন্য বোধ হ'তে লাগল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এখন কোথায় যাই!

"কতক্ষণ এভাবে গিয়েছে জানি না, একটু জ্ঞান হ'তেই দেখি, আমি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরাভিমুখে চলেছি। ক্রমে সিংহ-দরজায় উপস্থিত হ'য়ে বাহির থেকেই পতিতপাবন দর্শন ক'রে, দরজার দক্ষিণ দিকে এক সাধু ধুনি জালিয়ে ব'সে ছিলেন, তাঁর নিকট ব'সে একে একে আমার সমস্ত কথা তাঁকে বললাম। তিনি অভয় দিয়ে বললেন—'তুম্ হিঁয়াপর রহো, রামজী সব ঠিক কর্ দেগা।' আমি সাধুর অভয়বাণী শুনে নিরাশ প্রাণে যেন একটু ভরসা পেলাম। আদেশমত ধুনির কাছেই ব'সে পড়লাম। তখন শীতকাল, আমার সম্বলের ভিতর কৌপীন বহির্ব্বাস, এ ছাড়া আর কিছু নেই। শীতে কষ্ট হচ্ছে দেখে সাধু তাঁর কম্বলখানি আমার গায়ে চাপা দিয়ে দিলেন। একে ধুনির গরম, তাতে কম্বল গায়, কাজেই বেশ একটু আরাম এল, না জানি কখন আমি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম।"

এদিকে অদ্বৈত দাদাকে বিদায় দিয়া বড় বাবাজী মহাশয় কেমন যেন গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথাও বলিতেছেন না।

শ্রীশ্রীরাধাকান্তের দ্বিপ্রহরের ভোগারতির পর ললিতা দিদি, কুসুম দিদি, গোবিন্দ দাদা, দয়াল দাদা প্রভৃতি সকলেই প্রসাদ পাইবার জন্য বহু কাকুতি-মিনতি করিলেন; কিন্তু তিনি প্রসাদ পাইলেন না, প্রসাদের সম্মুখে দণ্ডবৎ করিয়া এক কণিকা মুখে দিয়া চলিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, মঠে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সন্ধ্যারতি শেষ হইয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাদেবীর আরতিকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। বড় বাবাজী মহাশয় গোবিন্দ দাদাকে কাছে ডাকিয়া অদ্বৈত দাদার সন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। আদেশমত গোবিন্দ দাদা নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও দেখা না পাইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির দেখিয়া মঠে ফিরিবেন মনে করিয়া সিংহ-দরজার পাশে যাইতেই সাধুর নিকট অদ্বৈত দাদাকে শায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। গোবিন্দ দাদা সেখানে দাঁড়াইতেই সাধু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ক্যা তলপ্ হুয়া?" গোবিন্দ দাদা বলিলেন, "জি, শ্রীগুরুমহারাজ বহুৎ উদ্‌বিগ্ন হুয়া, অনুমতি দিজিয়ে।"

সাধু তখন অদ্বৈত দাদাকে সম্বোধন করিয়া গোবিন্দ দাদার সহিত যাইবার আদেশ করিলেন। সাধুর আদেশ শুনিয়া অদ্বৈত দাদা উঠিয়া বসিলে গোবিন্দ দাদা আবেগ ভরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই অদ্বৈত! মঠে চল্, বাবাজী মহাশয় যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন। তুই চ'লে আসবার পর থেকে এখন পর্যন্ত এক বিন্দু জলও মুখে দেন নি। চল্, ভাই চল।" অদ্বৈত দাদা সাধুকে প্রণাম করিয়া গোবিন্দ দাদার সঙ্গে ঝাঁঝপেটা মাঠের দিকে রওনা দিলেন।

মঠে বড় বাবাজী মহাশয় আরতিকীর্ত্তন শেষ করিয়া দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আউলিয়া মঠ হইতে রঘুনাথ দাদাকেও ডাকা হইয়াছিল, তিনি দরজার ভিতরে ছিলেন। যথাসময়ে অদ্বৈত দাদা উপস্থিত হইয়া উভয়কে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দেহ কাঁপিতেছে এবং দুইটি চোখে অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে।

বড় বাবাজী মহাশয় "জয় নিতাই" ধ্বনি করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অদ্বৈত দাদার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অদ্বৈত! রঘুনাথের কাছে তোমার অপরাধ হয়েছে। ও তোমার বড় গুরুভাই; ওর আচরণে কোনরূপ কটাক্ষ করা তোমার উচিত হয় নি। যাও, ওর চরণ ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা চাও।"

অদ্বৈত দাদা রঘুনাথ দাদাকে প্রণাম করিতে গেলে রঘুনাথ দাদা দুইটি হাত ধরিয়া কোলে টানিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "না ভাই! আমার কাছে তোমার কোন অপরাধ নেই, বরং আমিই সদাচার লঙ্ঘন ক'রে অপরাধী হয়েছি, আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।"

এই ভাবে উভয়ের দৈন্যোক্তিতে ও ক্রন্দনাবেশে বেশ একটু সময় অতিবাহিত হইল। বাবাজী মহাশয় সকলই দেখিতে ও শুনিতে ছিলেন। এইবার—"খুব হয়েছে, মর্য্যাদা রক্ষায় যেন হুঁশ থাকে" এই কথা বলিয়া উভয়কে প্রসাদ পাইবার আদেশ দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। তখন ললিতা দিদি ছুটিয়া আসিয়া "এস ভাই" বলিয়া দুইজনকেই ভিতরে লইয়া গিয়া নানা প্রকার মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া প্রসাদ পাওয়াইলেন। বলা বাহুল্য দুইজনের জন্যই সকালের ভোগের পারস ধরা ছিল।

বলিতে সঙ্কোচ আসে। আজ আমরা মর্য্যাদাবোধ যেন একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছি। গুরুভাই তো দূরের কথা, সময় সময় সাক্ষাৎ শ্রীগুরুদেবের ক্রিয়ামুদ্রারও সমালোচনা করিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করি না। শাসন মানা দূরে থাকুক, গুরুজনদিগকে ছলে বলে কৌশলে জব্দ করিয়া খুবই একটা বাহাদুরি দেখাই। অনেক সময় শ্রীগুরুদেবকে "আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না," "আপনার ভুল হচ্ছে" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিতেও মনে দ্বিধা আসে না। "মর্য্যাদা লঙ্ঘনে হয় নরক গমন"—এ শাসনবাক্য মুখে বলি, কিন্তু কাজে করি না। পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন, আমরা কি করিতেছি আর ইঁহারা কি ভাবে অবনতমস্তকে গুরুবর্গের কঠোর শাসন অপার কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিজেরাও ধন্য হইয়াছেন, অপরকেও মহান্ আদর্শ গ্রহণের সুযোগ দিয়া ধন্য করিয়াছেন।

দিদির সেবাসুখ-লালসা

পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে পাঠকগণ দেখিয়াছেন, দেবসেবা ও জীবসেবা দুইটিই ছিল গোপালকৃষ্ণের প্রাণকোটীপ্রিয়। আজ সখীবেশ ধারণ করিয়া সেই সেবাপ্রবৃত্তি যেন সহস্রমুখী হইয়া নব নব ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিদির মধ্যে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। কি ভাবে কাহার সেবা করিতে হয়, কোন্ ধারা ধরিয়া সেবা করিলে সেব্যের সুখ হইবে অতি সহজেই অল্পসময় মধ্যে দিদি তাহা বুঝিতে পারিতেন। নিজের সকল প্রকার অসুবিধা বা পরিশ্রম ভুলিয়া সেবা করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন। পুরীধামে আমরা এখনও অনেকের মুখে শুনিতে পাই—"ললিতা মা ছিলেন মূর্ত্তিমতী সেবাবিগ্রহ।"

বড় বাবাজী মহাশয়ের পদাশ্রিত আমাদের শ্রদ্ধেয় নগেন দাদা একদিন ঝাঁঝপেটায় বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে স্নানবেদী দেখাইয়া আমাদের বলেন, "এই স্নান-বেদীর ধারে ব'সেই দিদি একদিন বলেছিলেন—'দাদা! সাধু, গুরু ও শাস্ত্র-মুখে শুন্‌তে পাই—সেবার তাৎপর্য্য সর্ব্বতোভাবে সেব্যের প্রীতিবিধান করা। তোমরা আমাকে এই কৃপা কর, আমি যেন আত্মসুখী না হ'য়ে অকপটে সকলের সেবা করতে পারি। অন্য কোন ভজনসাধন আমার মত দুর্ব্বলচিত্তের জন্য নয়। আমি জানি—সেবাই আমার ধর্ম্ম, সেবাই আমার কর্ম্ম। চিরদিন সেবিকা হ'য়ে থাকব—এইটিই আমার মনের বাসনা। সেবাসুখে বঞ্চিতা হ'য়ে এক মুহূর্ত্তও আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না।"

নগেন দাদা এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে চোখের জলে বুক মুখ ভাসাইয়া বলিলেন, "ভাই রে, এমন কথা কেউ কখনও বল্‌তে পেরেছে কি? আমরা এখন শ্রীগুরুদেবের করুণায় সামান্য কিছু সেবার অধিকার লাভ করতে পারলেও কতক্ষণে তা থেকে অবসর পাব অথবা কি উপায়ে তার মধ্যেও সময় ক'রে নিয়ে নিজের সুখসুবিধা ভোগ করব তারই চেষ্টায় কত না ফিকির-ফন্দি খুঁজে বেড়াই! হায় রে দুর্দ্দৈব।"

নবদ্বীপ সমাজবাড়ীতে ললিতা দিদি ঠাকুরের অষ্টকালীন সেবার ব্যবস্থা করিয়া যে সকল সেবাইত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সেবা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে একদিন বলিয়াছিলেন—"বহু ভাগ্যে যে সেবা পাওয়া যায় না, শ্রীগুরুদেবের অযাচিত করুণায় তোমাদের তা সহজলভ্য হয়েছে। হেলায় হারিও না। আমি স্বেচ্ছায় কোনরূপ চেষ্টা ক'রে এ সব সেবা প্রতিষ্ঠা করি নি, এঁরা নিজগুণে দয়া ক'রে এখানে এসে প্রকাশ হয়েছেন এবং তোমাদের হাতে একটু সেবা গ্রহণ ক'রে তোমাদের ধন্য করছেন। মনে রেখো, আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় এই সেবা তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি, কোনরূপ কপটতা বা অবহেলা করলে সত্য সত্যই আমার প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা লাগ্‌বে আর তোমরাও এঁদের অযাচিত করুণা লাভে বঞ্চিত হবে।"

তারপর ধীরে ধীরে একটির পর একটি শ্রীবিগ্রহ কি ভাবে কখন সমাজ-বাড়ীতে আসিয়া প্রকাশ পাইয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে সেবকগণকে বলিতে লাগিলেন। একদিনের জন্যও নবদ্বীপ সমাজবাড়ীতে উপস্থিত থাকিয়া দিদির সেবাপারিপাট্য দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন সেবা কাহাকে বলে। আমরা সর্ব্বদাই আত্মসুখাভিলাষী, ইন্দ্রিয়সেবাতৎপর, আমরা এ-জাতীয় সেবাসুখের সন্ধান কি ভাবে—কোথা হইতে পাইব?

অন্যান্য দাদা ও দিদিদের লইয়া ললিতা দিদি বড় বাবাজী মহাশয়ের সেবা কি ভাবে করিতেন তাহার বিস্তৃত বিবরণী সংগ্রহ করা এক দুরূহ ব্যাপার। তবে দিদি নিজে একদিনের অষ্টকালীয় সেবার যে বিবরণ 'শ্রীশ্রীলবঙ্গমঞ্জরী-গুটিকা' গ্রন্থে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আমরা পাঠ করিতে পাঠকগণকে অনুরোধ করি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ললিতা দিদি যাহাকে যে ভাবে সেবা করিতে হয় তাহা অতি সন্তর্পণেই করিতেন। মঠে নবাগত ছেলেরা বাল্যস্বভাববশে কোন প্রকার বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া ফেলিলে দিদি মুখে খুব কঠোর ভাব দেখাইয়া তাহাদিগকে শাসন করিতেন; কিন্তু অন্তরে অন্তরে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার সহ

তাহাদিগের আচরণের ত্রুটি দেখাইয়া যাহাতে উহা সংশোধিত হয় সর্ব্বদাই সে বিষয়ে যত্ন লইতেন। দিদির এই প্রকার ব্যবহারের সুযোগ লইয়া কেহ পুনরায় কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাব প্রকাশ করিলে মঠের অন্যান্য গুরুভাই-ভগ্নীরা দিদির উপরই দোষ চাপাইয়া বলিতেন, "দিদি! তোমার আস্কারা পেয়েই তো ওরা এতদূর বেড়ে উঠেছে, তুমি ওদের দূর ক'রে দাও না কেন?" উত্তরে দিদি তাঁহার স্বভাব-মধুর হাসি হাসিয়া বলিতেন, "যিনি আকর্ষণ ক'রে ওদের এখানে এনেছেন, কৃপা-পরশ দিয়ে কৃতার্থ করেছেন, তিনিই সব দুর্দ্দৈব ঘুচিয়ে খাঁটি ক'রে নেবেন। আমি ওদের কি করব? কর্ত্তা বলেছেন—'আমার ছেলেগুলোকে একটু দেখো।' তাই আমি ওদের নিয়ে আছি। ওগো, আমি যে তাঁর দাসী, তাই তাঁর আদেশ পালন ক'রে যাচ্ছি মাত্র।" বিশেষ ভাবে উহাদের সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে বলিতেন, "ভয় নেই ভাই! ভয় নেই, যখন একবার পরশমণির পরশ ওরা পেয়েছে, তখন সোনা ওরা হ'য়ে গেছেই, উপরের ময়লা মাটি দূর হ'তে যা একটু দেরি।"

হিসাব দিবে কাকে?

প্রথম দর্শন হইতেই নবদ্বীপ দাদাকে ললিতা দিদি কি ভাবে দেখিতেন তাহার কিছু কিছু বর্ণনা পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে দিয়াছি। দিদির কথায়, দিদির লেখায়, দিদির ব্যবহারে নবদ্বীপ দাদাই যে তাঁহার সব কিছু ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

একদিন নবদ্বীপ দাদা বড় বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে দিদির হাতে কিছু টাকা দিয়া বলিয়া গেলেন, "আবশ্যকমত খরচ করবে।" দুই-তিন দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, দিদি একখানা কাগজে কি যেন লিখিতেছেন। নবদ্বীপ দাদাকে দেখিয়া যেমন কাগজখানি লুকাইতে যাইবেন অমনি তিনি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কি লিখ্‌ছ?" দিদি বলিলেন,

"আপনি যে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন তা কি ভাবে কত খরচ করা হয়েছে তাই লিখে রাখছি।"

নবদ্বীপ।—কে দেখ্‌বে ? কাকে হিসাব দেখাবে ?

দিদি নির্ব্বাক। নবদ্বীপ দাদার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন বলিবার ইচ্ছা করিয়াও প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। নবদ্বীপ দাদা দিদির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "এটা রাধাকান্তের সংসার, ভয় নেই, তিনি তোমার হিসাব দেখ্‌তে চাইবেন না। সঞ্চয়প্রবৃত্তি মনে না রেখে যেমন আসবে তেমন খরচ করতে থাক, কোন চিন্তা নেই, তিনি আবশ্যকমত যোগান দিবেনই। মনে রেখো, এ তোমার আমার মত সীমাবদ্ধ তহবিল নয়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি শোন—

"আমাদের এই মঠে যে কুয়াটি আছে তাতে দড়ি ফেলে মেপে দেখলে তিন হাত কি চার হাত জল আছে দেখতে পাবে। আর ওতে খুব বেশী হ'লে ষাট কি সত্তর ঘড়া জল হবে। কিন্তু সমস্ত দিনে পাঁচ-ছ'শো ঘড়া জল কুয়া থেকে উঠ্‌ছে, তবু সেই তিন-চার হাত জলই আছে। ইচ্ছামত খরচ হচ্ছে, কেউই বঞ্চিত হচ্ছে না, অথচ কুয়াটি পূর্ণই আছে। এর কারণ কি জান ? একজন খরচের সঙ্গে সঙ্গে জল যোগান্ দিচ্ছেন, তাই অভাব হচ্ছে না। এও ঐ মতই জানবে। তাঁর সংসার, আমরা তাঁর সেবক সেবিকা, যখন যা দরকার তিনি বুঝ্‌বেন—যে রকমেই হোক ঠিক ঠিক জুটিয়ে দিবেনই। দৈবাৎ যদি কোন কিছু তুমি আমি আবশ্যক মনে ক'রেও না পাই সে ক্ষেত্রে বুঝ্‌তে হবে যে, তোমার আমার দৃষ্টিতে সেটি প্রয়োজন বোধ হ'লেও সত্য সত্য সেটির কোন প্রয়োজন নেই। তোমার আমার দৃষ্টি থেকে যে তাঁর দৃষ্টি প্রখর, তিনি যে তোমার আমার চেয়েও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন—কোন সময়েই এ কথা ভুলে যেও না। তাতে সুখ পাবে, আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে যাবে। দাদার কথায় বিশ্বাস কর।"

দিদি নবদ্বীপ দাদার কথা শুনিয়া কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাদাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দাদা! কবে আমার এইরূপ নির্ভরতা আস্‌বে ?" নবদ্বীপ দাদা

বলিলেন, "হবে গো হবে। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? যাঁর চরণে মাথা বিকিয়েছ, যিনি কৃপা ক'রে অঙ্গীকার করেছেন, তিনি কি অম্‌নি অম্‌নি ফেলে রাখ্‌বেন? তুমি অকপটে কায়মনোবাক্যে তাঁর হ'য়ে থাক, যখন যা করবার তিনি ঠিক ঠিক মতই করবেন।"

ললিতা দিদির উপর নবদ্বীপ দাদার কৃপার কথা বিস্তৃতভাবে বলিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ হইয়া যায়। কি ভাবে সেবা করিতে হয়, কিসে তিনি (বড় বাবাজী মহাশয়) সুখী হন, হাতে ধরিয়া তাহা নবদ্বীপ দাদা ললিতা দিদিকে শিখাইয়াছিলেন। বড় বাবাজী মহাশয়কে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দজ্ঞানে নবদ্বীপ দাদা সেবা করিতেন। কেহ কিছু প্রকাশ করিয়া না বলিলেও বড় বাবাজী মহাশয়ের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অন্যের পক্ষে অসম্ভব কার্য্যও নবদ্বীপ দাদা অনায়াসে অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন করিতেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের অলৌকিক লীলাবলীর সহায়, সাক্ষী ও মর্ম্মজ্ঞ এই নবদ্বীপ দাদা একদিন দিদিকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "রত্ন ফেলে যেন শুধু আঁচলে গাঁট দিও না, যাঁকে হাতের কাছে পেয়েছ এ কিন্তু নিজেকে সহজে ধরা-ছোঁয়া দেবে না বরং নানা ভাবে আবরণ দিয়ে রাখতেই চেষ্টা করবে।"

দিদির প্রতি মাধবদাসের স্নেহপ্রীতি

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীপাদ গৌরহরিদাস মহান্ত মহারাজের নিকট বড় বাবাজী মহাশয় ভেকাশ্রয় গ্রহণ করেন। ভেকের সময় নাম হয় "যাদবদাস"। এই মহান্ত মহারাজের নিকট কিছুদিন পূর্ব্বে আর একজন ভেক লইয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল "মাধবদাস।" বড় বাবাজী মহাশয়ের পূর্ব্বে ইনি ভেক লইয়াছিলেন বলিয়া ইনি তাঁহাকে বড় গুরুভাই জ্ঞানে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই ভ্রাতৃযুগলের প্রীতিপূর্ণ ভাব, আচার, নিয়ম, নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি সত্য সত্যই আদর্শস্থানীয় ছিল।

দিদির প্রতি মাধবদাস বাবাজী মহাশয়ের এমন স্নেহ-প্রীতি ছিল যে, শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে "ললিতা কেমন আছে" জিজ্ঞাসা করিতেন। দিদির কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। আপন জন কাহাকেও পাইলে বলিতেন, "তোমাদের বড় বাবাজী জীবের মঙ্গলের জন্য দুটি অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছে। একটি ঘরের মধ্যে বসিয়া মাথায় কাপড় দিয়া সখীবেশে সেবার আদর্শ শিক্ষা দিতেছে, আর একটি খোল করতাল লইয়া কলিহত কৃষ্ণ-ভোলা জীবের দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া নামপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তৃণাদপি শ্লোকের যাজন করিয়া এক মহান্ আদর্শ স্থাপন করিতেছে। এ দুটীর তুলনা নাই।"

মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বিরক্ত বৈষ্ণব। অধিকাংশ সময়ই শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া স্মরণ-মননে আবিষ্ট থাকিতেন। কখন কোনও সুযোগে ললিতা দিদির সহিত মিলিত হইলে কি জাতীয় সেবা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হইত একদিনের একটি ঘটনা হইতে পাঠকগণ তাহা আস্বাদন করুন।—

একবার গ্রীষ্মকালে মাধবদাস বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপধামে আসিয়াছিলেন। সমাজবাড়ীতেই থাকেন। দিদির সহিত ভজন প্রসঙ্গ, লীলাতত্ত্বাদি আলোচনায় পরম আনন্দে দিন কাটিতেছে। একদিন বেলা নয়টা সাড়ে নয়টার সময় মালা হাতে দিদির ঘরের বারান্দায় বসিয়া স্মরণ করিতেছেন। দিদি উহার নিকটেই রন্ধনশালায় রন্ধন করিতেছিলেন। গ্রীষ্মকাল, তাহাতে রন্ধনশালার উত্তাপে দিদির খুব ঘাম বাহির হইয়াছে, তাই একবার বাহিরে আসিয়াছেন। মাধবদাস বাবাজী মহাশয় দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ললিতা! গরমে তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, অপর কাউকে কাজের ভার দিয়ে তুমি একটু বিশ্রাম ক'রে নাও না।" দিদি একটু মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আপনি ওখানে ব'সে ব'সে কি ক'রছেন?"

মাধবদাস।—আমি আর কি করব, ব'সে ব'সে স্মরণের দ্বারা প্রাণেশ্বরীর-রন্ধনকার্য্যে একটু সহায়তা করছি।

দিদি।—তা ওতে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন তো ?

মাধবদাস।—শ্রীগুরুদেবের করুণায় একটু একটু আনন্দ পাচ্ছি বই কি।

দিদি।—আপনি স্মরণে রন্ধনকার্য্যে সহায়তা ক'রে আনন্দ অনুভব করছেন, আর আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রিয়াজীর সহিত রন্ধনে সহায়তা ক'রে আনন্দ পাচ্ছি। আমি এ আনন্দ ত্যাগ করব কেন ?

মাধবদাস বাবাজী মহাশয় দিদির মুখে এই কথা শুনিয়া হুঙ্কার করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ললিতা! তুই ধন্য, আর ধন্য তোর অনুভব। তোর এই ভাবের, তোর এই অনুভবের ছিটেফোঁটা আমাকে দে, আমি তোর মত প্রত্যেক কাজের মধ্যে তাঁকে জড়িয়ে নিয়ে লীলাভোগ ক'রে ধন্য হই।"

এই মাধবদাস বাবাজী মহাশয়ই একবার ভিক্ষা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা একখানি উৎকৃষ্ট বৃন্দাবনী ছাপার শাড়ী কিনিয়া দিদিকে পাঠাইয়াছিলেন। দোকানদার, বাবাজী মহাশয় কেন শাড়ী কিনিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে আবেগভরে বাহ্যিক সম্বন্ধ ভুলিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার এক ছোট ভগ্নী নবদ্বীপে থেকে ভজন করে, এ শাড়ী আমি তাকে পাঠিয়ে দেব।" দোকানদার কেমন যেন একটু বিস্মিত ভাবে তাঁর ভগ্নীর পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি আনন্দ গদগদ স্বরে ললিতা দিদির নাম করিলেন। শুনিয়া দোকানদার তাহার দোকানে যতগুলি শাড়ী ছিল তাহার মধ্য হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট একখানি শাড়ী বাবাজী মহাশয়কে দিয়াছিলেন। বাবাজী মহাশয় যথাসময় সেই শাড়ীর সহিত কিছু শ্রীকুণ্ডের রজ ও প্রিয়াজীর প্রসাদী নির্ম্মাল্য দিয়া দিদিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

———০———

যাদবদাস নাম পরিবর্ত্তন

ললিতা দিদির সহিত যখন নবদ্বীপ দাদার প্রথম মিলন হয় তখন গোবিন্দ দাদা, চৈতন্য দাদা প্রভৃতি কথায় কথায় নিজ নিজ পূর্ব্ব পরিচয় কখনও কখনও ব্যক্ত করিতেন। একদিন দিদি সকলের সম্মুখেই নবদ্বীপ দাদাকে বলিলেন, "দাদা! আপনার কথায়, আপনার ব্যবহারে সব সময়ই কেমন যেন একটা তেজীভাব, কেন বলুন তো?" নবদ্বীপ দাদা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গোবিন্দ দাদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওরে ও যে নৃসিংহদেবের ঘরের লোক, ও তেজী হবে না?"

দিদি।—নৃসিংহদেবের ঘরের লোক আমাদের এখানে কি ক'রে এলেন?

গোবিন্দ দাদা।—আরে, নবদ্বীপে তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে যখন প্রথম মিলন হয় তখন তো উনি ফুলবাবু, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। ছুটি নিয়ে পরিজনবর্গ সঙ্গে নবদ্বীপে এসেছিলেন বেড়াতে। সেই সময় তোমাদের কর্ত্তাও নবদ্বীপে রাজেন-বাবু ব'লে জনসমাজে পরিচিত। ইতিপূর্ব্বেই নবদ্বীপে নৃসিংহদেবের আখড়ায় উনি দীক্ষিত হন। কিন্তু প্রথম দর্শন হ'তেই দুজনে এমন অবিচ্ছেদ্য প্রেমসূত্রে বাঁধা পড়েন যে, এক মুহূর্ত্তও একে অন্যের অদর্শন সহ্য করতে পারতেন না। যদিও অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে—চাকুরীর দোহাই দিয়ে সে যাত্রা দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল কিন্তু বেশীদিন থাকতে পারলেন না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই এসে কর্ত্তার সঙ্গে আবার মিলিত হলেন এবং স্পষ্টই বললেন, আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি, আর যাব না।

আর একটা তেজের কথা শুনে রাখ। বড় বাবাজী মহাশয় যখন ভেকাশ্রয় করেন তখন তাঁহার নাম হয় যাদবদাস। নবদ্বীপ দাদা মিলিয়া মিশিয়া নাচিয়া গাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেড়ান, কিন্তু যাদবদাস নামটি তাঁর মোটেই ভাল লাগে না। আড়ালে আড়ালে নানা ভাবের ইঙ্গিতে অন্যান্য সঙ্গীগণকে এ কথা বলেনও,

কিন্তু গুরুদত্ত নাম কে পাল্টাবে? একদিন নবদ্বীপ দাদা বললেন, আপনাদের যার যা খুশী বলুন আমি আজ থেকে ওঁকে শ্রীরাধারমণচরণদাস নামেই পরিচয় দেব। কেউ আমাদের পরিচয় জান্‌তে চাইলে বল্‌ব, আমরা শ্রীরাধারমণচরণদাসদেবের গণ। সেদিন হ'তে কি জানি প্রভুর কি ইচ্ছা এই শ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজী নামই জনসমাজে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করল। যাদবদাস নামটি সীমাবদ্ধ কয়েকজনের মধ্যেই রইল।

ললিতা দিদি হাতযোড় করিয়া কপালে ছোঁয়াইয়া বলিলেন, "ধন্যি বাবা তেজ, তাই তো ভাবি, এমন মিলন হ'ল কি ক'রে? বিধাতা যোগ্যজনের সঙ্গেই যোগ্যজনের মিলন ঘটিয়েছেন।"

নবদ্বীপ দাদার সেবা শিক্ষাদান

ললিতা দিদি একদিন বৈকালে ঝাঁঝপেটায় বসিয়া শ্রীশ্রীরাধাকান্তের রাত্রের ভোগের জন্য তরকারী আমানে (কুটিতে) করিতেছেন। অদূরে নবদ্বীপ দাদা বসিয়া বসিয়া দিদির কার্য্য দেখিতেছিলেন। একটু সময় লক্ষ্য করিয়াই উঠিয়া আসিয়া দিদির নিকট হইতে বঁটিখানি লইয়া কি ভাবে কত টুকুটুকু করিয়া তরকারী আমানে করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিলেন। দিদিও তাঁহার নির্দ্দেশ মত তরকারী প্রস্তুত করিয়া রান্না করিয়া যথাসময় ভোগ দিলেন এবং কি জানি কেন একটা পাত্রে কিছু তরকারী-প্রসাদ পৃথক ভাবে তুলিয়া রাখিলেন। সেদিন বড় বাবাজী মহাশয় মঠে উপস্থিত ছিলেন না, আসিবারও কোন স্থিরতা ছিল না। এদিকে নবদ্বীপ দাদাও সন্ধ্যারতির পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাঁহার নিজ ব্যবহারের জিনিসপত্র লইয়া কোথায় যেন চলিয়া গেলেন।

ললিতা দিদি অন্য দিনের মত সেবার কার্য্যাদি সমাপন করিয়া শ্রীরাধাকান্তের মন্দির সম্মুখে বসিয়া অনুচ্চস্বরে নাম করিতেছেন। রাত প্রায় বারোটা। হঠাৎ "গৌরহরিবোল" বলিয়া বড় বাবাজী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দিদি তাড়াতাড়ি বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শ্রান্তি অপনোদন জন্য একখানি পাখা লইয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতে করিতে শ্রীঅঙ্গের কুশল প্রশ্নাদি করিতেছেন। বড় বাবাজী মহাশয় এক একটি করিয়া দিদির প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ললিতা! আজ হঠাৎ তরকারী-প্রসাদ পাবার ইচ্ছে হচ্ছে কেন বল দেখি?"

দিদি।—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার কি উদ্দেশ্য আমি কি ক'রে বলব? তবে আদেশ করেন তো প্রসাদ এনে দি।

বাবাজী।—তরকারী প্রসাদ কি প্রস্তুত আছে নাকি?

দিদি "আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে" বলিয়াই হাসিতে হাসিতে যেখানে সেই বাটিসমেত প্রসাদ তুলিয়া রাখিয়াছিলেন সেখান হইতে আনিয়া বড়বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে ধরিলেন।

বাবাজী মহাশয় "জয় নিতাই, জয় নিতাই" বলিয়া প্রসাদে দণ্ডবৎ করিয়া প্রীতিভরে গ্রহণ করিলেন। দুই-এক বার মুখে দিয়াই বলিলেন, "এ যে দেখ্‌ছি নবদ্বীপের হাতে তৈরী করা ডাঁটা?"

দিদি।—আজ্ঞে হ্যাঁ, দাদাই বৈকালে ব'সে ব'সে এইভাবে আমাকে ডাঁটা তৈরী করা শিখিয়েছেন।

বাবাজী।—নবদ্বীপ কোথায়?

দিদি।—তিনি সন্ধ্যারতির পরই প্রসাদ না পেয়ে কোথায় যেন চ'লে গিয়েছেন।

বাবাজী।—দেখ, ঐ একটি সেবার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। সেবা ওর প্রাণ। কোনরকমে সেবায় ত্রুটি দেখ্‌লে ও রেগে নানা প্রকার তিরস্কার তো করেই, সময় সময় ধ'রে মারেও। যদি তোমাদের ও কিছু বলে বা শাসন করে তোমরা তাতে রাগ ক'রো না। মনে মনে জানবে তোমাদের উপর নিতাইচাঁদের কৃপা হ'য়েছে।

দিদি।—আমি তো সেবার কিছুই জানি না। কি ভাবে কখন কোন্ রকম

সেবা করতে হয়, সেবকের সেবায় সেব্যের সুখ হ'ল কি না, কি ভাবে তার অনুভব করতে হয় এসব কিছুই তো আমার জানা নেই।

বাবাজী।—সব জানতে পারবে, ঐ নবদ্বীপই তোমাদের সব বুঝিয়ে দেবে। ওকে বাইরের বেশভূষা দেখে চিন্‌তে পারা যায় না। ওর ভেতরে যে নিতাই-চাঁদ কি অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন তা তাঁর কৃপা না হ'লে কেউ বুঝতে পারবে না, জান্‌তে পারবে না।

এদিনকার প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইল। বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পাইয়া উঠিয়া গেলেন। সকলে অধরামৃত বণ্টন করিয়া লইলে বাটিতে যাহা একটু রহিল তাহাই দিদি পরমানন্দে গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন।

এই ঘটনার ছয়-সাত দিন পরে নবদ্বীপ দাদা মঠে আসিয়া উপস্থিত। প্রভুর এমন লীলা আজও বড় বাবাজী মহাশয় ঝাঁঝপেটায় উপস্থিত নাই। নবদ্বীপ দাদা নিজ নিত্য কৃত্যাদি সারিয়া প্রসাদ গ্রহণান্তে বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। কিছু সময় পরে ললিতা দিদি কুসুম দিদিকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপ দাদার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দাদা! সেবা সম্বন্ধে আমাকে কিছু উপদেশ দিন, আমি তো সেবার কিছুই জানি না।"

নবদ্বীপ।—সেবা নানা জনে নানা রকম বলেন। সাধারণতঃ দুই রকম সেবাই দেখতে পাওয়া যায়। স্বকাম সেবা ও নিষ্কাম সেবা। যে সেবায় সেবকের কিছু পাবার আশা থাকে তাকে স্বকাম সেবা বলে। আর যে সেবা অবশ্য কর্ত্তব্যজ্ঞানে কেবলমাত্র সেব্যকে সুখী করার জন্য হয়, নিজের তাতে যা হয় হোক এই ভাব—তাকেই নিষ্কাম সেবা বলে। এই নিষ্কাম সেবা যিনি করেন তিনি তো কিছু চানই না, যাঁকে করেন তিনিও মনে মনে অনুভব করেন যে, এ সেবা বা এ শ্রদ্ধা আমাকে অর্পিত হয় নি, পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত হ'য়েছে। কাজেই সেব্য ও সেবক উভয়েই আত্মোপলব্ধি ক'রে ধন্য হয়। মহাপুরুষেরা এই জাতীয় সেবাকে উপাসনার সামিল বলেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের উপায় জান্‌তে চেয়েছিলেন

ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট; তাতে তিনি স্নেহ সম্বোধনে বলেছিলেন, "ঈশ্বর লাভের আশায় ও-পথ অবলম্বন ক'রে কি হবে? যে ঈশ্বর বহুরূপে তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান রয়েছেন তাদের সেবা ছেড়ে অজানা-অচেনা কার জন্য তুমি নির্ব্বিকল্প সমাধি চাও?" পরমহংসদেবের এই উপদেশ পেয়ে স্বামীজী সাধনা দ্বারা ঐশী শক্তিবলে বলীয়ান হ'য়ে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব লাভ ক'রে তারস্বরে ঘোষণা করেছিলেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥"

ফললাভের আকাঙ্ক্ষাহীন এই যে নিষ্কাম সেবা এটি ভারতের নিজস্ব ভাব। এর সামান্য সামান্য আদর্শ নিয়ে কত দেশ ধন্য হ'য়ে গেছে।

দিদি।—দাদা! অত সব স্বকাম, নিষ্কাম, সবিকল্প, নির্ব্বিকল্প, বড় বড় কথা বুঝতে পারি না। দয়া ক'রে বুঝিয়ে দিন, সেবা ক'রে সেবক কি ভাবে বুঝবে যে সেব্য সুখী হ'য়েছেন।

নবদ্বীপ।—(সহাস্যে) ঐ তো তোমাদের দোষ। কোন কিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে গেলেই তোমরা একেবারে বোকা সেজে বস, তা হ'লে কি হয়?

দিদি।—সত্যি বলতে কি দাদা, যাঁর কৃপা আকর্ষণে সংসারের কুটিল কুপথ ছেড়ে এই পথে এসে দাঁড়াতে পেরেছি, আমার তাঁকে ছেড়ে আর কোন কিছুতে মন দিতে ইচ্ছে হয় না। আচ্ছা দাদা! তাঁর সেবা করলে কি আমার কিছু করা হবে না?

নবদ্বীপ।—কে বল্‌লে হবে না। তাতেই তো হবে রে, তাতেই তো সব হবে, আর তাই করতেই তো আমি বল্‌ছি। সব সময় মনে রাখতে হবে, ইহকাল ও পরকালের একমাত্র আশ্রয়—মূল সম্পত্তি শ্রীগুরুচরণ। অকপটে গুরুসেবা দ্বারাই সমস্ত লাভ হয়। ভজন সাধন, জপ তপ, নিয়ম নিষ্ঠা,

ধ্যান ধারণা যা কিছুই কর না কেন, সর্ব্বাগ্রে চাই করুণাসিন্ধু শ্রীগুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ। গুরুকৃপা না হ'লে কারুরই কৃপা পাওয়া যায় না। যদি সাধনপথে অগ্রসর হ'তে চাও তবে সর্ব্বপ্রথম শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান কর। অমোঘ অক্ষয় গুরুকৃপা সঞ্চয় ক'রে গুরুদেবকে অগ্রগামী ক'রে তদানুগত্যে অগ্রসর হও অতি দুরূহ কার্য্যও সহজসাধ্য হবে—সুদুর্ল্লভ বস্তুও অনায়াস লভ্য হবে। এ সকল কথা কাঙ্গলা নবদ্বীপের নয়, সকল শাস্ত্রই এ কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। শ্রীগুরুতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে শাস্ত্রকার বলেছেন—"ন গুরোরধিকং কিঞ্চিৎ"। শ্রীভগবান নিজমুখে বলেছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাব মন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেব ময়ো গুরুঃ॥"

আবার অন্যত্র উক্ত হয়েছে—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বর।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

স্থানান্তরে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—

"সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুং নত্বা প্রণমেদ্দেবতান্তরং।
সাক্ষাদ্বিষ্ণু সমংমত্বা পূজয়েদ্বিধি পূর্ব্বকম্॥"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ শ্রীগুরুর স্তব বর্ণন প্রসঙ্গে বলেছেন—

"যস্যপ্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতি কুতোপি।
ধ্যায়ংস্তবং স্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণার বিন্দম্॥"

এ ভাবের প্রমাণ তুমি শাস্ত্র খুললেই দেখ্‌তে পাবে আমি আর কত বলব! মোট কথা গুরুদেবের কৃপা ছাড়া গতি নাই—গতি নাই—গতি নাই।

তারপর তাঁর সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ্‌বে যে, তিনি সুখময়; তাঁর যাতে সুখ হয় আর তিনি যা ক'রে সুখ পান নিজেকে তাতেই সুখী হ'তে হবে। সব সময় মনে রাখবে, সেবকের দেহ, মন, প্রাণ সম্পূর্ণ সেব্যের। তিনি আদর করতে পারেন, পদদলিত করতে পারেন, বিনা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ক'রে কঠোর

শাস্তি দিয়ে সেবককে লাঞ্ছিত গঞ্জিত এমন কি বিতাড়িতও করতে পারেন, তাতে সেবকের মনে কোনরূপ বিচার আসবে না। সেবকের মনে দৃঢ় ধারণা থাকবে যে, আমার বন্ধু, আমার আত্মীয়, আমার আশ্রয়দাতা বা আমার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী একমাত্র শ্রীগুরুদেব। কাজেই আমার আর ঐ চরণ ছেড়ে কোথাও যাবার স্থান নেই। ভালবাসার কপট অভিনয় দেখিয়ে আপন জন সেজে যারা তোমার দুঃখে কাতরতা দেখায়, মনে রাখবে তারা তোমার মিত্র নয়, পরম শত্রু। পতিব্রতা স্ত্রী পতির শাসনে বা তাড়নে উৎপীড়িতা হ'য়ে যদি পতি ছাড়া অন্য কাকেও আশ্রয় করে বা করতে যায়, তাকে যেমন লোকে অসতীগণে গণ্য করে, শ্রীগুরু সেবকেরও ঠিক সেই অবস্থা।

আচ্ছা, একটা কথা ভাব দেখি ; ছোট ছেলেকে কোন দোষের জন্য যদি মা তাড়ন, ভৎর্সন বা প্রহার করেন তা হ'লে সে কি করে ?

দিদি।—সে আর কি করবে, মা-মা ব'লে কাঁদতে থাকে।

নবদ্বীপ।—শুধু কাঁদে না, মা রাগ ক'রে যত তাকে দূরে ঠেলে দিতে চান, শিশু ততই মাকে জড়িয়ে ধ'রে মুখপানে চেয়ে মা-মা বলে কাঁদে। শেষে মাও আর তাকে ফেলতে না পেরে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেন। আমাদের আশ্রয়দাতা শ্রীগুরুদেব ছাড়া আর কে আছে? তাই বলি তাঁকে ধ'রে থাক, সব ঠিক হবে।

এর মধ্যে আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সেবা করতে হ'লে সেবার চাতুর্য্য এক একটু শিখ্‌তে হবে।

দিদি।—সে কি রকম দাদা! একটু খুলে বলুন ?

নবদ্বীপ।—কি ক'রে সেব্যকে সুখী করা যায়, তিনি কি ভালবাসেন, কোন্ জিনিস আজ তিনি প্রীতি ক'রে গ্রহণ করেছেন, কাল আবার সেই বস্তুটি কি ভাবে সংগ্রহ ক'রে তাঁর সেবা করা যাবে এইসব চিন্তা ও চেষ্টা থাকা দরকার। এ ছাড়া আর একটা মস্ত বড় কথা, সব সময় সকল অবস্থায়ই নিজের অযোগ্যতা স্মরণ রাখতে হবে। স্বতন্ত্রতাবুদ্ধি আত্মসুখকামনা কোন রকমে এসেছে কি সব গড়্‌বড়্‌ হ'য়ে যাবে।

ধ্যান ধারণা যা কিছুই কর না কেন, সর্ব্বাগ্রে চাই করুণাসিন্ধু শ্রীগুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ। গুরুকৃপা না হ'লে কারুরই কৃপা পাওয়া যায় না। যদি সাধনপথে অগ্রসর হ'তে চাও তবে সর্ব্বপ্রথম শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান কর। অমোঘ অক্ষয় গুরুকৃপা সঞ্চয় ক'রে গুরুদেবকে অগ্রগামী ক'রে তদানুগত্যে অগ্রসর হও অতি দুরূহ কার্য্যও সহজসাধ্য হবে—সুদুর্ল্লভ বস্তুও অনায়াস লভ্য হবে। এ সকল কথা কাঙ্গলা নবদ্বীপের নয়, সকল শাস্ত্রই এ কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। শ্রীগুরুতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে শাস্ত্রকার বলেছেন—"ন গুরোরধিকং কিঞ্চিৎ"। শ্রীভগবান নিজমুখে বলেছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাব মন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেব ময়ো গুরুঃ॥"

আবার অন্যত্র উক্ত হয়েছে—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বর।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

স্থানান্তরে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—

"সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুং নত্বা প্রণমেদ্দেবতান্তরং।
সাক্ষাদ্বিষ্ণু সমংমত্বা পূজয়েদ্বিধি পূর্ব্বকম্॥"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ শ্রীগুরুর স্তব বর্ণন প্রসঙ্গে বলেছেন—

"যস্যপ্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতি কুতোপি।
ধ্যায়ংস্তবং স্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণার বিন্দম্॥"

এ ভাবের প্রমাণ তুমি শাস্ত্র খুললেই দেখ্‌তে পাবে আমি আর কত বলব! মোট কথা গুরুদেবের কৃপা ছাড়া গতি নাই—গতি নাই—গতি নাই।

তারপর তাঁর সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ্‌বে যে, তিনি সুখময়; তাঁর যাতে সুখ হয় আর তিনি যা ক'রে সুখ পান নিজেকে তাতেই সুখী হ'তে হবে। সব সময় মনে রাখবে, সেবকের দেহ, মন, প্রাণ সম্পূর্ণ সেব্যের। তিনি আদর করতে পারেন, পদদলিত করতে পারেন, বিনা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ক'রে কঠোর

শাস্তি দিয়ে সেবককে লাঞ্ছিত গঞ্জিত এমন কি বিতাড়িতও করতে পারেন, তাতে সেবকের মনে কোনরূপ বিচার আসবে না। সেবকের মনে দৃঢ় ধারণা থাকবে যে, আমার বন্ধু, আমার আত্মীয়, আমার আশ্রয়দাতা বা আমার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী একমাত্র শ্রীগুরুদেব। কাজেই আমার আর ঐ চরণ ছেড়ে কোথাও যাবার স্থান নেই। ভালবাসার কপট অভিনয় দেখিয়ে আপন জন সেজে যারা তোমার দুঃখে কাতরতা দেখায়, মনে রাখবে তারা তোমার মিত্র নয়, পরম শত্রু। পতিব্রতা স্ত্রী পতির শাসনে বা তাড়নে উৎপীড়িতা হ'য়ে যদি পতি ছাড়া অন্য কাকেও আশ্রয় করে বা করতে যায়, তাকে যেমন লোকে অসতীগণে গণ্য করে, শ্রীগুরু সেবকেরও ঠিক সেই অবস্থা।

আচ্ছা, একটা কথা ভাব দেখি ; ছোট ছেলেকে কোন দোষের জন্য যদি মা তাড়ন, ভর্ৎসন বা প্রহার করেন তা হ'লে সে কি করে ?

দিদি।—সে আর কি করবে, মা-মা ব'লে কাঁদতে থাকে।

নবদ্বীপ।—শুধু কাঁদে না, মা রাগ ক'রে যত তাকে দূরে ঠেলে দিতে চান, শিশু ততই মাকে জড়িয়ে ধ'রে মুখপানে চেয়ে মা-মা বলে কাঁদে। শেষে মাও আর তাকে ফেলতে না পেরে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেন। আমাদের আশ্রয়দাতা শ্রীগুরুদেব ছাড়া আর কে আছে ? তাই বলি তাঁকে ধ'রে থাক, সব ঠিক হবে।

এর মধ্যে আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সেবা করতে হ'লে সেবার চাতুর্য্য এক একটু শিখ্‌তে হবে।

দিদি।—সে কি রকম দাদা! একটু খুলে বলুন ?

নবদ্বীপ।—কি ক'রে সেব্যকে সুখী করা যায়, তিনি কি ভালবাসেন, কোন্ জিনিস আজ তিনি প্রীতি ক'রে গ্রহণ করেছেন, কাল আবার সেই বস্তুটি কি ভাবে সংগ্রহ ক'রে তাঁর সেবা করা যাবে এইসব চিন্তা ও চেষ্টা থাকা দরকার। এ ছাড়া আর একটা মস্ত বড় কথা, সব সময় সকল অবস্থায়ই নিজের অযোগ্যতা স্মরণ রাখতে হবে। স্বতন্ত্রতাবুদ্ধি আত্মসুখকামনা কোন রকমে এসেছে কি সব গড়্‌বড়্‌ হ'য়ে যাবে।

দিদি।—এ সব কি ক'রে হবে দাদা ?

নবদ্বীপ।—প্রার্থনা।—শুধু তাঁর চরণে অকপটে প্রার্থনা করবে, তিনি কৃপা-শক্তি সঞ্চার ক'রে সব দুর্দ্দৈব, সব বাধা বিপত্তি দূর ক'রে দেবেন।

দিদি।—দাদা, আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার উপদেশ মত যেন নিজেকে তাঁর সেবায় যোল আনা সমর্পণ ক'রে দিয়ে ধন্য হতে পারি।

নবদ্বীপ দাদা দিদির হাত দুইটি ধরিয়া 'জয়গুরু জয়গুরু' বলিতে বলিতে উঠিয়া বলিলেন, "সেবার সময় ব'য়ে যাচ্ছে, দাদা (নবদ্বীপদাদা বড় বাবাজী মহাশয়কে অনেক সময় দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।) হয়ত এখুনি এসে পড়বেন, যাও সেবার কাজ কর গিয়ে।"

ললিতা দিদি ও কুসুম দিদি নবদ্বীপ দাদাকে দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়া গিয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট সেবার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

শুধু ললিতা দিদি নহেন, মঠের ছোট বড় সকলেই নবদ্বীপদাদার কাছে নানাভাবে সময়োচিত উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। নবদ্বীপদাদার অলৌকিক জীবন-কাহিনী কিছুদিন পূর্ব্বে 'ভক্তি' পত্রিকায় প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু তদানীন্তন রাজপুরুষগণের কৃপা কটাক্ষে (?) পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হওয়ায় আলোচনাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি প্রসঙ্গক্রমে যথাযথ স্থানে পাঠকগণকে তাহা উপহার দিবার চেষ্টা করিলাম মাত্র।

বঙ্গাব্দ ১৩০৯ সাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপদাদার সহিত মঠবাসীর যোগাযোগ ছিল। বড় বাবাজী মহাশয়ের কৃপাশাসনে নবদ্বীপদাদা শ্রীবৃন্দাবন যান এবং অল্পদিন পরেই আষাঢ়ী অমাবস্যায় স্বেচ্ছায় স্বাভীষ্টধামে গমন করেন। এই যে বড় বাবাজী মহাশয়ের কৃপাশাসন এও এক অদ্ভুত ব্যাপার। নবদ্বীপদাদা বড় বাবাজী মহাশয়কে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দের প্রকাশ জ্ঞানে সেবা করেন এবং সেই ভাবেই প্রচার করিতে চাহেন, কিন্তু বড় বাবাজী মহাশয়ের তাহা মনোমত না হওয়ায় একদিন আদেশ করিলেন, "আর যেন নবদ্বীপ আমার সঙ্গে দেখা

না করে—তাকে বৃন্দাবনে যেতে বল।"...ইত্যাদি। এই সব কাহিনী 'চরিত সুধা' গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দিদিকে পরীক্ষা

যেদিন হইতে দিদি পুরীধামে বড় বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়াছেন সেই দিন হইতেই তিনি দিদিকে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে আদেশ করিয়াছেন। এই আদেশের সহিত অকাতরে অফুরন্ত কৃপাশক্তি সঞ্চারেও কখন কার্পণ্য করেন নাই। দিদি বড় বাবাজী মহাশয়ের তীব্র—সুকঠোর শাসন বিনা প্রতিবাদে হাসিমুখে গ্রহণ করিয়াছেন। মনে হয় তাহার ফলেই উত্তরকালে অভাবনীয় ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া অপার্থিব ভাব-রসাস্বাদনে নিজেও ধন্য হইয়াছেন, অপর ভাগ্যবান জনকেও কিছু কিছু আস্বাদনের অধিকার দিয়া ধন্য করিয়াছেন।

বড় বাবাজী মহাশয়ের কৃপাশাসনের বহু ঘটনা 'চরিত সুধা' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে দু-একটি এখানে পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

পুরীতে বড় বাবাজী মহাশয়ের প্রথম ও অত্যন্ত নিভৃত লীলাস্থল ছিল শ্রীশ্রীরাধারমণ কুঞ্জ। সেখানকার সেবা পূজা পূর্ব্বে যে ভাবেই চলুক না কেন, বড় বাবাজী মহাশয়ের আগমনের পর হইতে তাঁহারই নির্দ্দেশমত চলিত। প্রত্যহ দিনের বেলা এক সের চাউলের অন্নভোগ তখন হইত এবং সেই ভোগের প্রসাদ বড় বাবাজী মহাশয় গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিত তাহাই ভক্তগণ কিছু কিছু অধরামৃতরূপে গ্রহণ করিতেন। ঝাঁঝপেটা মঠ হইতে যে প্রসাদ আসিত তাহাই ললিতাদিদি ও অন্য দুই তিন জনে সেবা করিতেন।

একদিন শ্রীশ্রীরাধারমণ কুঞ্জে কোনও কারণে তিনবার রন্ধন করিতে হইয়াছিল। অনেকেই সেদিন সেখানে প্রসাদ পাইয়াছিলেন কিন্তু কি জানি

কেন, ললিতাদিদিকে প্রসাদ পাইবার কোনরূপ সুযোগ সেদিন দেওয়া হয় নাই। বলা বাহুল্য, রন্ধনকার্য্যাদি কিন্তু ললিতাদিদিকেই করিতে হইয়াছিল। আজ যেন বড় বাবাজী মহাশয়ের দিদির উপর একটু কড়া নজর। তিনি একটির পর একটি এমন কাজের আদেশ দিদির উপর করিতেছেন যে, ইচ্ছা থাকিলেও প্রসাদ গ্রহণের কোনরূপ অবসর দিদি পাইতেছেন না।

বড় বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় "জেনামঠ" হইতে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, অতি সূক্ষ্ম চিঁড়া ভাজা এবং নানাবিধ ফল মিষ্টান্নাদি আসিল। বড় বাবাজী মহাশয় বিশ্রাম করিতে করিতেই বলিলেন, "ঐ সব বস্তু ঠাকুর জাগিলে ভোগ লাগিবে, এখন এই ঘরেই আনিয়া রাখ।" দিদিও বাবাজী মহাশয়ের আদেশ মত সমস্ত জিনিস তাঁহার ঘরেই তুলিয়া রাখিলেন।

অপরাহ্ণ চারিটার পর ঠাকুরের ঘর খোলা হইলে যথানিয়মে ভোগ লাগিল। এদিকে বাবাজী মহাশয়ও মুখ হাত ধুইয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ নিজে গ্রহণ করিয়া উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে অবশিষ্ট প্রসাদ নিঃশেষে বণ্টন করিয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানেও ললিতাদিদি বাদ পড়িলেন। অন্তর্যামী সকল জানিলেও রঙ্গ করিয়া দিদির দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তাই তো, ললিতাকে তো দেওয়া হ'ল না? আচ্ছা, প্রসাদ কণিকামাত্র হ'লেই হবে, এই প্রসাদী-বাসনে যা লেগে আছে ওতেই ওর যথেষ্ট হ'বে।" এই বলিয়া বাসনগুলি দিদির দিকে ঠেলিয়া দিলেন।

আজ সকাল হইতেই দিদি বাবাজী মহাশয়ের ভাব লক্ষ্য করিতেছেন। এখনকার ব্যাপারও দেখিলেন তথাপি কোন প্রতিবাদ না করিয়া আদেশ মত বাসনগুলি হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া একটু প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং বাসনগুলি পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া রাখিলেন। এখানে বলাই বাহুল্য যে, যে প্রসাদ দিদি গ্রহণ করিলেন তাহা সত্য সত্যই কণিকামাত্র। কিন্তু তাহাতেই তৃপ্তি বোধ করিয়া আনন্দমনে "জয়গুরু" বলিয়া পুনরায় বাবাজী মহাশয়ের আদেশের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে বড় বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপ্রাপ্ত 'ভুবন সাউ'র বাড়ী হইতে পুরী, কচুরী, মণ্ডা ও অন্যান্য বহুবিধ মিষ্টান্ন এবং নানাবিধ ফল লইয়া এক ভক্ত আসিয়া উপস্থিত। সেইসঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদও কিছু ছিল। বড় বাবাজী মহাশয় শ্রীমন্দিরে দর্শনে যাইতেছিলেন; প্রসাদ উপস্থিত হওয়া মাত্র দণ্ডবৎ করিয়া উহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া সেই ভক্তকেই বলিলেন, "যাও, ললিতার হাতে দিয়ে বল্‌বে—আমার অধরামৃত।"

প্রসাদের ডালি লইয়া ভক্তটি দিদির নিকট উপস্থিত হইয়া বাবাজী মহাশয়ের আদেশ মত দিদিকে সমস্ত বলিয়া প্রসাদের পাত্র তাঁহার হাতে দিলেন। দিদিও দণ্ডবৎ করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং সমস্ত প্রসাদ ঘরের মধ্যে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলেন।

বড় বাবাজী মহাশয় নিয়মিত দর্শনাদি শেষ করিয়া রাত্র নয়টার পর মঠে ফিরিলেন। দিদির সহিত দেখা হইতেই সেই প্রসাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দিদি হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "সে প্রসাদ সেই ভাবেই ঘরের মধ্যে ঢাকা দেওয়া আছে।" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন, "আমার অধরামৃত ব'লে পাঠালুম, তবু তুমি পাও নি কেন?"

দিদি।—আপনি তো আমাকে পাবার জন্য আদেশ করেন নি?

বাবাজী।—হুঁ, বেশ বেশ, রাগ ক'রে নয় তো? আচ্ছা, যদি আদেশের অপেক্ষায়ই না পেয়ে থাক, তা হ'লে এ কথাটি যেন সব সময় স্মরণ থাকে। যাও, এখন আদেশ করছি, প্রসাদ পাও গিয়ে।

দিদি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া—প্রসাদ পাইতে গেলেন।

এই ঘটনার দুই-তিন দিন পরে একদিন বড় বাবাজী মহাশয় দিদিকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন, "সেদিন সারাদিন কিছু না খেতে দিয়ে একটার পর একটা কাজের হুকুম ক'রে তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু এটা ঠিক জেনো যে, তোমাদের এভাবে তৈরি না করলে তোমরা শেষে সাম্‌লাতে পারবে না। মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা যেমন বাহ্যশৌচ করে, চিত্তের বাসনাকে ভোগের সুযোগ

থাকলেও তা থেকে তুলে নিয়ে সংযত হওয়াকে আভ্যন্তর শৌচ বলে। যথা-লাভে সন্তুষ্ট থাকা এবং সকলই আমার মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময় ব্যবস্থা করছেন এই ভাব মনে মনে দৃঢ় রাখা বিশেষ প্রয়োজন।"

বিড়ালের নিকট ক্ষমাভিক্ষা

আজ বড় বাবাজী মহাশয়ের বদনমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর দেখা যাইতেছে। প্রবল ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি দেবী যেমন থম্‌থমে ভীষণাকার ধারণ করে, আজ সমস্ত মঠের মধ্যেই যেন সেই ভাব। সকলেরই মনে আশঙ্কা হইতেছে কখন কি অঘটন ঘটে।

বাবাজী মহাশয় গম্ভীরভাবে উন্মুক্ত গাত্রে মঠের আঙ্গিনায় বেড়াইতেছেন। দৃষ্টি নিম্নদিকে, হস্তে নামের মালা। বেলা অনুমান অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। ভক্তগণ যে যাহার কার্য্যে ব্যস্ত। এদিকে দিদি রান্নাঘরের পার্শ্বে বারান্দায় বসিয়া বাম হাতে কি যেন একটা মালিশ করিতেছেন। তিনটা সাড়ে তিনটার পর হইতে দিদির বাম হাতখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং ভীষণ যন্ত্রণা হইতেছে। মালিশ করিতে করিতে দিদি মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া "জয় গুরু জয় গুরু" বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন।

বাবাজী মহাশয় বেড়াইতে বেড়াইতে নামের মালা হাতে করিয়াই দিদির কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দিদি যন্ত্রণা-কাতরমুখে কি বলিতে যাইয়া বাবাজী মহাশয়ের দিকে চাহিয়াই চুপ্ করিয়া গেলেন। সে গম্ভীর মুখভাব দিদির প্রাণেও ভীতির সঞ্চার করিল। বাবাজী মহাশয় একটু পরেই বলিলেন— "কায়মনে প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দিবে—এ বচনটি শুধু মুখে বল্‌লেই হয় না, ললিতা! কাজের মধ্য দিয়েও দেখাতে হয়।"

দিদি উত্তর দিতে যাইয়া এক ধমক খাইলেন। বাবাজী মহাশয় পুনরায় বলিলেন, "ঢের হ'য়েছে, আর সাফাই গেয়ে নিজের দোষ ঢাক্‌তে হবে না।

এখন ভাল চাও তো যার কাছে অপরাধ করেছ তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও।” বলিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

মালিশের কৌটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল, দিদি উঠিয়া গিয়া তাঁহার ঘরের সম্মুখে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কখন—কিসে এমন হইল।

ঝাঁঝপেটা মঠের অধিকাংশ সেবার কার্য্যই তখন দিদির উপর ছিল। অন্যান্য সেবক সেবিকা যাঁহারা ছিলেন যদিও তাঁহারা তাঁহাদের সাধ্যমত সেবাকার্য্যে আনুকূল্য করিতেন তথাপি দিদিকে সমস্ত সময় সকল বিষয়েই দেখাশুনা করিতে হইত। কাজেই হঠাৎ এইভাবে দিদি অসুস্থ হওয়ায় সেবাকার্য্যে বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় সমস্ত জানিয়াও কোনরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন না দেখিয়া একজন সেবক যাইয়া তাঁহাকে বলিল যে— “ললিতা দিদির হাতের যন্ত্রণা অত্যন্ত বেড়েছে, নিকুঞ্জভোগের যোগাড় করতে পারছেন না, আপনি অন্য কাকেও দিয়ে ভোগের ব্যবস্থা করতে আদেশ করুন।”

বাবাজী মহাশয় গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে উত্তর দিলেন,— “কেন, হাতে সামান্য একটু ব্যথা হয়েছে তার জন্য সেবার কাজ বন্ধ করবার কি দরকার হ’ল? নিজ নিজ কৃতকর্ম্মের ফলে জীবের যে সমস্ত ভোগ আসে তা ভোগ না করলে চলবে কেন? তাকে গিয়ে বল—সেবার কাজ যেন ছাড়ে না, ছাড়্‌লে যে দুঃখ পাচ্ছে তার চেয়েও বেশী দুঃখ পাবে।”

সেবক ভক্তটি আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া গিয়া দিদিকে সমস্ত বলিলে দিদি “জয় গুরু” বলিয়া উঠিয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট সেবার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

সেদিন কাটিয়া গেল, তাহার পরের দিনও সেইভাবের হাতে ফুলা ও যন্ত্রণা লইয়া দিদি সেবার কার্য্য করিলেন। সময় যাইতেছে কিন্তু যন্ত্রণার উপশম দূরের কথা বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে। বাবাজী মহাশয় নিজ হইতে তো কিছু করিলেনই না, দু’একজন ঔষধাদির কথা বলায় বলিলেন—“আত্ম-

চৈতন্য না হ'লে বাইরের ঔষধে কি ক'রবে? যদি ঔষধেই সমস্ত রোগ ভাল হ'ত তা হ'লে আর জগতের লোক এত কষ্ট পেত না। ভগবৎ-সংসারে থেকে নিজেকে কর্ত্তা বা শাস্তা মনে ক'রে কাজ করলে তার জন্য শাস্তি পেতে হয়ই। সে কষ্ট ভোগ তাকে করতেই হবে। প্রতিটি কার্য্যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার ক'রে চলতে হবে, তা না পারলে ভগবৎ-সংসারে থাকা বা আনন্দ পাওয়া সুকঠিন। প্রভু যখন এসব চৈতন্য করিয়ে দেবেন তখনই দেখ্‌বে সব ভাল হয়ে গেছে।"

এদিকে বাবাজী মহাশয়ের এই ভাব, ওদিকে দিদি একটু অবসর পাইলেই চিন্তা করেন—তাই তো, কিছুতেই তো মনে করতে পাচ্ছি না যে, কি এমন গুরুতর পাপ করলাম, যার ফলে সেবায় বঞ্চিত হ'তে বসেছি।

আবার কখন কখন প্রভুর উপর অভিমান করিয়া ভাবেন—"প্রভুও তো কই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন না যে, কিসে আমার এমন হ'ল?" এই ভাবের ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়া সারাদিন কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে দিদি বসিয়া আছেন, কুসুম দিদি কুঞ্জ দাদার সঙ্গে আসিয়া দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন আছ দিদি! আজ যেন তোমাকে খুবই কাতর দেখছি?"

দিদি।—মনোমত সেবার কাজে যোগ দিতে পারছি না, তার উপর কিসে এমন হ'ল এই সব চিন্তা ক'রে মনটা খুব খারাপ লাগ্‌ছে। দেখ ভাই, মুখে অনেক সময় অনেক বড় বড় কথা বলি কিন্তু কাজে করতে পারি না। আমি তোমার হলাম, আমার যা-কিছু ভার তুমি নিলে মুখে তো খুব বলি কিন্তু কাজের সময় হয় কই। সত্যিসত্যিই যদি বলতে পারতাম, এটা যদি আমার অকপট প্রাণের প্রার্থনা হ'ত, তা হ'লে আবার আমি এটা-সেটা ভাবব কেন? শরীরে ব্যাধি এল তার ভাবনা, মন চঞ্চল হ'ল তার ভাবনা—এসব আর আমার হবে কেন, যদি সকল ভার তাঁকে দিয়েই দিয়েছি? তা যখন হচ্ছে না তখন বুঝতে হবে সত্যি সত্যি আমি ভার দিতে পারি নি, শুধু বচনে দিয়েছি।

কুসুম দিদি।—দিদি! যিনি ব্যাধি দিয়েছেন, যিনি বিপদ দিয়েছেন, তিনিই তোমায় সহ্য করবার শক্তি দেবেন। তুমি বিচলিত হয়ো না।

দিদি।—না ভাই, আমি সেজন্য হতাশ হচ্ছি না; প্রারব্ধ আমাকে ভোগ করতেই হবে। তবে এই দুঃখ যে, আমার জন্য তোমরাও অশান্তি পাচ্ছ।

সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, যে যার কাজে চলিয়া গেলেন। ক্রমে আরতির পর ভোগরাগাদি হইয়া সকলের প্রসাদ পাওয়া হইয়া গেলে দিদিও প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন এবং পূর্ব্বের মত ভাবিতে ভাবিতে কখন যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। শেষ রাত্রে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় চমকিয়া উঠিয়া নিজের মনে মনেই বলিলেন, "আমার মনে হয় সেদিন এই হাতে বিড়ালটাকে মারিয়াছিলাম তাহাতেই আমার হাত এইরূপ হইয়াছে।" আশ্চর্য্য ব্যাপার, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই হাত নাড়িয়া দেখেন, ব্যথা অনেক কম।

অবশিষ্ট রাতটুকু ঐ চিন্তাতেই কাটিয়া গেল। প্রাতে উঠিয়া যথানির্দ্দিষ্ট সেবার কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া বাবাজী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই যে, হাতের ব্যথা বেশ ভাল হয়ে গেছে? কি ঔষধে ভাল হ'ল?"

দিদি।—গৃহস্থ যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে ততক্ষণই চোরে চুরি করতে পারে, জাগ্‌লে আর কি চুরি করবার সুযোগ হয়?

বাবাজী।—বেশ বেশ, জেগেছ তো? চৈতন্য হয়েছে? কোন্ অপরাধে ঐরূপ হয়েছিল ধারণায় এসেছে?

দিদি।—আমার বোধ হয় সেদিন দুপুরবেলা মহাপ্রসাদ পাবার সময় সেই যে বেড়ালটাকে মেরেছিলাম তাতেই আমার হাতে এইরূপ ব্যথা হয়েছিল।

বাবাজী।—বোধ হয় কেন, বিশ্বাস কর, নিশ্চয়ই সেইজন্য তোমার এত ভোগ।

দিদি।—আচ্ছা, বিড়ালকে কৃষ্ণসেবার বাদী ব'লে যখন রাধারাণী পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছেন, তখন তাকে তাড়ালে অপরাধ হবে কেন? এই তো কয়েক দিন পূর্ব্বে এই মঠেই রান্নাঘরে ঠাকুরের জন্য প্রস্তুত করা ভোগের দ্রব্যে মুখ

দিয়েছিল ব'লে সব দ্রব্য নষ্ট ক'রে ফেলা হ'ল। তবুও কি তাকে আদর করতে হবে ?

বাবাজী।—বিড়াল কৃষ্ণসেবার বাদী হতে পারে, কিন্তু তা ব'লে সে কৃষ্ণ বা বৈষ্ণবের অধরামৃতের ভাগী হবে না এ সিদ্ধান্ত কোথায় পেলে ? জীবমাত্রই যখন কৃষ্ণদাস তখন বিড়ালও কৃষ্ণদাস। দাসের কষ্টে প্রভুর কষ্ট। আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি দণ্ডবৎ করবার বিধান শাস্ত্রে আছে। সে তোমার উপকার করুক আর নাই করুক, ভগবৎসৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনটিকেই তুমি অবজ্ঞা করতে পার না। কেন না, তা হ'লে সৃষ্টিকর্ত্তাকে অবজ্ঞা করা হয়। প্রাণীমাত্রের দ্বারাই কোন না কোন আনুকূল্য পাওয়া যায়। ত্রিবিধ আশ্রমই রজোগুণ বা তমোগুণের অনিষ্টকারিতা স্বীকার করেছেন,

"নিন্দাশূন্য নম্রভাব সবারে স্তবন।
অভ্যাগত আহূত ব্যক্তির চরণ বন্দন॥"

প্রাণীমাত্রেই উদ্বেগ না দেওয়া, কায়মনোবাক্যে সকলকে সন্তোষ করা, যথালাভে সন্তুষ্ট থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সেবন মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজর্ষি জনক, মহারাজা অম্বরীষ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির আচরণ স্মরণ কর দেখি ?

দিদি।—আমাদের মত অসংযত বহির্ম্মুখ জীবের ঐরূপ হবার আশা করাও বিড়ম্বনা নয় কি ?

বাবাজী।—ও কি বলছ ললিতা ? প্রভুর কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। যখন তোমাদিগকে ভগবৎ-সংসারের সেবক সেবিকা ক'রে নিতাইচাঁদ পাঠিয়েছেন তখন যোগ্যাযোগ্য, সম্ভব অসম্ভব তিনি বুঝবেন। তোমাদের কর্ত্তব্য প্রাণপণে তাঁর নির্দ্দেশ মেনে চলা। যাঁরা কৃপাসিদ্ধ তাঁদের এইটাই সাধন জানবে।

দিদি।—যদি সাধন করতেই হ'ল, তা হ'লে আর কৃপা কি হ'ল ?

বাবাজী।—কৃপার সাধনভজনে আর সাধনের সাধনভজনে অনেক পার্থক্য।

কৃপাসিদ্ধদের নিজ চেষ্টায় কিছু উপার্জ্জন করার আবশ্যক হয় না, কেবল কৃপাপ্রাপ্ত বস্তু যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য যত্ন করতে হয়। কৃপাসিদ্ধদের সাধন-বস্তু-প্রাপ্তির জন্য নয়, প্রাপ্তবস্তু রক্ষার জন্য। তোমাদের পক্ষে যাতে কৃপাপ্রাপ্ত বস্তু রক্ষা হয় তার জন্য অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন করতে পারলেই যথেষ্ট হবে।

দিদি।—আমি অত তত বুঝি না। বিশেষ কিছু যে করতে পারব সেরূপ সামর্থ্যও নেই। যে অমূল্যনিধি কৃপা ক'রে দিয়েছেন যাতে তা নষ্ট না হয়, সযত্নে রক্ষা ক'রে ভোগ করতে পারি তার ব্যবস্থাও আপনাকেই করতে হবে। সত্যই আমি শক্তিহীন, যখন যেমন দরকার শক্তি দিয়ে যোগ্য ক'রে নিন, এইটিই প্রার্থনা।

বাবাজী। তা না হয় করা হ'ল। কিন্তু যে বিষয় নিয়ে এই আলোচনা আরম্ভ হয়েছে সে বিষয়টা একটু ভেবে দেখেছ কি? আমি সেদিনের সেই বিড়াল মারার ঘটনা আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করেছি। বল দেখি, কি নৃশংসতার কাজ তুমি সেদিন করেছিলে? তোমরা উদর পূর্ত্তি ক'রে মহাপ্রসাদ পাচ্ছ, আর ক্ষুধার্ত্ত একটা জীব একমুষ্টি প্রত্যাশী হয়ে তোমাদের কাছে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত তো হ'লই, উপরন্তু প্রহার খেল। আচ্ছা, ভাব দেখি, লোকালয়েই যদি ওরা ঐরূপ প্রহার খেয়ে বিতাড়িত হবে তা হ'লে ওদের উপায় কি? ওরা যাবে কোথায়?

এই ভাবের বহু উপদেশ দিয়া, নানাবিধ শাস্ত্র-প্রমাণাদি দ্বারা কি ভাবে চলিতে হইবে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া বাবাজী মহাশয় নিবৃত্ত হইলে দিদি সাষ্টাঙ্গে বাবাজী মহাশয়কে ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য, দিদি আশ্রমের চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিয়া সেই বিড়ালটাকে ধরিয়া আনিলেন এবং নানা প্রকার মিষ্ট বাক্য বলিয়া তাহাকে কিছু আহার্য্য দিয়া তাহার নিকট কাতর ভাবে নিজ কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীরাধারমণের কৃপায় সেই দিন হইতে দিদির হাতের বেদনা ও ফুলা একেবারে নিরাময় হইয়া গেল।

ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল দুই দিন পূর্ব্বে বেলা দুটা-আড়াইটার সময়। মঠের সকলের প্রসাদ পাওয়া হইয়া গিয়াছে। ললিতা দিদি, কুসুম দিদি, বিনোদিনী দিদি প্রভৃতি কয়েকজন প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের আদেশ, প্রসাদ পাইবার সময় কেহ বাজে কথা বলিতে পারিবে না। তাই ইঁহারা নানাবিধ লীলা-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে প্রসাদ পাইতেছেন। হঠাৎ একটা বিড়াল সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

কয়েক দিন পূর্ব্বে রান্নাঘরে বিড়াল ঢুকিয়া ভোগের দ্রব্যাদিতে মুখ দিয়াছিল বলিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের আদেশে প্রায় তিরিশ সের চাউলের অন্ন ও তদুপযোগী ডাল তরকারী সমস্ত মাটিতে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া ফেলা হইয়াছিল। এবং অতি সন্তর্পণে ঘর পরিষ্কার করাইয়া পুনরায় ললিতা দিদিকে দিয়া রন্ধন করাইয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইয়াছিল।

সেইদিন হইতে মঠের সকলের মনেই বিড়ালের উপর একটা কেমন অশ্রদ্ধা ভাব জন্মিয়াছিল, তাই আজ বিড়ালটি যেমন উঁহাদের নিকটে আসিয়া 'ম্যাঁও' করিয়া ডাকিয়াছে, অমনি দিদি তাহাকে বাম হাতে মাথার উপর একটা চাপড় মারিয়াছেন। যদিও চাপড়টি খুব জোরে মারেন নাই তথাপি বিড়ালটির মুখ ঘরের মেঝেতে ঠুকিয়া যাওয়ায় সে আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সেই জন্যই দিদির হাতের যন্ত্রণা ও ফুলা, আর তার ফলেই বড় বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ কৃপাশাসন ও দিদিকে উপলক্ষ করিয়া এই সব উপদেশাদি দান।

আর একবার দিদি ভোগ রান্নার বাসনের উপর অসাবধানতাবশতঃ চরণ-ধৌত জল ফেলিয়া কয়েকদিন পায়ের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়াছিলেন। শেষে বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"নিশ্চয়ই কোন অপরাধ হইয়াছে। অনুসন্ধান ক'রে তার জন্য অনুতপ্ত হও, ভাল হয়ে যাবে।" সেবারেও চিন্তা করিতে করিতে

উপরোক্ত ঘটনা মনে হওয়ায় শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সম্মুখে অপরাধ-ক্ষমা চাহিয়া দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া রোগমুক্ত হন।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তথাকথিত বাবুরা এসব বিশ্বাস তো করিবেনই না বরং গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। তাঁহাদের বিশ্বাস করাইবার মত যুক্তি হয়তো আমি দেখাইতে পারিব না, তর্ক করিবার ক্ষমতাও হয়তো আমার নাই; কিন্তু তা বলিয়া সত্য ঘটনা যাহা চোখের সম্মুখে ঘটিয়াছে, গোপনে—নিভৃত কক্ষে নয়, দশজনের সম্মুখে প্রকাশ্যে, তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হওয়ার কোন কারণই আমি খুঁজিয়া পাই না। অধিকন্তু আমার মনে হয়, অবিশ্বাসীর বিশ্বাস আনয়ন জন্য এ সকল ঘটনা প্রকাশ না করাই অন্যায়। তাই দিদির জীবনী প্রকাশ করিতে যাইয়া যতটুকু যেখানে সত্যের সন্ধান পাইয়াছি ভক্ত পাঠকগণকে তাহা উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমার কর্ত্তব্য আমি করিলাম, এখন পাঠকগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

রোগীর সেবা তাঁরই সেবা

একবার পুরীতে রথযাত্রার অব্যবহিত পরেই কলেরার অত্যন্ত প্রকোপ দেখা দেয়। একটি উৎকলবাসিনী বৃদ্ধা ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া দৈবক্রমে মঠের আশ্রয়ে আসিয়া পড়েন। ললিতাদিদি তাঁহার সর্ব্ববিধ সেবাশুশ্রূষার ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েক দিন পরে রোগমুক্ত হইলেও দুর্ব্বলতা-বশতঃ নিজে হাতে করিয়া কিছু খাইতে পারেন না। কাজেই দিদি তাঁহাকে যথাযথভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিতেন।

দিদি একদিন বিশেষ কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার খাবার দিতে বিলম্ব হইয়াছিল, স্মরণ হওয়ামাত্রই খাবার লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত সহকারে মুখে তুলিয়া দিতে উহা মাটিতে পড়িয়া গেল। পুনরায় তুলিয়া দিতে বুভুক্ষু

উৎকলবাসিনী বৃদ্ধা অজ্ঞাতসারেই দিদির একটি আঙুল কামড়াইয়া দেয়। তাহাতে ক্ষত হইয়া দিদির দৈনন্দিন সেবার কার্য্য বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে।

দিদির মনে বড় ক্ষোভ। বড় বাবাজী মহাশয়ের সেবার কার্য্য কিছু করিতে পারিতেছেন না। অবশ্য দিদির সেবার অভাবে বাবাজী মহাশয়েরও যে অসুবিধা না হইতেছে তাহা নহে। কারণ ললিতাদিদি যেভাবে যেটির পর যেটি বাবাজী মহাশয়ের মনোমত করিয়া দিতেন অন্য কেহ সেরূপভাবে পারিতেন না। তাই দিদির দুঃখ।

আজ বাবাজী মহাশয় আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় অন্যান্য মঠবাসীদের সঙ্গে দিদিও গিয়া তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়াছেন। ভক্তগণ যাহার যাহা জিজ্ঞাস্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাবাজী মহাশয়ও যথাযথ উত্তর দিতেছেন। দিদির ক্ষত স্থানে কোনরূপ আঘাত লাগে সেই ভয়ে দিদি হাতখানি বাবাজী মহাশয়ের পালঙ্কের উপর একধারে রাখিয়া দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন। হঠাৎ বাবাজী মহাশয়ের এক পদাঘাত সজোরে দিদির হাতের উপর ক্ষতস্থানে পড়িল।

দিদি মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরাশায়িনী হইলেন। ক্ষতস্থান হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজরক্ত প্রচুর পরিমাণে বাহির হইয়া ঘরের মেঝে ভাসিয়া গেল। উপস্থিত সকলেই দিদির শুশ্রূষায় ব্যস্ত হইলেন। কিছু সময় পরে দিদির চৈতন্য হইলে সকলে ধরাধরি করিয়া বসাইয়া দিলেন।

বাবাজী মহাশয় পালঙ্কের উপর থাকিয়া দিদির অবস্থা সকলই দেখিতেছেন। দিদি উঠিয়া বসিয়াছেন দেখিয়া বাবাজী মহাশয়ও ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ললিতা! সেবা করছিলে কার? তোমার ঠাকুর কি তোমার সেবাগ্রহণ-জন্য ঐ রূপ ধ'রে আসতে পারেন না?"

ললিতা।—আমি যে চিরবহির্মুখী, পদে পদে ঠেকেও যে আমার চৈতন্য হচ্ছে না।

বাবাজী।—তোমার অপরাধ কোথায় বুঝ্‌তে পেরেছ? যদি বুঝে থাক তবে অকপটে এদের সাম্‌নে সব কথা প্রকাশ ক'রে বল।

ললিতা।—এতক্ষণে আপনার কথায় আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। আমি সেদিন সেই বৃদ্ধা রোগিণীকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে মনে করিয়াছিলাম—একে সেবা করতেই যদি আমার এত সময় যায় তবে আর আমার শ্রীগুরু গোবিন্দের সেবা কখন হবে? ঠিক এইরূপ ভাবনার পরেই আমার এই দুর্দ্দশা। আমি আমার এই কৃত অপরাধের জন্য সকলের কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বাবাজী।—এ সকলের কাছে ক্ষমা চাইলে হবে না। যাও, যার কাছে অপরাধ করেছ তার কাছে গিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে ক্ষমা চাও। তোমাদের দেখ্‌ছি কিছুতেই চৈতন্য হবে না। ঐ যে পণ্ডিত মশাইরা বলেছেন না—

"শর্করা শত ভারেণ নিম্ব বৃক্ষ উপার্জ্জিতং।
পয়সাসিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে॥"

বলা বাহুল্য, দিদি বাবাজী মহাশয়ের আদেশ মত বৃদ্ধার নিকট যাইয়া করযোড়ে সমস্ত নিবেদন করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা দ্বারা ক্ষত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।*

যতদিন বাবাজী মহাশয়ের নিকট দিদির থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল ততদিনই প্রত্যেকটি কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার কৃপাশাসন দ্বারা সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকটের পরও ঐকান্তিক বিশ্বাস-ভক্তিবলে দিদি এরূপ কৃপালাভে বঞ্চিত হন নাই। শ্রীধাম নবদ্বীপ অবস্থান কালে কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, যদি কৃপা করিয়া প্রকাশ করান তবে যথাযথস্থানে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন।

---

* পরমারাধ্য বড় বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপদ-পরশে দীন লেখকেরও একটি অতি ভীষণ ক্ষত বিনা ঔষধে ভাল হইয়াছিল। এবং তদানীন্তন বিলাত-ফেরত ডাক্তার সাহেব আর. এল. দত্ত মহাশয় উহা দর্শন করিয়া বাবাজী মহাশয়ের সহিত অনেক আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। ঘটনাটি লেখকের "আত্মকাহিনী"তে আছে।

দিদির নানা ব্যবহার

পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে আমরা দিদির কোন দেবদেবীর উপরই যে অশ্রদ্ধা ভাব ছিল না তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। সখীবেশ ধারণের পর বড় বাবাজী মহাশয়, নবদ্বীপ দাদা, গোবিন্দ দাদা প্রভৃতির শিক্ষা ও আচরণের দ্বারা এমনভাবে সখীজীবনে আচার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন যে, অনেক সময় বড় বড় পণ্ডিত মহাশয়দিগকেও ঐ সমস্ত দর্শন করিয়া বলিতে হইয়াছে—অপূর্ব্ব, অতুলনীয়, অদ্ভুত!

শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমনের পূর্ব্বে পুরীধামে অবস্থান সময়েও মঠে সত্যনারায়ণ পূজাদি হইত, তবে নবদ্বীপে আসিয়া নিয়মিতভাবে প্রত্যেক মাসে সংক্রান্তিতে ষোড়শোপচারে এবং একটা শনিবারে শনিপূজা ও রবিবারে দশোপচারে সত্যনারায়ণের পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কোন বৃহৎ উৎসব পর্ব্ব হইলে তাহার পর একদিন শ্রীমন্দির হইতে রাজরাজেশ্বরকে আনিয়া স্বতন্ত্রভাবে পূজার ব্যবস্থা করিতেন। পূজার জন্য দ্রব্যাদির আয়োজন বিষয়ে দিদি কখনও কোনরূপ কার্পণ্য করিতেন না। প্রত্যেক কার্য্যেই যথাবিধি দ্রব্যাদি প্রদান করিতেন।

বৈশাখ মাসে ইন্দ্রপূজা, বিশ্বকর্ম্মা পূজার সময়ে কলঘরে বিশ্বকর্ম্মা পূজা, দুর্গাপূজার সময় একখানি বড় চিত্রপটের সম্মুখে ঘটস্থাপনা করিয়া ষষ্ঠীর দিন হইতে বিজয়া দশমী পর্য্যন্ত যথাবিধি চণ্ডীপাঠাদি দ্বারা কাত্যায়নীর পূজা করাইতেন। দিদি বহুপরিশ্রমে একটি দুর্গাপূজা পদ্ধতি সংগ্রহ করিয়া হরিভক্তি বিলাস, আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যবস্থা মতে সংস্কার করিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই নিয়মেই পূজা হইত।

উপযুক্ত পুরোহিত এবং তন্ত্রধার থাকিলেও দিদি তাঁহাদের কাছে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য দেখাশুনা করিতেন। কালীপূজার সময়ও ঐরূপ চিত্রপট রাখিয়া

মায়ের পূজা হইত। এ ছাড়া, ঝুলন জন্মাষ্টমী রাধাষ্টমী গুরুপূর্ণিমা রাস দোল অন্নকূট প্রভৃতি যাবতীয় পর্ব্বই যথাযথভাবে পালন করিতেন। এমন কি মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথির আরাধনাও দিদির নিকট বাদ পড়ে নাই।

সমাজবাড়ীতে ঝুলনযাত্রা উৎসব শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চৌদ্দ দিন করিতেন। অক্ষয় তৃতীয়ায় জলকেলী, চন্দনযাত্রার সময় ঠাকুরকে নানা আভরণে বিভূষিত করিয়া সুসজ্জিত চৌদোলায় করিয়া কীর্ত্তনসহ নগর ভ্রমণান্তে নৌকায় লইয়া যাওয়া হইত। এই সময় তিন দিন দিদি সমাজ-বাড়ী হইতে বাহির হইতেন। বড়ালঘাটে যাইয়া দিদি নৌকায় উঠিতেন। ভাগ্যবান বলাই মিস্ত্রী তিন দিনই দিদিকে ঘাটের উপর হইতে কোলে করিয়া লইয়া নৌকায় তুলিয়া দিতেন। ঐ ভাগ্যবান যতদিন বাঁচিয়াছিলেন এ নিয়মের ব্যাতক্রম হয় নাই। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় দিদি নিজহস্তে সকল গুরু-ভ্রাতাদের কপালে কজ্জল চন্দনাদির ফোঁটা দিতেন এবং নানাবিধ পক্কান্ন মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়া সকলকে প্রসাদ দিতেন।

এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব দর্শন-লালসায় নবদ্বীপ ব্যতীত অনেক দূর-দূরান্তর হইতেও ভক্তগণ সমবেত হইতেন। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় রামদাদাও ঐ সময় যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন আসিয়া দিদির নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার হাতে ফোঁটা গ্রহণ করিতেন।

নবদ্বীপে বড়বাবাজী মহাশয়ের শুভাগমনেই একটা নূতন ভাবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল ; তাহার উপর আবার এই ললিতাদিদির আগমনে ভাবটা যেন আরও একটু জোরাল হইয়া উঠিল। সর্ব্বসাধারণে তো আসা যাওয়া করেই, পণ্ডিত মহাশয়েরাও সময় সময় দল বাঁধিয়া আসিয়া দিদিকে দেখিয়া যান। জনসমাজে কিভাবে যেন প্রচার হইয়া পড়িল যে, ললিতা সখী নাম্নী লোকটি পুরুষদেহধারী, অগাধ পণ্ডিত এবং উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত। গুরুর আদেশে সখীবেশ ধারণ করিয়া আছেন। বোধহয় পণ্ডিত মহাশয়গণ কৌতূহলের বশবর্ত্তী

হইয়াই আসিতেন যে, এতবড় পণ্ডিত হইয়া স্ত্রীলোকের বেশধারণ করিয়া নিজ প্রতিভাকে কি করিয়া চাপা দিয়া ঘরের কোণে বসিয়া আছেন তাহা দেখিতে।

আখড়ায় আখড়ায়, মন্দিরে মন্দিরে, বাবুভায়াদের বৈঠকখানায় এমন কি দু'পাচজন মিলিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতেও দিদির সম্বন্ধেই নানাপ্রকারের সত্য-মিথ্যা আলোচনা চলিয়াছে। যার যেমন জ্ঞান, যার যতটুকু ধারণা করিবার শক্তি, সে সেই ভাবেই দিদির ভাবের ও বেশের বিষয় লইয়া আলোচনা করে। কয়েকজন প্রচার করিয়াছেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে ইনিই নবদ্বীপ 'চৈতন্য চতুষ্পাঠী'তে এক ব্রহ্মচারীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছিলেন। আবার কেউ বলে, রাজার ছেলে চক্রান্তে পড়িয়া বিষয়-বৈভবে বঞ্চিত হইয়া এইভাবে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছে। কেউ বলে, বি-এ পাস করিয়া মাথা খারাপ হওয়ায় নিজেকে এইভাবে সাজাইয়াছে। কেউ বলে, বিয়ে করেছিল, বৌ ম'রে যেতে শোকে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এমন কি খুনী আসামী সাজাতেও কেউ কেউ কসুর করে নাই। যাঁহারা দিদির পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন তাঁহারা এই সব ভিত্তিহীন আলোচনা শুনিয়া মনে মনে হাসিতেন মাত্র।

"ভিন্নরুচির্হিলোকাঃ" নানাবিধ রুচির লোক নানাপ্রকার আলোচনা করিবে এ আর আশ্চর্য্য কি! কোনরূপ আলোচনা কাহারও রুচিকর না হইলে ঘোর প্রতিবাদ ওঠে, কেহ কেহ দিদির নিকট আসিয়া সকল কথা জানায়ও। দিদি কিন্তু কোনরূপ বিচলিত না হইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে তাহাদিগকে শান্ত করিয়া মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া একে একে বিদায় করেন। অন্তরঙ্গ কাহাকেও পাইলে বলেন—"নবদ্বীপবাসী কি আলোচনা করবার আর কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না? একটা নগণ্যা অদৃশ্যা অস্পৃশ্যার কথা নিয়ে এত মাতামাতি করছেন কেন?"

এই সময় বাধ্য হইয়াই দিদিকে অনেক সময় ঘরের মধ্যে থাকিতে হইত।

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মঠের সেবকগণ তাঁহাকে বাহিরে আসিতে দিতেন না বা কাহারও সহিত বিশেষভাবে মেলামেশা করিতে দিতেন না।

বাহিরে লোকের সহিত বেশী মেলামেশা না করিলেও দিদির নিয়মিত কার্য্যপদ্ধতির কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই। যে তিথিতে যে ভাবের পূজা অর্চ্চনা করা প্রয়োজন দিদি নিখুঁতভাবে তাহা করিতেন। যদিও মঠের নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত দ্বারাই দেব দেবীর পূজা অর্চ্চনার কার্য্য করা হইত তথাপি দিদি নিজে উপস্থিত থাকিয়া কি প্রণালীতে কি ভাবে অর্চ্চনাদি করিতে হইবে তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কখনও ইহার ব্যতিক্রম হইতে আমরা দেখি নাই।

এক সময় শ্রীধাম নবদ্বীপের কয়েকজন পণ্ডিত দিদির এই সব বিধিব্যবস্থা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—"শাড়ী প'রে ঘরের কোণে ব'সে থাকলে কি হবে, ওঁর কাছে আসল কাজে ফাঁকি দেওয়া চলবে না। বাপ রে বাপ, সব কাজে কি সূক্ষ্ম কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!"

বৈষ্ণব বাবাজীর মঠে দেবীর পূজা হয়! প্রথম প্রথম এই বিষয় লইয়া নবদ্বীপ বৈষ্ণব বাবাজী মহলে বেশ একটু সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু শেষে যখন সকলে মিলিয়া বিশেষতঃ কয়েকজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত দিদির সহিত প্রকাশ্য আলোচনা করিয়া ও সেবা-পূজা পদ্ধতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—"ইহা কোনরূপ অশাস্ত্রীয় বা অযৌক্তিক নহে।" তখন সকলে শান্ত হন।

এই সময়েই পণ্ডিত মহাশয়গণের বিশেষ আগ্রহে বড় বাবাজী মহাশয়ের পূর্ব্বনির্দ্দেশমত দিদিকে একখানি দুর্গাপূজা পদ্ধতি লিখিতে হইয়াছিল। এখন পর্য্যন্তও সেই পদ্ধতি অনুসারে সমাজ-বাড়ি ও ইহাঁদের মতাবলম্বী ভক্তগণ নিজ নিজ বাড়িতে পূজা করিয়া আসিতেছেন।

স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহাশয়গণ দিদির সহিত আলোচনা করিয়া প্রীতনিবৃত্ত হইলেও সমালোচনা একেবারে বন্ধ হইল না। প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী

মহাশয়ের নিকট একদল বৈষ্ণব যাইয়া নালিশ করিলেন দুর্গাপূজা সম্বন্ধে। প্রভুপাদও তখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে দিদির সহিত একমত ছিলেন না; কাজেই আলোচনার সুযোগ মিলিল।

একবার মহাষ্টমীর দিন বাগান-বাড়িতে দিদির নির্দ্দেশমত পূজা চলিতেছে, প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় অযাচিত ভাবে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিদি যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া প্রভুপাদকে পূজাস্থলেই বসাইলেন। প্রভুপাদও পুরোহিত ও তন্ত্রধারকের পূজা-পদ্ধতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পূজা অন্তে প্রভুপাদ ধীরকণ্ঠে দিদিকে বলিলেন—"সখীজি! পূজা তো দেখলাম কিন্তু প্রচলিত পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে যেন স্থানে স্থানে অমিল হচ্ছে মনে হ'ল। এ পদ্ধতি কোন্ বিধি অনুসারে সংগৃহীত হয়েছে ?"

দিদি।—প্রভু! দাসীকে এ আবার কি জাতীয় পরীক্ষা কচ্ছেন? আপনার অবিদিত কি আছে ? আমি তো নিজের মনগড়া কিছু করি নি।" 'আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ' গ্রন্থে কাত্যায়নী দেবীর পূজার যেরূপ ব্যবস্থা আছে শ্রীগুরুদেবের আদেশমত আমি তো সেই অনুসারেই পূজার ব্যবস্থা করেছি।

প্রভুপাদ।—শ্রীগ্রন্থখা ন একটু আলোচনা করতে ইচ্ছা হয়।

দিদি।—সে আর বেশী কথা কি, দয়া ক'রে ভিতরে গেলেই হয়।

এই বলিয়া দিদি প্রভুপাদকে সঙ্গে লইয়া নিজের ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় গেলেন। সেখানে বসিয়া "আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ" গ্রন্থের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। প্রভুপাদ দিদির পূজা-পদ্ধতির সহিত গ্রন্থের বর্ণনা অবিকল মিল দেখিয়া এবং স্থানে স্থানে লীলাতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব দিদির নিকট শুনিয়া আনন্দাতিশয্যে সময় সময় কাঁদিয়া ফেলিতে লাগিলেন। শেষে উভয়ে উভয়কে দণ্ডবৎ করিয়া প্রেমপরিপ্লুত হৃদয়ে গদগদ কণ্ঠে প্রভুপাদ দিদিকে বলিলেন—"আজ আমার সুপ্রভাত, সন্দেহ নিরসন তো হ'লই, ভজন রাজ্যেরও একটি নূতন পথের সন্ধান গুরুকৃপায় মিলে গেল।"

বলা বাহুল্য, অতঃপর বহুক্ষেত্রে প্রভুপাদ এই ঘটনার বর্ণন করিয়া দিদির সংগৃহীত পূজা-পদ্ধতির সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

এঁরা কারা

নবদ্বীপে আগমনের পর হইতেই তিনটি লোকের উপর দিদির কেন জানি না একটু বেশী শ্রদ্ধাভক্তি দেখা যাইত। অবশ্য কাহাকেও তিনি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব কখনও দেখান নাই তথাপি সাধারণ দৃষ্টিতে যাহারা যতটুকু পাবার যোগ্য, এই তিনটি লোকের বেলা কেমন যেন দিদি একটু অন্যপ্রকার ব্যবহার করিতেন। ইহারা কে, কি উদ্দেশ্য সাধন জন্য দিদির নিকট আসিতেন আর দিদিই বা ইহাদের ভিতর কি ভাব দেখিয়া এ জাতীয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন তাহা দিদিই জানেন।

এই তিনটি লোকের নাম।—১। দেদার বক্স। ২। বিদেশী মেথর। ৩। মুরারী মুদ্দফরাস্। ইহারা বাগান বাড়িতে আসিলে দিদি ইহাদিগকে যত্ন করিয়া বসাইয়া, দণ্ডবতাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জানাইতেন এবং যখন যাহা ঠাকুরের প্রসাদ থাকিত তাহা দিয়াই ইহাদের সেবা করিতেন। আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, ইহারা স্বতন্ত্রভাবে কখনও আসিতেন না। যখন আসিতেন তিনজনে একত্রেই আসিতেন।

একদিন দিদির বসিবার বারান্দার সম্মুখে উঁহারা বসিয়া দিদির সহিত কথা বলিতেছেন, জিতেনবাবু প্রভৃতি নবদ্বীপের কয়েকজন সেখানে উপস্থিত। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কিছু বাল্যভোগের প্রসাদ পাইয়া উঁহারা চলিয়া গেলেন। হরিসভার নিকট থাকেন এক ভক্ত (নাম দিতে আপত্তি করিয়াছেন), উঁহারা চলিয়া যাইবার পর তিনি দিদিকে উঁহাদিগকে এরূপ সম্মানাদি করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দিদি প্রফুল্ল অন্তরে বলিলেন—"ভাই! এঁরা তিনটি বিশুদ্ধ সত্ত্বের আধার। এঁদের ভিতরে আমি সত্য সত্যই ব্রহ্মণ্যভাব বর্ত্তমান

দেখতে পাই। আমার একথা শুনে তোমরা হয়তো মনে তুঃখ পাবে, কিন্তু আমি অকপটে তোমাদের কাছে বলছি, এঁদের সেবা ক'রে আমি বড়ই সুখ পাই। তোমাদের বল্‌তে কি, এঁদের একটু সেবা করলে কর্ত্তার (বড়বাবাজীর) মুখে যেন আনন্দ ফুটে ওঠে। তোমরাও লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বুঝতে পারবে। ভাই! আমার আর কি আছে? তাঁর সুখ হ'লেই আমার সুখ। একদিন দাসীকে কৃপা ক'রে শ্রীমুখে বলেছিলেন—'গুরুসেবক গুরু সেবা ক'রে চরণপানে তাকাবে না, সেবক চাইবে গুরুদেবের সুখের পানে ও মুখের পানে।'

শ্রীগুরুদেবের অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত রামদাদার মুখে শুনেছি শ্রীগুরুদেব বলেছিলেন—"তোমার গুণবলে কোন কিছু নেই, এই কথা সব সময় স্মরণ রাখবে। কাজেই তোমার সম্বন্ধে কোন দোষের কথা কেউ বললে তৎক্ষণাৎ তা স্বীকার করবে। তার পর গত জীবন চিন্তা ক'রে দেখবে ঐ জাতীয় কোন দোষ ব্যবহারে প্রকাশ বা মনে জেগেছিল কি না! যদি অনুসন্ধানে না পাও তবে ভবিষ্যৎ জীবনে ঘটতে পারে ব'লে প্রাণে প্রাণে স্বীকার ক'রে নেবে। আর বুঝ্‌বে, অন্তর্যামীরূপে শ্রীগুরুদেব হৃদয়ে ব'সে তোমায় সতর্ক ক'রে দিচ্ছেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিদি যেন কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে, দৃষ্টি উর্দ্ধ। কাছে যাঁহারা ছিলেন ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছু সময় পরে দিদি বলিলেন—আবার বলিয়াছিলেন—

'আর একটা কথা, খবরদার ভাই! খোসা দেখিস না, ঠকে যাবি—পারিস তো ভিতরটা দেখিস। এবার প্রভুর প্রচ্ছন্ন অবতার, তাঁর শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবেতেই বেশী খেল্‌বে। সাজগোজে বড় অভিমান। গিরিশবাবু, শিশিরবাবুকে দেখ্‌ তো?' বলব কি ভাই এই সব কথা স্মরণ হ'লে আর আমি এঁদের শ্রদ্ধা না ক'রে থাকতে পারি না।"

দিদির এই সব অকপট অথচ যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তটি আর

কোন কথা বলিলেন না। প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কাঁদ কাঁদ স্বরে কেবল বলিলেন—"দিদি! ছিটেফোঁটা দয়া ক'রে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিও।"

দিদির বাহিরে গমনাগমন

বঙ্গাব্দ ১৩১২ সাল ১২ই ফাল্গুন রবিবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বড় বাবাজী মহাশয় আমাদের পার্থিব দৃষ্টির অন্তরালে নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন। নবদ্বীপ বাগানবাড়িতেই তাঁহার পূর্ণ সমাধি দেওয়া হয়। এইদিন হইতেই ঐ বাগানবাড়ির নাম আর একটি বাড়িয়া যায়। সকলে উহাকে সমাজ-বাড়ি বলিতে থাকেন। বর্ত্তমানে ঐ সমাধির উপর বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বড়বাবাজী মহাশয়ের একটি অষ্টধাতুর প্রমাণ শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং নিত্য অতি পরিপাটিরূপে সেবা চলিতেছে। বলিতে কি, ইহাও আমাদের আলোচ্য ললিতাদিদিরই অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি।

বড়বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকটের পর দ্বিতীয় দিনে ললিতাদিদি পুরী হইতে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। কয়েক দিন পূর্ব্বে পুরীধামে বড়বাবাজী মহাশয়ের সামান্য অসুস্থ সংবাদ যায়, তখন সেখানকার সেবকবৃন্দ দিদির নির্দ্দেশমত ঝাঁঝপেটায় নামযজ্ঞ আরম্ভ করেন। তারপর কয়েকদিন আর কোন ভালমন্দ সংবাদ না পাইয়া দিদি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এবং নামযজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিয়া কুঞ্জ দাদা, বিশ্বম্ভর দাদা, অপরা দাদা ও প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য গুরুদাস ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত দিদি নবদ্বীপ অভিমুখে রওনা হন। সে সময় কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ আসিতে হইলে কৃষ্ণনগর দিয়া আসিতে হইত। উঁহারা কৃষ্ণনগরে নামিয়া আসিতে স্বরূপগঞ্জের নিকট আসিয়া সংবাদ পাইলেন যে, গতকল্য বড়বাবাজী মহাশয়ের সমাধি হইয়া গিয়াছে।

সংবাদ শ্রবণ করিয়া দিদি উন্মাদিনীর মত হা-হুতাশ করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। সঙ্গীগণের প্রাণপণ চেষ্টায় কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া—"হায় কি হ'ল" "হায় কি হ'ল" বলিতে বলিতে নিজের মাথার বড় বড় চুলগুলি টানিয়া ছিঁড়িয়া মুঠা মুঠা করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীগণের সহযোগিতায় সঙ্গীগণ কোন রকমে দিদিকে নৌকায় করিয়া নবদ্বীপে আনিয়া উপস্থিত করেন।

বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সমাধিস্থানে যে ভাবে দিদি আক্ষেপ করিয়া আছাড়ি পাছাড়ি করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারাই জানেন, ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। যাহা হউক চারদিনের দিন যথারীতি মালসা-ভোগ দিয়া ১০।১২ দিন নবদ্বীপে থাকিয়া আবার পুরী চলিয়া যান। এবং সেখানকার মঠের সেবা-পূজার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া প্রায় আড়াই মাস পরে পুনরায় নবদ্বীপে আগমন করেন।

এই যে দিদি বাগানবাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করেন তদবধি নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিন ছাড়া অপ্রকট কাল পর্য্যন্ত বাগানবাড়ি ত্যাগ করিয়া কোথাও যান নাই। বৎসরের মধ্যে মাত্র পাঁচদিন দিদি বাগানবাড়ি হইতে বাহির হইতেন। চন্দন-যাত্রা উপলক্ষে তিনদিন, গঙ্গাপূজা করিতে ১লা বৈশাখ একদিন এবং বড় বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকট তিথি উপলক্ষে বিরাট মহোৎসবের শেষে রাত্রে সঙ্কীর্ত্তনসহ গঙ্গাস্নানে একদিন। এইদিন গঙ্গার ঘাটে যে বিরাট ভোগ গঙ্গা-দেবীকে নিবেদন করিয়া জলজন্তুগণের উদ্দেশে তিনি সমর্পণ করিতেন তাহা সত্য সত্যই এক দর্শনীয় ব্যাপার। বহুলোক সে সময় এই উৎসব দর্শন জন্য গঙ্গাতীরে সমবেত হইতেন।

নানাবিধ পক্কান্ন মিষ্টান্নাদি, বহুবিধ ব্যঞ্জনাদি সহ সাদা অন্নভোগ বড় থালায় করিয়া সাজাইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইত। তথায় দিদি নিজে গঙ্গাজল তুলিয়া নিবেদন করিয়া দুই হাতে করিয়া জলের মধ্যে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া দিতেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই কোথা হইতে অসংখ্য

ছোট বড় মৎস্য আসিয়া পরমানন্দে তাহা ভোজন করিত। দিদি কিছু সময় করযোড়ে দাঁড়াইয়া তাহাদের ভোজনলীলা দর্শন করিয়া স্নানান্তে আবার কীর্ত্তন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিতেন। দিদির অপ্রকটের পর এখনও এ উৎসব আশ্রমের সেবকগণ যথানিয়মে করিয়া থাকেন, তবে তদ্রূপ বিরাট আকারে অনুষ্ঠিত হয় না।

চন্দনযাত্রা উৎসব

একবার চন্দনযাত্রার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই দিদির শরীর খুব অসুস্থ বোধ হইতেছিল। চন্দনযাত্রা আরম্ভের দিন সকাল হইতেই খুব ভেদ বৌমী আরম্ভ হইল। চরণামৃত ছাড়া কোন ডাক্তার কবিরাজের ঔষধ গ্রহণ করিতে দিদি বরাবরই নারাজ। এবার নবদ্বীপের আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে এবং দিদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া মঠের সেবকগণ ডাক্তারবাবুকে ডাকিলেন। যথাসময়ে আসিয়া ডাক্তারবাবু দিদিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন— "এ সময় নবদ্বীপে এই ভাবের কলেরা বেশ দেখা যাচ্ছে। আজ সপ্তাহ দুই মধ্যে প্রায় ত্রিশ জন এই রোগে মারা গিয়েছে। আপনারা খুবই সাবধানে এঁকে রাখবেন। নিয়মিতভাবে ঔষধ খাইয়ে পুনরায় বৈকালে আমাকে সংবাদ দেবেন।" এই বলিয়া ডাক্তারবাবু ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভক্তগণ হতাশপ্রাণে দিদির সেবায় নিযুক্ত হইলেন। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া শেষে শ্রীবাস অঙ্গনের প্রভুপাদকে দিয়া অনুরোধ করাইয়া মাত্র দুইবার সময়মত ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে কিন্তু কোনই পরিবর্ত্তন নাই, পূর্ব্বের মতই ঘন ঘন বৌমী ও ভেদ হইতেছে, সকলেই সন্ত্রস্ত।

এই অবস্থার মধ্যেই দিদি নন্দদাদাকে ডাকিয়া যথাসময়ে ঠাকুর লইয়া চন্দনে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। ভক্তগণও পূর্ব্ব ব্যবস্থামত কীর্ত্তন সহযোগে চতুর্দ্দোলায় করিয়া শ্রীশ্রীযুগল কিশোরকে লইয়া যাত্রা করিবার উদ্যোগ আয়োজন

করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু কাহারও মনে সুখ নাই। দিদি কীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে যাইতেন, তাঁহার স্নেহ-প্রীতির টানে সকলে যাইত, আজ দিদি রোগ-শয্যায় শুইয়া আর ইহারা কি করিয়া—কার সঙ্গে আনন্দ করিতে যাইবেন? কিন্তু উপায় নাই, দিদি আদেশ করিয়াছেন, কাজেই যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া সকলে মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পত্র-পুষ্প-স্তবকে সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলার উপর সিংহাসনে যুগল কিশোরকে বসাইয়া চারিজনে বহন করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। দিদি সঙ্কীর্ত্তন যাত্রার উদ্দেশে দুটি হাত অতিকষ্টে কপালে ছোঁয়াইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

সেবকগণ সময়োচিত শুশ্রূষায় নিযুক্ত। দিদির চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে দেহে অসম্ভব কম্প দেখা যাইতেছে। নন্দদাদা কাঁদিতে কাঁদিতে দিদিকে ডাকলেন; ঠিক এইসময় একজন সেবক ঔষধ দিতে গেলে দিদি একটু বিরক্তভাবেই বলিলেন—"তোরা কি আমাকে সেবা-সুখেও বঞ্চিত করে রাখতে চাস? কেন ওসব ছাইভস্ম আমায় দিচ্ছিস? (ইঙ্গিতে বড় বাবাজী মহাশয়ের সমাজঘর দেখাইয়া) ওখান থেকে একটু চরণামৃত এনে আমার মুখে দে।"

সেবক ছুটিল বড় বাবাজী মহাশয়ের ঘরে। সেখান হইতে চরণামৃত আনিয়া দিদিকে খাওয়াইয়া দিলে দিদি অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে সংবাদ আসিল, 'ঠাকুর বড়াল ঘাটে আসিয়াছেন। আর যায় কোথা! দিদি ২।৪ জন সেবককে সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে বড়াল ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সকলেই সন্ত্রস্ত। দিদির দুর্ব্বল শরীর, এইভাবে চলিয়াছেন কখন কি হয় এই চিন্তাই সকলের মনে জাগিতেছে। কিন্তু না জানি কাহার শক্তি সকলকার অলক্ষ্যে তাঁহার দেহে সঞ্চারিত হইয়া আজ তাঁহার প্রাণবল্লভের লীলা-রসাস্বাদনে তাঁহাকে লইয়া চলিয়াছে! দিদির কোনদিকে লক্ষ্য নাই, মৃদু মৃদুস্বরে "জয়গুরু জয়গুরু" বলিতে বলিতে একমনে চলিয়াছেন।

যথাসময় ঘাটে উপস্থিত হইয়া অন্যান্যবারের ন্যায় নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য। তাহাদের মুখে ঘন ঘন হরিধ্বনি, মধ্যে মধ্যে মহিলাগণের উলুধ্বনি গঙ্গার ঘাটের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। একদল যুবক এক একবার 'বড় বাবাজী মহারাজ কি জয়' 'ললিতা মাই কি জয়' ধ্বনি দিতেছে। আমরা যে কয়জন কিছু পূর্ব্বেও রুগ্না ললিতা দিদির শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলাম তাহারা একধারে দাঁড়াইয়া স্তম্ভিতভাবে দিদির লীলাখেলা দেখিতে লাগিলাম।

যথাসময় ঠাকুর শ্রীমন্দিরে আসিয়া পৌছিলে দিদি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ও রজে গড়াগড়ি দিয়া নিজের ঘরের সম্মুখে গিয়া বসিলেন। এখন দিদিকে দেখিয়া কে বলিবে যে, ইনিই কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে অসুস্থ হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন ?

শ্রীচরণ-চিহ্ন

একদিন অপরাহ্নে কয়েকজন ভক্ত-সঙ্গে দিদির ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় ব্রজলীলা আলোচনা হইতেছিল। সম্মুখে একখানি মোটা গদী-আসন পাতা ছিল। কাহার জন্য সে আসন পাতা হইয়াছিল তাহা অপর কেহ জানেন না, দিদিই জানেন। আসনখানির উপরের কাপড়টি গাঢ় কালো রংয়ের ছিল।

প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ অবিরামগতিতে বন্যার স্রোতের ন্যায় আসিয়া বক্তা ও স্রোতা সকলকেই ভাবসাগরে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। বিশেষ কার্য্যে দিদিকে কয়েক মিনিটের জন্য উঠিয়া যাইতে হইল। কিন্তু প্রসঙ্গ বন্ধ হইল না। ভক্তগণ তখনও নিজেদের মধ্যে যথাসাধ্য আলোচনা করিতেছেন। সকলেই লীলা-রসাস্বাদনে ডগমগ। দিদি ফিরিয়া আসিবেন এবং পুনরায় লীলা-রস বিতরণ করিবেন সেই প্রতীক্ষায় আমরাও বসিয়া আছি।

যথাসময় দিদি আসিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিলেন। বসিয়াই

সম্মুখস্থ আসনখানির দিকে চাহিয়া দেখেন, কালো কাপড়ের উপর ছোট ছোট কয়েকটি ধূলামাখা পদ-চিহ্ন। দিদি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন এবং ভক্তগণকেও দেখাইলেন কিন্তু কেহই স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ পদ-চিহ্ন কোথা হইতে কিভাবে আসিল! আসন পাতিবার পর অত ছোট পদবিশিষ্ট কোন বালকবালিকা তো এখানে আসে নাই! সকলেই পদচিহ্ন দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন।

ক্রমেই এই সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা অতি সন্তর্পণে দর্শনার্থীকে দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু পাছে হাত লাগিলে দাগগুলি লুপ্ত হইয়া যায় সেইজন্য কাহাকেও ঐ চরণচিহ্নে হস্ত দিতে দিতেছেন না।

এদিকে দিদি অন্তরঙ্গ কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন—ব্যাপার কি? এক ভক্ত আর এক ভক্তকে বলিলেন—ঠাকুর নিজে বলিয়াছেন "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" এখানকার লীলাপ্রসঙ্গ শুনিতে কি তিনি আসিয়াছিলেন নাকি? অন্য ভক্ত উত্তরে বলিলেন—"তা ললিতাদিদি যেভাবে ব্রজলীলা আলোচনা করছিলেন তাতে তাঁর উপস্থিতি আশ্চর্য্য নয়।"

১ম ভক্ত।—আপনারা যে যা-ই বলুন না কেন, আমার মনে দৃঢ় ধারণা হচ্ছে যে, এ নিশ্চয়ই আপনাদের বাঁকা ব্রজবিহারীর রঙ্গ।

এই ভাবের নানাপ্রকার আলোচনা চলিতে লাগিল। শেষে আসনের উপরের কালো কাপড়খানি অতি সন্তর্পণে কাটিয়া লইয়া একখানি ছবির ফ্রেমে কাঁচ দিয়া বাঁধাইয়া রাখা হইল।

বহুদিন পর্য্যন্ত পদ-চিহ্নগুলি স্পষ্ট দেখা যাইত। অনেক দূরদেশাগত ভক্ত বাগানবাড়ীতে আসিয়া দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। দিদির ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় যেখানে বসিয়া লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনা হইতেছিল সেইখানেই দরজার উপরে ঐ বাঁধান ফ্রেমটি টাঙাইয়া রাখা হইয়াছিল। এখন যদিও পদচিহ্নগুলি

স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু সেইখানে সেই ভাবে ফ্রেমটি টাঙান রহিয়াছে এবং সে অত্যাশ্চর্য্য পদচিহ্ন প্রকাশলীলার সাক্ষ্য দিতেছে।

বালকবেশে আদেশ

সাধন-জগতে সাধক যত অগ্রসর হইতে থাকেন ততই তাঁহার নির্জ্জনতা ভাল লাগে। ভজন-রস আস্বাদনে বাধা দেয় জনকোলাহল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন—"সাধন করবে মনে, বনে আর কোণে।"

নবদ্বীপে গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সাধন-মহিমা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহু দর্শনার্থীর আগমন হইতেছে। নিজেকে আবরণ দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই জনসমাগম কমিতেছে না। শেষে তিনি এক ফিকির করিলেন। লোক-সংঘট্ট হইতে আপনাকে দূরে রাখিবার জন্য বাবাজী মহারাজ সমাজবাড়ীর ঝাউতলার নিকটস্থ একটি ভগ্ন শৌচাগারের মধ্যে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

বড়বাবাজী মহাশয়ের অদর্শনে সকলকেই অত্যন্ত ম্রিয়মাণ দেখিয়া একদিন তিনি দিদিকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—"তোরা কখনও মনে করিস না যে, সে (বড়বাবাজী মহাশয়) অপ্রকট হয়ে তোদের ছেড়ে কোথাও চ'লে গেছে। তোদের দৃষ্টির বাইরে আছে মাত্র। ইচ্ছে করলেই তাকে দেখ্‌তে পাবি। আমরা এখনও দেখি, কত কথা বলি।"

দিদি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন আবার তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বড়বাবাজী মহাশয়ের সমাজ দেখাইয়া বলিলেন—"এইখানেই সে সর্ব্বদা থাকে এবং থাকবেও। বৃথা হা-হুতাশ ক'রে লাভ কি? দেখবার ইচ্ছা প্রবল হ'লেই তাঁকে দেখ্‌তে পাবি রে দেখ্‌তে পাবি।" দিদি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বড়বাবাজী মহাশয়ের সমাজ প্রদক্ষিণ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

বাগানবাড়ী যখন বাবাজী মহাশয়ের হাতে আসে তখন উহার মধ্যে

একটি স্থানে খুব বড় একটি বাঁধান তুলসীমঞ্চ ছিল। কি জানি কি উদ্দেশ্যে বাবাজী মহাশয় ঐটি দেখাইয়া নিজ সঙ্গীদের একদিন বলিয়াছিলেন—"আমার স্থান এইখানে।" লীলাময়ের লীলাভঙ্গী বুঝিবার সাধ্য আমাদের নাই, আমরা শুধু যতটুকু কৃপা করিয়া দেখাইতেছেন ততটুকু দেখিয়াই জীবন ধন্য করিতেছি। সেদিন বাবাজী মহাশয় সঙ্গীদের যে স্থানটি দেখাইয়াছিলেন ভবিষ্যতে সেই স্থানেই বড়বাবাজী মহাশয়ের পূর্ণ সমাধি দেওয়া হইয়াছিল এবং পরে তাহার উপরেই মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

বড়বাবাজী মহাশয়ের সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ সময়ে একটি সুন্দর বালক মঠে উপস্থিত হইয়া দিদিকে বলিয়াছিলেন—"তোরা যে দেখ্‌ছি গুরুর সমাজ-মন্দির তৈরী নিয়েই মেতে আছিস, পরম গুরু কি কেউ নয়? তাঁর সমাজ যে ধূলাবালি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।"

বালকটি মাত্র এই কথা কয়টি বলিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। দিদি দেখিলেন, কথাও শুনিলেন, আর যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও দেখিলেন এবং কথা শুনিলেন কিন্তু কর্ম্মব্যস্ততায় কেমন যেন তন্ময় হইয়া কেহই পরিচয় লইলেন না। বালকটি অদর্শন হইলে তখন সকলের চৈতন্য হইল। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও আর তাহার কোনরূপ সন্ধান মিলিল না।

এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন—বড়বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকটের মাত্র দুই দিন পরেই তাঁহার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীমৎ গৌরহরিদাস মহান্ত মহারাজ অপ্রকট হন। বড়বাবাজী মহারাজের সমাজের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের জমিতেই ইহার সমাধিস্থান। ললিতাদিদি পূর্ব্বোক্ত বালকটির কথা ঠাকুরেরই প্রত্যাদেশ স্বরূপে মানিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই পরম গুরুদেবের সমাজ-মন্দির প্রথমে নির্ম্মাণ করাইয়া পরে শ্রীগুরুদেবের সমাজ-মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

বাগানবাড়ী প্রাপ্ত ও নিতাই-গৌর আগমন

নবদ্বীপবাসী প্রাতঃস্মরণীয় গুরুদাস দাস (কাঁশারী) মহাশয়ের পৌত্র মহীতোষ দাস মহাশয় মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে অর্থের প্রয়োজন বশতঃ বাগানবাড়ীটি বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করায় ৫০০৲ শত টাকা অগ্রিম বায়না দেওয়া হয়। শেষে দলিল লিখিয়া ৩০০০৲ টাকায় বিক্রয় কোবালা করিয়া দিবার সময় মহীতোষবাবু ঐ ৫০০৲ টাকা ফেরত দিতে চাহিলে দিদি বলিয়াছিলেন, "দাদা! ও পাঁচ শত টাকা তো মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধের জন্য দেওয়া হইয়াছে, উহা আর ফেরত দিতে হইবে না।" তাহা ছাড়া বড় বড় তিনটি ঝাউগাছের দরুণ আরও তিন শত টাকা দেওয়া হইল।

এই ব্যাপারে শুধু মহীতোষবাবু নহেন, যাঁহারা বাগানবাড়ী যাহাতে বাবাজী মহাশয়ের হাতে না যায় তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন কি বাগানের মূল্য বাড়াইয়া মালিকের মন ভাঙ্গাইতেও যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারাও বিস্মিত হইয়া গেলেন। অনেকে প্রকাশ্যেই বলিতে লাগিলেন যে, "এ বাবাজীরা সাধারণ বাবাজী নয়, এদের প্রাণ খুব উচ্চ ধরণের, এরা মঠের খুব উন্নতি করবে।" ইত্যাদি।

বাংলা ১৩১২ সালের বসন্ত পঞ্চমী দিনে বড় বাবাজী মহাশয় ভোগরাগাদি দিয়া বাগানবাড়ীতে প্রবেশ করেন। তারপর নিত্যানন্দ ত্রয়োদশীতে কীর্ত্তন মহোৎসব করিয়া কলিকাতা রহনা হইয়া যান এবং ভাগ্যবান মাণিকলাল মল্লিক মহাশয়কে বাগানবাড়ীর খরিদ সম্বন্ধে অর্থাদি দেওয়া ও দলিলাদি করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

প্রথম বাগানবাড়ী প্রবেশ করিয়া বড় বাবাজী মহাশয় যে সকল প্রভু-সন্তান, আচার্য্য-সন্তান ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়গণের বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীবাস অঙ্গনের প্রভুপাদ প্রতাপচাঁদ গোস্বামী, হরিদাস

মহান্ত, ভাগবৎদাস মহান্ত, তারাপ্রসন্ন বাগচী, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হাজারীলাল মুখোপাধ্যায়, ধর্ম্মদাস রায়, সত্যনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন পরে বিচারপতি বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী, রাণাঘাটের সৌরীন্দ্রমোহন দে চৌধুরী, সদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অসংখ্য ভক্তের সহিত দিদির পরিচয় হয়। সকলের নাম প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার।

একদিন বৃদ্ধ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহাশয় ধীরে ধীরে দিদির নিকট গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দিদি শ্রীগুরুদেবের ও পরম গুরুদেবের সমাজমন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে রাজমিস্ত্রীর সহিত কি কথা বলিতেছিলেন। বাবাজী মহাশয়কে দেখিয়া ফিরিয়া করযোড়ে দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, "দেখ ললিতা! আজ থেকে বারো বৎসর পরে দুটি ব্রাহ্মণ-সন্তান অপ্রত্যাশিত ভাবে তোমার এখানে আসবেন, তাঁদের যত্ন ক'রে রেখো, মঙ্গল হবে।"

বলা বাহুল্য, ঠিক বারো বৎসর পরেই অযাচিতভাবে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ যুগল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিদি যথাবিধি অভিষেকাদি করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষভাবে সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপিও সেই নিয়মে সেবা চলিতেছে।

চন্দনযাত্রার পদত্রয়

"সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর।
সর্ব্বত্র মাগি লবে ইষ্টভক্তি বর॥"

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর মহাশয়ের এই উক্তি দিদির জীবনে বহুভাবে বহু সময় বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়া আমরা সার্থক হইতে দেখিয়াছি। পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে কিছু কিছু পরিচয় পাঠকগণ পাইয়াছেন। সখীবেশ ধারণের পরও পুরীধামে ঝাঁঝপেটা মঠে এবং নবদ্বীপ বাগানবাড়ীর সর্ব্ব দেবদেবীর

পূজার্চ্চনাদির মধ্য দিয়া কিছু কিছু ঘটনা এই খণ্ডে পূর্ব্বে বলিয়াছি, পরেও বলিবার ইচ্ছা রহিল। আজ আর এক প্রকার আস্বাদনের সংবাদ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

চন্দনযাত্রার সময় সুসজ্জিত চৌদোলায় ঠাকুরকে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে নৌকায় যাওয়া হয়। সেখানে সময়োচিত নৃত্য-কীর্ত্তনাদি সহ নৌকা-ভ্রমণান্তে মঠে ফিরিবার সময় নবদ্বীপ 'পোড়ামা তলা' ঘুরিয়া আসা হয়। একবার ওখানে মায়ের মন্দির সম্মুখে চৌদোলা নামাইয়া সকলে কীর্ত্তন করিতেছেন। কিছু সময় খুব মাতামাতি কীর্ত্তন হওয়ার পর দিদি নিজে পদ ধরিলেন—

"যোগমায়া যোগেশ্বরী দেবী পৌর্ণমাসী।
তোর দ্বারেতে চাঁদের বাজার উঠে দেখ মা আসি ॥
(সবার) হাতে চাঁদ পায়ে চাঁদ আর চাঁদ কপালে।
চৌদিকে চাঁদের মালা নাচে কুতুহলে ॥
কি ছার গগন-চাঁদ এ চাঁদের আগে।
(তাই) দশ নখে দশ খণ্ড হৈয়া রহে অনুরাগে ॥
যমুনায় নৃত্য-রাস করি নৌকোপরি।
তুয়া দরশনে এলেন কিশোরা কিশোরী ॥
এই কর মা জগদম্বে! করুণা করিয়া।
সুখে থাকুক যুগল লীলা-রসেতে ডুবিয়া ॥
আশীর্ব্বাদ কর মাগো! প্রণতি চরণে।
লয়ে যাই যুগল চাঁদে নিকুঞ্জ কাননে ॥"

মায়ের নিকট এই পদ নানা প্রকার আখর দিয়া দিদি সঙ্গীগণ-সঙ্গে বহু সময় কীর্ত্তন করিলেন। ললিতা সখী নিজে মায়ের সম্মুখে কীর্ত্তন করিতেছেন এই সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া গেল। যে যেমন অবস্থায় ছিলেন সেই ভাবেই, কীর্ত্তন শ্রবণ এবং ললিতা মাকে দর্শন উভয় আকাঙ্ক্ষার টানে ছুটিয়া

আসিলেন। দিদি মায়ের কাছে গান শেষ করিয়া ধীরে ধীরে মহাদেবের নিকট চলিলেন। সেখানেও সঙ্গীগণের কীর্ত্তন কিছু সময় হইবার পর দিদি পূর্ব্বের ন্যায় নিজে পদ ধরিলেন—

"গোপগোপী হিতকারী দেব গোপেশ্বর।
(হের) তুয়া দরশনে এলেন কিশোরী কিশোর॥
তুমি দেব নিরঞ্জন অনাদির আদি।
(দেখো) যুগল রসাস্বাদে যেন কেহ না হয় বাদি॥
এ হেন করুণাকর দেব আশুতোষ।
(মোদের) গুরু দুরুজন যেন থাকয়ে সন্তোষ॥
করিয়ে প্রণতি আশিস্ কর ত্রিপুরারী।
(মোরা) যুগলসহ কুঞ্জে যাই সব সহচরী॥"

এই ভাবে যোগমায়া যোগেশ্বরী ও গোপেশ্বর দেবের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া যুগল লইয়া গমন করিতে করিতে গান ধরিলেন—

নেচে নেচে যায় গো মোদের যুগল রাধাশ্যাম।
যুগল রাধাশ্যাম গো রূপ রসময় ধাম॥
আধ কণককাঁতি নব বিজুরী ভাঁতি
আধ রসে ঢর ঢর নবঘন শ্যাম।
(আধগলে) বনফুল মালা বামে চূড়াটি হেলা
আধগলে গজমতি দোলে অবিরাম॥
কিয়ে কমলে ভ্রমর কিয়ে চাঁদেতে চকোর
চাতকিনী বিনোদিনী নবঘন শ্যাম।
কিয়ে জলদ কোলে নব বিজুরী খেলে
কত রস বরিখয়ে নয়ানে নয়ান॥
করে মোহন মুরলী রাই অঙ্গে পড়িছে ঢলি
অঙ্গে অঙ্গ হেলাহেলি যেন রতি-কাম॥

যত সখী মঞ্জরী সবে যায় সারি সারি
মাঝে কিশোর কিশোরী অপরূপঠাম॥
নাচে ময়ূর ময়ূরী গায় শুক আর শারী
ফুলে ফুলে ভ্রমরা ভ্রমরী করুগান॥
(দোঁহার) বয়ানে বয়ান (দোঁহার) নয়ানে নয়ান
কুবলয় চাঁদ মিলল একঠাম॥
কিবা অপরূপরূপ তুঁহু নবরসভূপ
রসে তনু গর গর রসময় ধাম॥

পাঠকগণ! লক্ষ্য করুন কি জাতীয় ভজন, কি জাতীয় ভাব আর কি জাতীয় নিষ্ঠা সহকারে সর্ব্বত্র অকপট প্রাণে ইষ্টসেবা প্রার্থনা। আজ আমরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত তো বটেই, নিজ নিজ সম্প্রদায় মধ্যেও সামান্য সামান্য ঘটনা লইয়া 'আমার মত ঠিক' 'আমার ঠাকুর বড়' 'আর সব ভূয়া' ইত্যাদি বলিয়া ঝগড়া মারামারি করিয়া মরিতেছি। হায় রে অদৃষ্ট !!

শারদীয়া পূজার আদেশ

স্বগণ-সঙ্গে ঝাঁঝপেটা মঠে বড় বাবাজী মহাশয় বসিয়া বসিয়া পৌরাণিক প্রসঙ্গ করিতেছেন। বেলা প্রায় সাড়ে চারটা। হঠাৎ দুর্গাপূজার প্রসঙ্গ উঠিল। একজন ভক্ত বলিলেন—এই শারদীয়া পূজার প্রচলন কখন হয় আর কে করেন ?

বাবাজী।—শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-বধের জন্য অকালে বোধন ক'রে দেবীকে জাগিয়ে এই পূজা করেছিলেন। তবে পূর্ব্বে যে মায়ের পূজার ব্যবস্থা ছিল না তা নয়। বসন্তকালে বাসন্তী পূজা হইত, এখনও বহুস্থানে হয়। দুর্গার একটি নাম বাসন্তী। এই প্রসঙ্গে অনেক কথা মনে পড়ে। মাকে অকালে আবাহনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র পুরোহিত নিয়োগ করতে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন।

দেবগুরু বৃহস্পতির আদেশ অকালে মাকে সে-ই জাগাতে পারবে যার একদিনের জন্যও মাতৃ আরাধনায় বাধা পড়ে নি। বশিষ্ঠাদি অনেকেই স্পষ্ট স্বীকার করলেন, কোন না কোন কারণে আমাদের আরাধনা বাদ পড়েছে। শেষে বৃহস্পতিই আদেশ করলেন যে, রাবণের নিকট যাও। তখন রামচন্দ্র রাবণের নিকট সমস্ত বিষয় জানালে রাবণ নিজ-নিধন কামনায় পূজার আয়োজন জেনেও সানন্দমনে পৌরোহিত্য স্বীকার ক'রে নিলেন। রাক্ষস হ'লেও শরণাগতের বাসনা পূরণে কার্পণ্য করতে পারলেন না। বাবা! মহৎ যে হয়, তাঁর সমস্ত কার্য্যই বিশেষ বিচারণীয়।

ভক্ত।—বাবা! রাবণের কথা অন্য এক সময় শুনব, এখন এই পূজার কথা কিছু বলুন।

বাবাজী।—এ পূজার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই যে এই প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

এই বলিয়া সংক্ষেপে সেই পৌরাণিক উপাখ্যানটি বলিয়া শেষে ললিতা দিদিকে বলিলেন—"আগামীকাল শারদীয়া দুর্গাপূজার অধিবাস, তাই জগদ্বাসী জীবমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, কাল হ'তে এই মঠে জগদম্বার পূজা আরম্ভ হবে, তোমরা সব বন্দোবস্ত ঠিক কর।"

ললিতা।—কি ভাবে কি আয়োজন করতে হবে, প্রাতমা কোথায় পাওয়া যাবে, পূজক পুরোহিতই বা কাকে ঠিক করা হবে সব ব'লে দিন ?

বাবাজী।—মায়ের চিত্রপট রেখে তার সুমুখে ঘট স্থাপনা ক'রে যথাবিধি পূজা হবে। সকলেই মায়ের সন্তান, যাকে তিনি কৃপা ক'রে অঙ্গীকার করবেন সে-ই পূজা করবে। সেজন্য ভেবো না।

ললিতা।—কি কি দ্রব্য প্রয়োজন ?

বাবাজী।—মায়ের পূজায় লাগবে—অনুরাগ মাখান প্রাণ, মন, আত্মত্যাগ, অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির লোভ, আত্ম-সুখ-বিবর্জ্জিত কাম অর্থাৎ প্রেম, কৃষ্ণপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা, নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাস প্রভৃতি। আর এদিকের পূজায় চাই তুলসী, বিল্বপত্র, আম্রশাখা, ফুল, চন্দন, দূর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল, পক্ক কদলী, অন্যান্য ফল

মিষ্টান্নাদি। মোটকথা—কৃষ্ণপদে সেবা, ভক্তি, রতি, মতি কামনায় যতপ্রকার উপহার দিবার বাসনা থাকে ইচ্ছামত মাকে তা দিতে পার। এ ছাড়া অন্য কোন বিধি বিধান জানবার আবশ্যক মঠবাসী তোমাদের নেই। যারা ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন রসময় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মধুর ভাবের উপাসক তারা সব দেবদেবীকেই পূজা ক'রে তাঁদের কৃপা গ্রহণ করবে। মনে রেখো যোগমায়ার কৃপা ভিন্ন কোন মতেই অভীষ্ট লাভ হবে না। ব্রজগোপীগণ কাত্যায়নী ব্রত ও গোপেশ্বর মহাদেবের পূজা ক'রে তবে কৃষ্ণকে পতিভাবে পেয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কাত্যায়নীপূজার পর গোপীগণের সম্মিলিত প্রার্থনা—

কাত্যায়নি মহামায়ে! মহাযোগীন্যধীশ্বরি।
নন্দ গোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

এই বলিয়া বাবাজী মহাশয় পুনরায় ললিতাদিদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ললিতা! যাও, তুমি সঙ্গীদের নিয়ে একটু চেষ্টা করলেই সব সংগ্রহ হয়ে যাবে। যদিও যথেষ্ট সময় নেই তবু মনে হয় নিতাইচাঁদ যখন প্রাণে ইচ্ছা জাগিয়েছেন তখন তিনি বাসনা অপূর্ণ রাখবেন না।"

ললিতাদিদি মঠবাসী সঙ্গীগণকে লইয়া যথাদেশ পূজার দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পরদিন অধিবাস হইয়া যথানিয়মে তিন দিন পূজা হইল। বড় বাবাজী মহাশয় নিজেই মায়ের পূজা করিলেন। উদ্দেশ্য—স্নান, পূজা, ধ্যান, জপ প্রভৃতি যাবতীয় মন্ত্রেরই যে একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষ্ণ-ভক্তি বা কৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তি তাহাই সকলকে দেখাইয়া দেওয়া।

সেইদিন পূজা উপলক্ষে একটি বিশেষ বিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন—সর্ব্বাগ্রে শালগ্রামশিলার পূজা করিয়া ভোগের সমস্ত উপচার তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিয়া সেই প্রসাদ দেবীকে সমর্পণ করা। বলা বাহুল্য, অদ্যাবধি বাবাজী মহাশয়গণের মধ্যে ঐ নিয়মেই পূজা হইয়া থাকে। ললিতাদিদিও নবদ্বীপ সমাজবাড়ীতে বড় বাবাজী মহাশয়ের নিয়ম সকল অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

বৃহৎ নন্দাকেশ্বর পুরাণে দুর্গাপূজার যে পদ্ধতি আছে মূলতঃ তাহাই অবলম্বন করিয়া কেবল উহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কামনাসূচক মন্ত্রগুলির পরিবর্ত্তে আনন্দবৃন্দাবন চম্পূর বর্ণিত কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি প্রার্থনাময়ী মন্ত্রগুলি সংযোজিত করিয়া বড় বাবাজী মহাশয় ব্রজকুমারীগণের কৃষ্ণানুরাগ পরিপাটীময় পূজার ধারা ধরিয়া দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য পরে দিদি এই সকল মন্ত্রাদি যথাযথ ভাবে সাজাইয়া পূজা পদ্ধতি লিখিয়াছিলেন। প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আলোচনাকালে দিদি এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকগণ যথাস্থানে তাহা লক্ষ্য করিবেন। পূর্ব্বে এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে।

রাজর্ষি বনমালী রায়কে কৃপা

শ্রীবৃন্দাবনবাসী রাজর্ষি বনমালী রায় একবার সস্ত্রীক মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া রথযাত্রার সময় পুরীতে গিয়াছিলেন। সঙ্গীগণের ইচ্ছা সমুদ্রের ধারে একটা ভাল বাড়ীতে থাকেন। তাহারা রাজর্ষির মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার পদমর্য্যাদার কোনরূপ হানি না হয় সেইভাবে যথেষ্ট খোঁজা-খুঁজি করিয়াও উপযুক্ত বাড়ী পাইলেন না। অবশেষে ঝাঁঝপেটায় আসিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদিগকে নিজের ঘরে থাকিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে বলায় ললিতাদিদি বলিলেন—"এ ঘর খুব ছোট এবং এ ঘরে ভালরূপ আলো বাতাস পাওয়া যাবে না, এখানে কি আপনাদের মত লোকের থাকবার সুবিধা হবে?"

বনমালীবাবু।—দিদি, আমি যাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি তাদের কি মনোভাব জানি না, কিন্তু আমার কথা—আমি শুধু জগন্নাথ দর্শন বা নিজ স্বাস্থ্যের উন্নতির বাসনা নিয়েই আসি নি। আমার প্রাণের একান্ত বাসনা যে কয়দিন প্রভু এখানে রাখেন সেই কয়দিন আপনাদের সঙ্গে থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া বাবাজী

মহাশয়ের মধুময় সঙ্গসুখ ভোগ করি। ভাল দোতলা তেতলা ঘরে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আপনাদের কষ্ট না হয় এইভাবে আপনাদের একজন সঙ্গী মনে ক'রে আমাকে আপনাদের কাছে রাখলে আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করব।

বড় বাবাজী মহাশয় রাজর্ষির কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ললিতা দিদিকে ঘর পরিষ্কার করিয়া দিতে বলায় তিনি অতি সত্বর যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজর্ষিকে ঘরে বসাইয়া বাবাজী মহাশয়কে চুপিচুপি বলিলেন— "বনমালীবাবুর শরীর ভাল নয়। ইহার আহারাদির জন্য কি স্বতন্ত্র কোনরূপ ব্যবস্থা হবে ?"

বাবাজী।—দেখ ললিতা! ইনি যদি মঠের বাইরে কোথাও থাকতেন তা হ'লে তুমি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে। যখন ইনি তোমাদের মত মঠবাসী হ'লেন বিশেষতঃ নিজ সঙ্গীগণকেও কাছে রাখলেন না, তখন বুঝতে হবে ইনি কোনরূপ স্বতন্ত্রতা চান না। তাই বলি ঠাকুরের যখন যেরূপ ভোগ হবে তাই বৈষ্ণব সেবা অন্তে ওঁকে দিবে। তাই হবে ওঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ্য।

বনমালীবাবুকে বলিলেন—"যখন যাহা প্রয়োজন হবে স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা না ক'রে সরল প্রাণে নিতাইচাঁদের সংসারের সেবক সেবিকাদের জানালেই সুখী হব।"

বনমালীবাবু।—আমার জন্য আপনারা কোনরূপ ব্যস্ত হবেন না, আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শন পেয়েই নিজেকে বেশ সুস্থ বোধ করছি। কৃপা ক'রে বৈষ্ণব-অধরামৃত দানে কৃতার্থ করবেন। আমি সরল ভাবেই বলছি, আমার জন্য কোনরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না, বরং করলে দুঃখই পাব। ইত্যাদি।

যে কয়দিন বনমালীবাবু মঠে ছিলেন পরমানন্দে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ ও সঙ্কীর্ত্তনানন্দে কাটাইয়া, ভিক্ষান্নে পরম পরিতোষ পূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"জীবনে এমন সুযোগ, এত আনন্দ কখনও পাই নাই, আর মিলিবে কিনা শ্রীরাধাবিনোদই জানেন।"

লীলার নিত্যত্ব ব্যাখ্যা ও নিত্যানন্দ রামদাস

বড় বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই ললিতাদিদি, বৃন্দাদিদি ও কুসুমদিদি প্রভৃতির উপর রাত্রে রূপ, অভিসার ও মিলনলীলা কীর্ত্তনের আদেশ দিয়াছেন। লীলানিত্য এইভাব পুষ্টির জন্য কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্দিরে শ্রীমূর্ত্তির বেশাদি পরিবর্ত্তন দ্বারা লীলা সকল প্রকটরূপে প্রদর্শিত হয়। কোনও বিশেষ নৈমিত্তিক লীলা কোনদিন থাকিলে সেইদিন তদনুযায়ী শ্রীমূর্ত্তির বেশ রচনা করিয়া ঐ লীলানুযায়ী মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

মহারাস লীলা আস্বাদন জন্য মন্দিরের সম্মুখে একখানি খড়ের বড় ঘর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং শোলাদ্বারা ষোলটি সখী, ষোলটি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। আশ্রমস্থ সখীবেশধারী সেবিকাগণকে নানারূপ লীলা-গান এবং নানাবিধ নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রাদি শিক্ষার আদেশ দিয়াছিলেন। প্রত্যেক সখীকেই সর্ব্বপ্রকার যন্ত্র শিক্ষা করিতে বলায় ললিতাদিদি একদিন বলিয়াছিলেন—"একজনে আর কয়টা যন্ত্র ব্যবহার করবে?"

বাবাজী।—ব্যবহার নয় ললিতা! সকলের সব যন্ত্র অভ্যাসের উদ্দেশ্য হ'ল, কোনও একজনের অভাবে লীলাভিনয়ে কোনরূপ অঙ্গহানি হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

ললিতা।—এতগুলি যন্ত্র একজনের পক্ষে শিক্ষা করা কি সম্ভব? তবে আপনার কৃপা হ'লে সবই হতে পারে।

বাবাজী।—এক একটি বিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ পূর্ব্বক লীলাগত হয়ে স্বীয় যূথেশ্বরীর নিকট অকপট প্রার্থনা করলে অসম্ভব কার্য্যও যে অতি অনায়াসে সম্পন্ন হতে পারে, এ বিশ্বাস রাখ কি? একমাত্র কৃপাভিন্ন, স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করলে কার্য্য সিদ্ধি তো হবেই না, উপরন্তু স্বতন্ত্রতা দোষে দূষিত হবে। ললিতা! জেনে রাখ, প্রাণে প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, আনুগত্য না এলে

প্রাপ্তি তো দূরের কথা লীলা স্ফূর্ত্তিই হবে না। এখানে হয়তো বলবে, লীলা তো নিত্য, তবে কেন দর্শন হবে না? লীলা নিত্যই প্রকট বটে কিন্তু দর্শন সকলের সব সময় হয় না। ভাগ্যবান জনই শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কখন কখন দর্শন লাভ ক'রে ধন্য হন। প্রাচীন পদকর্ত্তা বলেছেন—

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল।
সেই দেখে যার আঁখি হয় নিরমল॥"

জন্ম-জন্মার্জ্জিত তমসাঘন তিমিরে অন্ধ-আঁখি করুণাময় শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া জ্ঞানাঞ্জন লেপনে পরিস্ফুট করিয়া দিলে তবেই লীলাদর্শন ভাগ্যে ঘটে। বড় বাবাজী মহাশয় তাঁহার আশ্রিত জনকে বিশেষতঃ ললিতাদিদি, রাধা-বিনোদিনীদিদি ও কুসুম মঞ্জরীদিদির উপর এক এক সময় এমনই কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন যে, তখন উঁহারা একেবারে বাহ্যস্মৃতি ভুলিয়া লীলা-সমুদ্রে ডুবিয়া দিনের পর দিন বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। বহু চেষ্টা দ্বারা তবে পুনরায় সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছেন।

একবার প্রভুপাদ নবদ্বীপচাঁদ গোস্বামী মহোদয়ের কলিকাতা বেনেটোলার বাড়ীতে খুব সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল; বড়বাবাজী মহাশয় রামদাদা ও অন্যান্য সঙ্গীগণ সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ললিতাদিদি, বিনোদিনীদিদি ও কুসুম মঞ্জরীদিদিও ইহাদের সঙ্গে আছেন। কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ হইতেছে। কি কীর্ত্তনীয়া, কি শ্রোতা সকলেই যেন কোন্ এক অপ্রাকৃত আনন্দ-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন।

গোস্বামী প্রভু বড়বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, তুমি আমার বড়দিদি। তুমিও দাসী আমিও দাসী। তুমি রতিমঞ্জরীর দাসী আর আমি অনঙ্গমঞ্জরীর দাসী।—এই বলিয়াই বড়বাবাজী মহাশয়ের স্কন্ধে বাম হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত নানাপ্রকার ভঙ্গীসহকারে নাড়িয়া নাড়িয়া গান ধরিলেন—

"নবদ্বীপ নাগরী আগরী গোরা রসে।
কহিতে গৌরাঙ্গ কথা প্রেমজলে ভাসে॥

ভাবভরে ভাবিনী পুলকভরে ভোরা।
শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা॥
গোরা রূপগুণ অবতংস পরে কাণে।
দিবানিশি গোরা বিনা আন নাহি জানে॥
গোরোচনা নিবিড় করিয়া মাখে গায়।
যতন করিয়া গোরা নাম লেখে তায়॥
গোরোচনা হরিদ্রার পুতুলি করিয়া।
পূজয়ে চক্ষের জলে প্রাণফুল দিয়া॥
প্রেমনেত্রে প্রেমজল বহে অবিরল।
তায় অভিসিঞ্চে গোরার চরণ যুগল॥
পীরিতি নৈবেদ্য তাহে বচন তাম্বূল।
পরিচর্য্যা করে ভাব সময় অনুকূল॥
অঙ্গকান্তি প্রদীপে করয়ে আরত্রিক।
কঙ্কণ শবদ ঘণ্টা আনন্দ অধিক॥
অঙ্গগন্ধ ধূপধুনা বহে অনুরাগে।
পূজা করি দরশ পরশ রস মাগে॥
দিনে দিনে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল।
"লোচন" বলে এতদিন জ্ঞান-শেল গেল॥"

কখন বড়বাবাজী মহাশয় এক একটি অক্ষর দিতেছেন আর গোস্বামী প্রভু হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছেন। বহুক্ষণ এইভাবে উভয়ে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া ললিতাদিদিকে বলিলেন—"তোমরা অমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? নৃত্য কর।" রামদাদাকে বলিলেন—"তুমি কীর্ত্তন ধর।"

প্রথমে ইহারা একটু লজ্জা লজ্জা ভাব দেখাইলেন, কিন্তু রামদাদার কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব অক্ষর শুনিয়া আবেশভরে আত্মবিস্মৃত হইয়া বহু সময় নৃত্য করিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইল, সকলে প্রভুপাদের চরণে পড়িয়া দণ্ডবৎ করিলেন। প্রভুপাদ

ইহাদের চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে, একদিন আমিও তোদের মত ঘাগরা কাঁচুলী প'রে এই মত নৃত্য করতাম, আমাকে দেখে তোদের এত লজ্জা কিসের ? আয়, আমার সুমুখে ব'সে সকলে এক সঙ্গে প্রসাদ পাবি আয়।"

এইখানেই রামদাদাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় রামদাদা বলিয়াছিলেন—রামদাস। প্রভুপাদ শুনিয়াই বলিলেন—"এতদিন শুধু রামদাস ছিলে, আজ থেকে 'নিত্যানন্দ রামদাস' নাম হ'ল।" বড়বাবাজী মহাশয় প্রভুপাদের কথা শুনিয়া 'জয় নিত্যানন্দ রাম, জয় নিত্যানন্দ রাম' বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। পরস্পরের মধ্যে চোখের ভঙ্গী দ্বারা না জানি কত কথাই হইল, শেষে উভয়ে উভয়ের নিকট দৈন্য-নিবেদন দ্বারা বিদায় লইয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন।

ফণীদাদার নবজীবন লাভ

ললিতাদিদির পরদুঃখকাতরতার বহু ঘটনা 'চরিতসুধা'য় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থান কালের বহু ঘটনা দিদি প্রকাশ করিতে দেন নাই। কেহ প্রকাশের আগ্রহ করিলে বলিতেন—"যাকে উপলক্ষ্য ক'রে ঘটনা ঘটে, তার উপর প্রভুর অপার করুণা জানবে। সেই করুণা স্মরণ ক'রে কৃতার্থ হও। করুণাময়ের কথা ভুলে, করুণার কর্ত্তাকে ছেড়ে বাজে ডালপালা নিয়ে এত মাতামাতির প্রবৃত্তি কেন?" মোট কথা তিনি যাহা কিছু ঘটে তাহা শ্রীরাধারমণেরই লীলা বলিয়া গ্রহণ করেন। এমন বহু ঘটনা পুরীতে, নবদ্বীপে কিংবা বাঙলার বাহিরে অনেক স্থানে ঘটিয়াছে। সকল স্থানেই সকল ঘটনার প্রধান অংশ দিদির কর্ম্মের সহিত জড়িত, তথাপি তিনি তাঁহার নিজের কথা বলিতে নারাজ ছিলেন। অন্য কেহ বলিতে গেলেও বাধা দিতেন। এই জন্যই 'চরিতসুধা'য় আমাদের জানিত অনেক ঘটনাই স্থান পায় নাই, কারণ তাহার প্রধান অংশ দিদির কার্য্যের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিল।

পুরীর একটি ঘটনা শুনুন এবং কি ভাবে দিদি তাহার প্রধান অংশ নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্য হইয়া সবই শ্রীরাধারমণের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা আস্বাদন করুন।

সেবার পুরীতে ভীষণ কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। শান্তির জন্য নানাস্থানে নানাপ্রকার পূজা, পাঠ, যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, পুরশ্চরণাদি করা হয়; কিন্তু শান্তি না হইয়া রোগ মহামারীরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। অন্যান্য অনেকে দল বাঁধিয়া নগর-কীর্ত্তন বাহির করিয়াছেন; কিন্তু কি জানি কেন বড়বাবাজী মহাশয় তখন পর্য্যন্তও নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির করেন নাই।

একদিন জগমোহনে বড়বাবাজী মহাশয় স্বগণসঙ্গে কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথের কণ্ঠমালাটি খসিয়া পড়িল। পশুপালক পাণ্ডা মালাটি আনিয়া বড়বাবাজী মহাশয়ের গলায় দিয়া বলিলেন যে, শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ হইল, আপনাকে নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির করিতেই হইবে। সেদিন জগমোহনে কীর্ত্তন করিয়া সেই কীর্ত্তন লইয়াই পশ্চিম দরজা দিয়া বাহির হইয়া মার্কণ্ডেয়সাহি দিয়া বড়বাবাজী মহাশয় ঝাঁঝপেটায় আসিলেন।

পরদিন সকলে সমবেত হইলে বড়বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"আজ নিতাই-চাঁদের ইচ্ছায় সঙ্কীর্ত্তন-মহাসমর উপস্থিত, কেউ যেন এ সমরে যোগদান করতে পরাঙ্মুখ না হয়। আজ এই সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলী হতে যে আলাদা হবে তার জন্য নিতাইচাঁদ দায়ী নন।" এই বলিয়া কীর্ত্তন লইয়া রাস্তায় বাহির হইলেন। সঙ্গীগণ সকলেই প্রাণের আবেগে কীর্ত্তন করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে বড় বাবাজী মহাশয় মত্তসিংহ পারা 'জয় নিতাই' বলিয়া হুঙ্কার দিতেছেন। সে গম্ভীর হুঙ্কারধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কাঁপিয়া উঠিতেছে। এ গলি সে গলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন সম্প্রদায় সহ বড়বাবাজী মহাশয় এমনভাবে পথে যাইতেছেন যেন কোনও পলাতক অপরাধীর অনুসন্ধান চলিতেছে।

ফণীদাদার আজ যেন কি দুর্দ্দৈব জুটিয়াছে জানি না, তিনি কিছু সময় পরে ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ত্তনের দল ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। এদিকে সাত

সাহি ঘুরিয়া শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সম্মুখে বহুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া সমাপ্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ আসিল যে, ফণীর দাস্তবৌমী হইতেছে, পেটে অসহ্য বেদনা, ক্রমে ক্রমে চলৎশক্তি রহিত হইয়া ঘরের মেঝেতে পড়িয়া ছটফট করিতেছে।

বড়বাবাজী মহাশয় উন্মুক্ত গাত্রে মঠের এক ধারে বসিয়া আছেন, ভক্তগণ তাঁহার শ্রান্তি অপনোদন জন্য পাখা লইয়া বাতাস করিতেছেন। এমন সময় ললিতাদিদি ছুটিয়া আসিয়া ফণীদাদার শোচনীয় অবস্থার কথা বলিলেন। বাবাজী মহাশয় ধীর ভাবে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—"সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলী ছেড়ে পৃথক হওয়াতে ওর ঐরূপ হয়েছে, নিতাইচাঁদের গণ্ডীর মধ্যে থাকলে কখনই বিপদ হ'ত না। তার উপর আবার ও আউলিয়া মঠে গিয়ে লোভবশতঃ কতকগুলি খিচুড়ি খেয়েছে। সেগুলি অপ্রসাদী ছিল।"

ললিতা।—একে বালক, তাতে রোগী, এখন তাকে বলাও যা, কাঠের পুতুলকে বলাও তাই। যা হবার হয়েছে, এখন একবার আপনি চলুন।

বাবাজী।—আমি গিয়ে কি করব! তোমরা পাঁচজন তার বান্ধব আছ, যা করবার হয় কর।

ললিতাদিদি ছাড়িলেন না, অনেক করিয়া বুঝাইয়া বড়বাবাজী মহাশয়কে ফণীদাদার ঘরে লইয়া গেলেন। তিনি কিছু সময় তাহাকে বিশেষভাবে দেখিয়া বলিলেন—"অবস্থা খুবই শোচনীয়, জীবনের আশা কম; তবে তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী সেবা করে কর্ত্তব্য পালন কর।" এই বলিয়াই গম্ভীর মুখে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

দিদি ছাড়িবার পাত্র নন, তিনিও তাঁহার পিছু পিছু যাইয়া বড়বাবাজী মহাশয়ের কাছে বসিয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য, এই জল-জ্যান্ত ছেলেটা মারা যাবে আর আপনি তার কোন প্রতিবিধান করবেন না? তবে যে আপনারা এত নামের বড়াই করেন তা কে বিশ্বাস করবে?"

দিদির কথাগুলি যেন কেমন ভাববিহ্বলাবিষ্ট ব্যক্তির মত শুনা যাইতেছে। এবং বাবাজী মহাশয়ের উপর যেন দাবী করিতেছে উহাকে ভাল করিয়া

দিবার জন্য। বাবাজী মহাশয় দিদির কথা শুনিয়া বলিলেন—"জীব নিজ নিজ কর্ম্মদোষে কষ্ট পায়, সেজন্য ভগবানের উপর দোষারোপ করা উচিত নয়।"

ললিতা।—আমি ভগবানের দোষ দিই নি, দোষ দিচ্ছি আপনাদের। আপনারা ইচ্ছা করলেই জীবের এই সব দুর্দ্দৈব খণ্ডন ক'রে দিয়ে তাদের কল্যাণ সাধন করতে পারেন, আপনাদের অবহেলায়ই জীব ঐরূপ বিপদে প'ড়ে হাবুডুবু খায়

দিদির ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের কথা শুনিয়া বড়বাবাজী মহাশয় অন্তরে আনন্দিত হইলেও বাহিরে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া আরও বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা প্রকাশ মানসে একটু যেন ক্রুদ্ধ ভাবেই বলিলেন—"তবে কি তোমার মতে এইরূপ সামান্য সামান্য রোগ ভাল করাবার জন্য বা মামলায় জয়লাভের জন্য অথবা লোকের কাছে সাধু ব'লে বাহবা পাবার জন্য নামের কাছে প্রার্থনা করতে হবে? আর প্রার্থনানুযায়ী কাজ না হ'লেই তোমার মতে নামের কোন শক্তি নেই বলতে হবে? ললিতা! এরূপ ধারণা বড়ই হীন প্রবৃত্তির পরিচায়ক।"

ললিতা।—না, আমি তো নামের উপর কিছু বলি নি। আমি বলছি আপনাদের ইচ্ছার কথা। আপনারা এদের একটু মঙ্গল ইচ্ছা করলেই ভগবান সে ইচ্ছা পূর্ণ করতে বাধ্য হবেন।

এদিকে ফণীদাদার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলিয়াছে। হাতে পায়ে খিল ধরিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ হিম, লোক চিনিতে পারিতেছে না, শরীরের রঙ নীলবর্ণ হইয়া কণ্ঠস্বরও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। দিদির নিকট সংবাদ আসিলে দিদি পুনরায় বড়বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন। এবার বড়বাবাজী মহাশয় একটু নরম স্বরে বলিলেন—"একবার বাবাকে বল।" আমাদের বলিতে ভুল হইয়াছে। বড় বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষাগুরু গৌরহরিদাস মহান্ত মহারাজ এই সময় কিছু দিন ঝাঁঝপেটায় ছিলেন। দিদি বাবাজী মহাশয়ের আদেশ-

মত মহান্ত মহারাজকে বলায় তিনি বলিলেন—"ও-সব আমি আর কি করব, যা হয় যাদবকে করতে বল।"

এই ভাবে কথায় কথায় সময় যাইতেছে অথচ রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে, তাই ললিতাদিদি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"দেখুন, এই বাপ-বেটা দুই জনেই উপস্থিত, যদি এই ছেলেটা মারা যায় তা হ'লে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, মঠের অন্য সকল ছেলেদের কণ্ঠি ছিঁড়ে দিয়ে আমি তাদের সংসারে পাঠিয়ে দেব; এবং জগতে নাম ও মহতের যে কোন শক্তি নেই—এই কথাই ঘোষণা করব। আপনারা জগতের উপকারের জন্য এসেছেন, জীবের জন্য আপনাদের প্রাণ কাঁদে, তবে এই ছেলেটা কি জীবের মধ্যে নয়? সামান্য অপরাধে এর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হ'ল?"

বড়বাবাজী মহাশয় আর কিছু না বলিয়া বৃদ্ধ বাবাজীকে দণ্ডবৎ করিয়া ফণীদাদার নিকটে গিয়া মাথার কাছে বসিলেন। ললিতাদিদি পায়ের কাছে বসিয়া নাম করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ পূর্ব্ব হইতেই মৃদুস্বরে নাম করিতে-ছিলেন, এখন বড়বাবাজী মহাশয়কে ও দিদিকে পাইয়া খুব উচ্চকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" হঠাৎ ফণীদাদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তারপর আর কোন সাড়া শব্দ নাই; সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, নিশ্চল, নিস্পন্দ।

বড়বাবাজী মহাশয় পদ্মাসনে বসিয়া 'হা নিতাই' বলিয়া হুঙ্কার করিয়া দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি ফণীদাদার মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। এই সময় তাঁহার লোচন যুগল আরক্তিম ও ঢুলুঢুলু, কাহারও সহিত যেন অর্দ্ধস্ফুটিত স্বরে কথা বলিতেছেন এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। কিছু সময় এই ভাবে থাকিবার পরই ফণীদাদার দেহে স্পন্দন দেখা গেল। ললিতাদিদি ব্যস্তভাবে এই কথা বড়বাবাজী মহাশয়কে বলিতে যাইয়া চাহিয়া দেখেন—যে স্থানে বড়বাবাজী মহাশয় বসিয়াছিলেন সে স্থানে তিনি নাই, তাঁহার পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল

শ্বেতবর্ণ তেজস্বী এক মহাপুরুষ বসিয়া আছেন, তাঁহার নয়ন যুগল রক্তবর্ণ ও হল-মুষলধারী এবং পরিধানে নীলবসন।

দিদি বেশী সময় সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তির পানে চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না, একবার দেখিয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেখ দেখ কি অপূর্ব্ব দর্শন!" দিদি আর কিছু বলিতে পারিলেন না, ভাবাবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

এদিকে অতি অল্প সময় মধ্যেই ফণীদাদার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। বড়বাবাজী মহাশয়ও সকলকে অতি সন্তর্পণে নাম করিবার আদেশ দিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

সেবায় সতর্ক দৃষ্টি

ঝাঁঝপেটা মঠে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সময় সময় বিভিন্ন প্রকারের বেশ করা হয়। একবার রাইরাজা বেশ করিবার জন্য বড় বাবাজী মহাশয় দিদিকে আদেশ করায় দিদি বলিলেন—"রাত্র ১০টার পূর্ব্বে বেশ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ অভিসার-কীর্ত্তন ক'রে নিকুঞ্জে যুগল মিলন করিয়ে তারপর যা হয় করতে পারি।"

বড়বাবাজী মহাশয় আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন দিদির সেবানিষ্ঠা দেখিয়া, কিন্তু লোকাপেক্ষা আছে কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য বলিলেন—"কয়েকটি শিক্ষিত ভদ্রলোক সন্ধ্যার পরই আস্‌বেন বলেছেন এবং তাঁরা তোমাদের বেশ রচনার পারিপাট্য দেখতে চান।" ললিতাদিদি যেন কেমন একটু সন্দিহান দৃষ্টিতে বড়বাবাজী মহাশয়ের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্য সহকারেই বলিলেন—"এখন হতে আমরা সেবার পারম্পর্য্য বজায় না রেখে বড়লোক ও শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মনোরঞ্জন করতে আরম্ভ করি এইরূপই কি আপনার আদেশ?"

বাবাজী।—না ললিতা! আমি সে ভাবে কথা বলি নি। তোমরা ঠিকঠিক

ভাবানুযায়ী কার্য্য করবে, তাতে যদি আমার কথা রক্ষা নাও হয় তবু আমি রাগ করব না বা আনন্দ ভিন্ন আমার দুঃখ হবে না। তোমরা ভাবানুযায়ী সেবা ক'রে নিজেরাও ধন্য হও, আমাকেও ধন্য কর। সত্য কথা বলতে কি ললিতা! লোকাপেক্ষায় তোমাদের ভাবের অভাব ঘটে কি-না সেইটি পরীক্ষার জন্যই আজ তোমাদের ঐ ভাবের কথা বলেছিলাম। নিতাইচাঁদ তোমাদের সর্ব্বদা স্ব-ভাবে সুদৃঢ় নিষ্ঠা বজায় রাখবার শক্তি দিন, তাঁর চরণে আমার এইটিই প্রার্থনা। যাও, প্রাণের আশা মিটিয়ে মনের মত ক'রে যুগলের সেবা কর গিয়ে। আমার কথায় মনে কিছু দুঃখ ক'রো না।"

সেবা বিষয়ে বড়বাবাজী মহাশয়ের সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল। অনুগত জনের প্রতি মৌখিক আদেশ ছাড়াও অনেক সময় লিখিত আদেশ দিয়া যথাযথভাবে তাহা প্রতিপালিত হইতেছে কি-না সংবাদ লইতেন। ঝাঁঝপেটা মঠে ললিতাদিদিকে একসময় বড়বাবাজী মহাশয় নিজ হস্তে ঠাকুরসেবা ও বৈষ্ণবসেবা সম্বন্ধে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অন্যান্য বক্তব্য লিখিয়া শেষে লিখিয়াছেন—"ঠাকুর-মন্দিরে দিবারাত্র অবিরামভাবে একটি ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিবে। ঠাকুরদের ভোগে একমাত্র দেশী গুড় ছাড়া অন্য কোন মিষ্টি লাগিবে না। মঠের মধ্যে কোনরূপ তৈল প্রবেশ করিবে না। দেশলাইয়ের আগুনে কোন কার্য্য হইবে না, এমন কি আশ্রমে দেশলাই রাখিবেও না। সন্ধ্যার পরে কেহ মঠের বাহির হইবে না। তামাক, গাঁজা, ভাং প্রভৃতি কোনরূপ মাদক দ্রব্য মঠের কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না বা মঠের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না। এক বেলা ঠাকুরের রান্না হইবে এবং বৈকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যে মহাপ্রসাদ আইসেন তাহা শ্রীগণেশ মহাপাত্র এবং গদাধর রথকে পূরণ করিয়া দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহাই সকলে মাধুকরী করিবে। মঠে ত্রিসন্ধ্যা নামকীর্ত্তন করিবে। তোমরা ব্যতীত দুই মূর্ত্তি দ্বারা শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের নিয়মিত কীর্ত্তন রক্ষা করিবে। ঘৃতপক্ক

ছাড়া তৈলপক্ক কোন দ্রব্যে ঠাকুরের ভোগ হইবে না।"—ইত্যাদি অনেক কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

শুধু পত্র লিখিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যথানিয়মে সেবাকার্য্য চলিতেছে কি-না জানিবার জন্য যেখানেই থাকিতেন পত্র লিখিতেন, মধ্যে মধ্যে লোকও পাঠাইতেন। ললিতাদিদিও যথাসাধ্য চেষ্টায় আদেশ পালনে সর্ব্বদা দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। ঝাঁঝপেটা মঠে যতদিন দিদি ছিলেন ততদিন বড়বাবাজী মহাশয়ের নির্দ্দেশমতই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন। পরে নবদ্বীপে আসিয়া বাগানবাড়ীতে নূতন ভাবে সেবার ব্যবস্থা করিতে পূর্ব্বনিয়মের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে সে পরিবর্ত্তনে সেবার বিষয়ে কোনরূপ কার্পণ্য বা অন্য কোন প্রকার গর্হিত কিছু যে করেন নাই এ কথা নিশ্চিত।

বাসুদেব মহারাজের প্রসাদে নিষ্ঠা

বিশ্বাস কেহ কাহাকেও হাতে করিয়া তুলিয়া দিতে পারে না। তবে যেভাবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস জন্মায় কোথাও কোথাও সেই ভাবের পরিপোষক কার্য্যে একজন অপরজনকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারে মাত্র। কোথাও বা যুক্তি দিয়া, কোথাও বা নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়া দেয়, আবার কোথাও বা আচরণকারীর অজ্ঞাতসারে গৃহীতা তাহার প্রয়োজনমত ভাবটুকু গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়।

ললিতাদিদির বিশ্বাস ছিল অচল অটল হিমাচলের মত। মহাজনবাক্য—

"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।"

এ কথাটি একেবারে দিদির হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া গিয়াছিল। এই বিশ্বাসের বলেই দিদি অনেক সময় অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতেন।

বড়বাবাজী মহাশয় একবার অন্যান্য উপদেশের মধ্যে বলিয়াছিলেন—

"উপাসনা লইয়া কাহারও সহিত বাদানুবাদ করিবে না।" একা ললিতাদিদি নন, অন্যান্য অনেক ভক্তের সম্মুখেই এই উপদেশবাক্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভক্তদের অনেককে এ আদেশ লঙ্ঘন করিতে দেখা গিয়াছে। বাধ্য হইয়া নয়, উপযাচিত ভাবে অন্যভাবের ভক্তকে নানারূপ শ্লেষপূর্ণ রহস্যবাক্য বলিয়া ক্ষণিক আনন্দানুভব করিতে অনেককেই দেখিয়াছি। কিন্তু দিদি কখনও কাহারও ভজন বিষয় লইয়া এমন কোন কথা বলেন নাই যাহাতে তাহার মনে কোনরূপ ক্লেশ হয়। যে ভাবের উপাসককে যে কোন বেশেতেই তিনি দর্শন করিতেন, তাঁহাকেই অকপট চিত্তে দণ্ডবৎ প্রণামাদি দ্বারা সম্মান দিতেন। কেহ কিছু বলিলে বলিতেন—"যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।"

প্রসাদে নিষ্ঠা, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ললিতাদিদির জীবনে যেন মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিয়াছিল। ডাক্তার কবিরাজের ত্যাজ্য বহু মরণাপন্ন রোগীকে দিদি অন্তরের সুদৃঢ় বিশ্বাসবলে ঠাকুরের চরণামৃত দানে সুস্থ করিয়াছেন। 'চরিত-সুধা'য় অনেক বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, গ্রন্থবাহুল্যভয়ে এ স্থানে আর পুনরুল্লেখ করিলাম না।

পুরীতে থাকিতেন এক মহাত্মা, সকলে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়াই জানিতেন। নাম শ্রীমৎ বাসুদেব মহারাজ। একমাত্র স্নানযাত্রার পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যে কয়দিন অদর্শন থাকেন, সেই কয়েক দিন ছাড়া তিনি ধাম ছাড়িয়া কোথাও থাকিতেন না। সারা বৎসরের মধ্যে মাত্র ঐ কটি দিন হয় আলালনাথে, না হয় কাশীধামে বা অন্য কোন তীর্থস্থানে গমন করিতেন। কোন কোন বৎসর কলিকাতার ভক্তগণের আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়া পোস্তার সন্নিকট শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে অবস্থান করিতেন। এতদঞ্চলের ভক্তবৃন্দ ঐ সময় তাঁহার সদানন্দময় মূর্ত্তি সন্দর্শন ও মধুময় সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। আমরাও প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত বহুবার ঐ স্থানে তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি।

একবার কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ গিয়াছেন তাঁহার এক ভক্তের আহ্বানে।

ভক্তটির বাড়ী বুড়াশিবতলায়। ভক্তটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ললিতা সখীর আশ্রম এখান থেকে কতদূর ? আমি যখন নবদ্বীপ আসিয়াছি তখন একবার তাহার ওখানে দেখা করিয়া না গেলে সে দুঃখ পাইবে। ভক্তটি পরদিন বৈকাল-বেলাই ২।৩ জন বন্ধু সঙ্গে বাসুদেব মহারাজকে লইয়া বাগানবাড়ীতে গেলেন।

প্রিয়নাথদাদা, মধুদাদা, নন্দদাদা প্রভৃতি অনেকেই তখন বাগানবাড়ীতে ছিলেন। একচক্রা হইতে ত্রিভঙ্গদাদা রথযাত্রায় পুরী যাইবেন বলিয়া বড়বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করিয়া আজ্ঞা লইতে আসিয়াছিলেন, তিনিও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মহারাজকে লইয়া দিদির নিকট উপস্থিত হইলেন। দিদি যেন আনন্দে কেমন এক রকম হইয়া একেবারে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়া করযোড়ে নানা প্রকার দৈন্যবাক্যে নিজের ও আশ্রমবাসীগণের সৌভাগ্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

বাসুদেব মহারাজ দিদিকে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম 'জয়গোপাল' বলিয়াই সম্বোধন করেন। অনেকক্ষণ নানাবিধ প্রসঙ্গ হইবার পর বাসুদেব মহারাজ নিজেই বলিলেন—"জয়গোপাল! আমি এখানে প্রসাদ পাব কবে ?"

দিদি।—সে সৌভাগ্য মঠবাসীর কবে হবে তা আপনিই বলুন ?

"বেশীদিন তো এখানে থাকা সম্ভব হবে না, কাজে কাজেই আগামী কল্যই আসব।" এই বলিয়া অন্যান্য দুই-চারিটি কথা বলিয়া মহারাজ সেদিন চলিয়া গেলেন।

এদিকে দিদি, মধুদাদা ও নন্দদাদা প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, কি প্রসাদের ব্যবস্থা করা হইবে। নন্দদাদা বলিলেন—"পুরীতেই একমাত্র মহাপ্রসাদ ছাড়া তিনি অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। এখানে কি আর অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করবেন ? আমার মনে হয় ফলমূলাদির ব্যবস্থা করলেই ভাল হয়।" অন্যান্য সকলে তাহাতেই মত দিলেন।

পরদিন পরামর্শমত নানাবিধ ফলমূলাদি একখানি বড় সাদা পাথরে করিয়া ভোগ লাগাইয়া রাখা হইল। যে ঘরে ভোগের অন্নপ্রসাদাদি রাখা হয় সেই

ঘরেরই এক পার্শ্বে পৃথক আসন করিয়া ঐ পাথর সমেত ফলমূলাদি চাপা দিয়া রাখা হইল। অন্নপ্রসাদ ও অন্যান্ত ব্যঞ্জনাদি অন্য দিকে রহিল।

যথাসময়ে বাসুদেব মহারাজ আসিয়া দর্শন দিলেন। দিদি স্বহস্তে চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইলেন। কিছু সময় পরে নন্দদাদার আহ্বানে সেবা করিবার জন্য ঐ প্রসাদ পাইবার ঘরে গেলেন। দিদি বাহিরে থাকিয়া কি ভাবে কি করিতে হইবে বলিয়া দিতে লাগিলেন। বাসুদেব মহারাজ দিদির দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"এ জয়গোপাল! তুম্ ভিতর ঘুঁস্‌তা নেই কাঁহে?"

দিদি।—আমি নীচু জাত, দেব-দ্বিজের ভোগমন্দিরে প্রবেশের অধিকার আমার নেই।

মহারাজ।—আরে নেই নেই, উওঁ বাৎ দুস্‌রি জায়গামে বোলো। আও, ভিতর আও।

দিদি আদেশমত ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটু দূরে বসিলেন। নন্দদাদা ফলের পাথরখানি আনিয়া বাসুদেব মহারাজের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। বাসুদেব মহারাজ পাথরের দিকে চাহিয়াই বলিলেন—"এৎনা ফল-প্রসাদ খানেসে অন্ন-প্রসাদ ক্যায়সে পায়েগা? এ নন্দ বাবা! ইস্‌সে থোড়া পৃথক পাত্রমে হাম্‌কো উঠায় দেও।"

সকলেই একটু বিস্মিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন। বিস্মিত হইবার কারণ—যে বাসুদেব মহারাজ নিজের জনের হাতেও অন্ন গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন, তিনি আজ বৈষ্ণব বাবাজীদের মঠে অন্ন-প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন কেন? তারপর আরও বিস্ময়ের কথা, দিদিকে অন্ন-প্রসাদ আনিয়া দিতে আদেশ করিলেন। দিদি "জয় গুরু, জয় গুরু" বলিতে বলিতে একখানি ভোগের পারস আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া করযোড়ে অন্য আদেশের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

ভোগের অন্নাদি যেখানে রাখা হইয়াছিল, তাহার নিকটেই বাসুদেব

মহারাজের জন্য আসন করা হইয়াছিল। তিনি পারসখানির দিকে চাহিয়া "জয় জনার্দ্দন" বলিয়া অন্যান্য অন্নব্যঞ্জনাদির দিকে দৃষ্টি দিলেন। এবং একটা ছোট গামলায় পরিপূর্ণ অন্ন-প্রসাদ দেখিয়া বলিলেন—"ওটা কি ?"

এখানে বলা প্রয়োজন যে, যে পারসখানি বাসুদেব মহারাজকে দেওয়া হইয়াছিল উহাতে সূক্ষ্ম আতপের অন্ন ছিল। আর যে গামলার অন্ন দেখিয়া বাসুদেব মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ওটা কি ?—সেটায় ভিক্ষার চাউলের অন্ন ছিল। নন্দদাদা ও দিদি উভয়েই বলিলেন—শ্রীগুরুদেবের আদেশমত আমরা ভিক্ষার চাউলের অন্নেরও ভোগ দিয়া থাকি।

মহারাজ।—হাম্‌কো ঐ অন্ন দেও।

দিদি।—বাবা! ও পাঁচমেশালি চাউল আর ও চাউল মোটা, ও কি আপনার যোগ্য!

মহারাজ।—দেখো জয়গোপাল! উওঁ চাউল নাম্‌সে পয়দা হুঁয়া, আউর এ চাউল রূপেয়াসে পয়দা হুঁয়া। ইস্‌সে উওঁ বহুৎ দামী, বহুৎ মিঠা আউর বহুৎ উপ্‌কারী। দেও, দেও, হামকো ঐ অন্ন দেও।

ভিক্ষার চাউলের মহিমা বর্ণন করিতে করিতে বাসুদেব মহারাজ কাঁদিয়া ফেলিলেন। দিদি মহারাজের আগ্রহাতিশয্যে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ভিক্ষার চাউলের অন্ন আনিয়া দিলেন। মহারাজও পরমানন্দে ভোজন করিলেন।

পরম তৃপ্তিতে ভোজন শেষ করিয়া বাসুদেব মহারাজ প্রসাদের মহিমা, ভিক্ষার অন্নে প্রভুর কিরূপ সন্তোষ এই সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন। শেষে বলিলেন—তোমরা মঠবাসী, এই নামে দ্বারা সংগৃহীত অন্নের প্রসাদই পাইবে। আর বাবু ভায়াদের এই টাকায় কেনা অন্নের প্রসাদ দিবে।

সেই অবধি দিদি এই আদেশ পালনে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন এবং মঠের কোন ছেলে যৌবনোচিত কুৎসিত ব্যাধির কবলগ্রস্ত হইয়াছে জানিলে বলিতেন— "তুমি আর কিছু ভাল মন্দ খাইবে না, কেবল ভিক্ষার চাউলের অন্নের প্রসাদ নুন

নেবু ও জল মাখিয়া খাইবে।" বলা বাহুল্য হতভাগ্য লেখক এ সম্বন্ধে দিদির নিকট হইতে দুই-একটি গোপনীয় তত্ত্ব জানিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

এ দিনের এই প্রসাদ পাইবার ঘটনা ক্রমে ক্রমে প্রচার হইয়া গেল। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের সম্মুখেই অনেককে দিদি বলিয়াছেন—"মহতের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" আমরা কি বুঝিব? তাঁহারা এইভাবে নিজে আচরণ করিয়া আমাদের মত মোহান্ধের মোহান্ধকার ঘুচিয়ে দেন।

রাজরাজেশ্বর শীলামূর্ত্তি প্রাপ্তি

একবার রথযাত্রার পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণে বাসুদেব মহারাজ বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"তিন রোজ অন্নপ্রসাদ মিলা নেই, আজ সঙ্কল্প কিয়া হিঁয়াপর অন্নপ্রসাদ পায়েঙ্গে।"

প্রভুর লীলাভঙ্গী পাঠকগণ আস্বাদন করুন। মঠে সেদিন কিছুই ছিল না। সকালে ভিক্ষায় যাহা সংগ্রহ হইয়াছিল সমস্তই রন্ধন করিয়া ভোগ লাগাইয়া সকলে প্রসাদ পাইয়াছেন। অপরাহ্ণ সময় কোথায় কি ভাবে মহাত্মার সেবার উপকরণ সংগ্রহ হইতে পারে সেই বিষয় লইয়া নন্দদাদার সহিত দিদি পরামর্শ করিতেছেন। নন্দদাদা বলিলেন—"দিদি! একবার ভাণ্ডার ঘর খুলে দেখ না কিছু আছে কি-না?"

দিদি।—আরে পাগ্‌লা, সকালে তো আমিই সব বের ক'রে দিয়েছি, থাকলে তো আমি বলতামই।

নন্দ।—তবে এখন কি করা যাবে বল দেখি?

দিদি।—তুমি ভাই ওঁকে (বাসুদেব মহারাজকে) স্নান করবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আহ্নিক পূজার যোগাড় ক'রে দাও। আমি এদিকে দেখি কি ভাবে কি করা যায়। হ্যাঁ, আর এক কথা—ওঁর সঙ্গে তো পূজারী নেই, ওঁকে জিজ্ঞেস কর, কে রসুই করবে!

নন্দদাদা দিদির আদেশমত স্নানের যোগাড় করিয়া দিয়া আহ্নিকের আয়োজন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে রসুই করবে?"

মহারাজ।—কেন, মেয়ে রসুই করবে। (দিদিকে বাসুদেব মহারাজ মেয়ে বলিয়া সম্বোধন করিতেন।)

এই সংবাদ দিদিকে দিতে যাইয়া দেখেন, দিদি ভাণ্ডার ঘরের দরজা খুলিয়া কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কাঁদিতেছেন। নিকটে যাইয়া 'দিদি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াই ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখেন, দুইখানি বড় বড় কাঠের বারকোষে নানা প্রকার সামগ্রী সমেত অতি সূক্ষ্ম কামিনীভোগ আতপ চাউল ও স্বতন্ত্র একটা পাত্রে গব্যঘৃত সহ দুইটি সিধা সজ্জিত রহিয়াছে। আবেগভরা কণ্ঠে নন্দদাদা বলিলেন—"দিদি! কে দিয়ে গেল?" দিদি নন্দদাদাকে ধরিয়া—"ভাই রে, হতভাগিনী আমি এত দেখে, এত পেয়েও বিশ্বাস করতে পারছি না। একবার সিধার বহরটা দেখ! আমি তো শত চেষ্টায়ও এমন বিশুদ্ধ ও ভাল জিনিস যোগাড় করতে পারতাম না। এ নিশ্চয়ই তোমাদের কর্ত্তামশায়ের কীর্ত্তি। এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই।"

নন্দ।—দিদি! এখন ওসব ভাববার বা বিচার বিবেচনার সময় নয়, সন্ধ্যা হয়ে গেলে আর মহারাজের সেবা হবে না। আগে তুমি রসুই চাপাও, মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কে রসুই করবে? তিনি বললেন—মেয়ে রয়েছে, আবার কে রসুই করবে?

চোখের জলে মুখ বুক ভাসাইয়া 'জয় শ্রীগুরুদেব, জয় শ্রীগুরুদেব' বলিতে বলিতে দিদি স্নান করিয়া আসিয়া রান্না চাপাইয়া দিলেন এবং অতি অল্প সময় মধ্যেই রন্ধন করিয়া ভোগ লাগাইয়া বাসুদেব মহারাজকে প্রসাদ পাওয়াইয়াছিলেন।

সন্ধ্যারতি দর্শন করিয়া, শ্রীমন্দিরাদি প্রদক্ষিণ করিয়া মহারাজজি দিদির বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। ভক্তগণ সময় বুঝিয়া যাহার যতটুকু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ হইল করিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে দিদিও দণ্ডবৎ প্রদক্ষিণাদি সারিয়া সেই প্রসঙ্গস্থানে আসিয়া বসিয়াছেন। সেবা, শ্রীগুরুকৃপা, মহতাগমন

যে গৃহস্থের মঙ্গল সাধন করে, ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনা একটু একটু হইল। শেষে প্রসঙ্গক্রমে তিনি নিজেই দিদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মেয়ে! তুমি তো এখানে অনেক শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেছ, কিন্তু শ্রীমন্দিরে শালগ্রামসেবা নেই কেন? আমার ইচ্ছা তুমি এক মূর্ত্তি শালগ্রাম এখানে রাখ।"

দিদি।—আমি তো এঁদের কাউকেই নিজ ইচ্ছায় বসাই নি, এঁরা স্ব-ইচ্ছায় কৃপা ক'রে এসে বসেছেন। যদি তিনি সেইভাবে এসে ব'সে আমাদের কৃতার্থ করেন উত্তম। আমার তাতে আপত্তি করবার কি আছে?

অন্যান্য দুই-একটি কথার পর সে দিনের প্রসঙ্গ শেষ হইল। বাসুদেব মহারাজ পরদিনও মঠে প্রসাদ পাইয়া চলিয়া গেলেন। এইবার সকলে মিলিয়া সেই সিধার বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনেকে অনেক কথা বলিলেন; কিন্তু দিদির সেই এক কথা—"এ তোমাদের কর্ত্তার কীর্ত্তি।"

রথযাত্রার পরে একদিন একটি পার্শেল আসিয়া উপস্থিত। খুলিয়া দেখা গেল, একটি রাজরাজেশ্বর শিলামূর্ত্তির সহিত ১০।১২টি ছোট-বড় নারায়ণশিলা। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবাস-অঙ্গনের পূজারী আসিয়া একমূর্ত্তি শিলা প্রার্থনা করিলেন। তখন কুঞ্জদাদা মঠে ছিলেন। তিনি রাজরাজেশ্বর শিলাটি তুলিয়া রাখিয়া বাকি শিলাগুলি পূজারী ঠাকুরের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। তিনিও উহার মধ্য হইতে তাঁহার পছন্দমত একটি গ্রহণ করিয়া বাকি কয়টি ফেরত দিলেন।

যথাসময়ে অভিষেকাদি করিয়া রাজরাজেশ্বরকে শ্রীমন্দিরে রাখা হইল। বলা বাহুল্য সেই দিন হইতে মঠে যখন যে কোন নৈমিত্তিক পর্ব্বাদি হয়, সকল সময়েই ঐ রাজরাজেশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া যথাযথভাবে পূজাদি করা হয়। এই রাজরাজেশ্বরের শুভাগমনের পর হইতেই মঠের শ্রীমন্দিরাদির ও অন্যান্য যাহা কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে।

এই ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, সে দিনের মঠের অবস্থা দর্শন করিয়া মহাত্মা বাসুদেব মহারাজের অন্তরে প্রকৃত বৈষ্ণবের স্বভাব প্রকাশ

৬

পাইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন—"ঋতে পরানুগ্রহমাত্মভাবম্।" অর্থাৎ অপরকে অনুগ্রহ করাই বৈষ্ণবের স্বভাব।

তার্কিক হয়তো এখানে তর্ক তুলিয়া বলিবেন—বাসুদেব মহারাজ একবার হয়তো ইহাদের মঙ্গল কামনা করিলেন, অমনি সে ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছিল ? আমরা বলিব, না। কিন্তু শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিলেন—হ্যাঁগো হ্যাঁ, তাইই হয়। বিউগল একটি বৈদেশিক বাদ্যযন্ত্র, উহার শব্দ এক যোজন যায়। বজ্রের শব্দ দ্বাদশ যোজন যায়। কিন্তু ভক্তের আহ্বান সে যে অবস্থায় যে স্থানে বসিয়াই করুক না কেন "ক্ষণাৎ আক্রম্যতে জগৎ।"

নারদপঞ্চরাত্রে একটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়—

হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বামুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভূতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥

অর্থাৎ মুক্তি আদি সিদ্ধি সকল এবং নানাবিধ উত্তম উত্তম ভোগ সকল দাসীর ন্যায় আসিয়া হরিভক্তি মহাদেবীর সেবায় নিয়োজিত হয়।

দেবদেবী পূজা সম্বন্ধে

নবদ্বীপ শ্রীবাস-অঙ্গনের সম্মুখস্থ গঙ্গার ঘাটের বাঁধানো চাতালে বসিয়া দুই বন্ধুতে কথোপকথন হইতেছিল। আমি চারুদাদার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় গঙ্গার স্রোত উক্ত বাঁধানো ঘাট হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। ভ্রমণান্তে আমরা বাগানবাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় শুনিলাম একজন অপর জনকে বলিতেছে—"বাগানবাড়ীর ললিতা সখীর ভাব বাহির থেকে কিছু বোঝা যায় না ভাই! গলায় তুলসীমালা, কপালে তিলক, বৈষ্ণব বাবাজীর কাছে দীক্ষিত, সর্ব্বদাই 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম' নামকীর্ত্তন করে, অথচ বারো মাসে

তেরো পর্ব্বের কোনটাই বাদ দেয় না। বিশেষ ক'রে দুর্গাপূজার সময় ঘটাটা যেন একটু বেশী বেশী রকমই দেখা যায়।

২য় বন্ধু।—বেশ তো, তাতে হয়েছে কি ?

১ম বন্ধু।—বৈষ্ণব পদকর্ত্তা নরোত্তম দাসঠাকুর মহাশয় যে বলেছেন—"না পূজিবে দেবীদেবা না করিবে প্রসাদ ভক্ষণ।" অন্যত্র বলেছেন—"অন্য দেব পূজক ধ্যানী দূরে পরিহরি।" ইত্যাদি। তারপর পণ্ডিত মহাশয়দের কাছেও শুনি—বৈষ্ণব সাধকদের পক্ষে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য দেবতার পূজা কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল।

চারুদাদা আমাকে বলিলেন, "দাঁড়াও দীনেশ! এরা কি বলে একটু শুনি। সখীজীর কথা যখন উঠেছে তখন শেষ পর্য্যন্ত এরা কি সিদ্ধান্তে গিয়ে দাঁড়ায় তা শোনা দরকার হচ্ছে।" আমরা দুজনেই দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম।

২য় বন্ধু।—ভাই! গোস্বামীপাদগণ জীবের সন্দেহ নিরসন জন্য নানাভাবে নানা শাস্ত্রে এসব বিষয় বিশেষভাবেই আলোচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্ব ব'লে স্বীকার ক'রে তিনিই যে সর্ব্বারাধ্য, তাঁর আরাধনা করলে যে আর অন্য দেবদেবীর আরাধনা করা আবশ্যক হয় না—এ বিষয়ে বিশদভাবেই তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন। গাছের গোড়ায় জল ঢাললে তাতেই যেমন তার শাখা-প্রশাখার পরিপুষ্টি হয়ে থাকে, তেমনি একমাত্র সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করলেই সাধকের সকল দেবদেবীর অর্চ্চনা হয়ে থাকে। তবু অনেকে বিশেষতঃ ললিতা সখীমা কেন এরূপ করেন এ বিষয়ে আলোচনা তুলে ভালই করেছ। এ বিষয় একটা মীমাংসা হওয়া বিশেষ দরকার।

সখীজীকে আমরা বাইরে যেরূপ দেখি বা তিনি নিজেকে যেরূপ অবলা, অশিক্ষিতা ব'লে প্রকাশ করেন প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি তা নন্। সখীজীর মত নানা শাস্ত্রপারদর্শী আচারনিষ্ঠ লোক সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। তাই আমার মনে হয়, আমরা মনগড়া একটা সিদ্ধান্ত না ক'রে তাঁর কাছে যাই চল। ভাল নয় কি ?

১ম বন্ধু।—না ভাই! আমার তাঁর কাছে গিয়ে এ জাতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ভীষণ ভয় হয়। কি জানি কোথায় কি দোষ বেরুবে!

২য় বন্ধু।—ভয় কি? আর তাতে দোষই বা কি? চল, চল।

উভয়ে বাগানবাড়ীর দিকে চলিল। আমরাও তাহাদের পিছু পিছু চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে কেবল শুনিতে পাইলাম একজন অপরজনকে বলিতেছে—"আমি কিন্তু কিছু বলতে পারব না ভাই! যা বলতে হয় তুমিই বলবে।"

বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখি, দিদি রান্নাবাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাধবীলতা গাছের মাচা মেরামত করাইতেছেন। আমাদের বা ঐ বন্ধুযুগলকে আর কিছু বলিতে হইল না। দিদি দেখিতে পাইয়াই বলিয়া উঠিলেন, "জয় গুরু! জয় গুরু! এ যে মেঘ না চাইতেই জল! এতদিনে ধাম দর্শনের সুযোগ হ'ল?" উক্ত দুইজনার একজন,—"সুযোগ নয়, সৌভাগ্য বলুন" এই বলিয়া সহাস্যে উভয়েই দিদিকে দণ্ডবৎ করিলেন। দিদিও তাঁহাদের লইয়া বারান্দায় গিয়া বসিলেন।

আমরা বুঝিলাম ইঁহারা দিদির পূর্ব্বপরিচিত। দুই-চারিটা অন্য কথার পর দ্বিতীয় বন্ধুটি দিদিকে বলিলেন, "আমার এই বন্ধুটি নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের—'না পূজিবে দেবীদেবা না করিবে প্রসাদ ভক্ষণ' এবং 'অন্যদেব পূজক ধ্যানী দূরে পরিহরি' এই পয়ার দুইটির অর্থ কি এবং আপনি কেন দুর্গাপূজা সত্যনারায়ণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করেন, বৈষ্ণবের এই সব করা কর্ত্তব্য কি না তাহার প্রকৃত তত্ত্ব জানতে চান। আপনার সময় হবে কি?"

দিদি।—সময়ের অভাব কি, তবে তত্ত্ব আলোচনার অধিকার কি আমার আছে? আপনি তো পণ্ডিত লোক, আপনিই একটু বলুন না?

২য় বন্ধু।—আমাদের পাণ্ডিত্য চেয়ারে ব'সে ছেলে ঠেঙাবার বেলায়, তত্ত্ব-কথার আমরা কি জানি! দয়া ক'রে যদি একটু বলেন তবে কৃতার্থ হই।

দ্বিতীয় বন্ধুর উত্তরে বুঝিলাম ইনি কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। যাহা হউক, দিদি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"এই সব কথার ভিতর অনেক রহস্য আছে। বিশেষভাবে আলোচনার সময় এখন নয়, তবে যতটুকু সম্ভব করা যাউক। প্রথমেই একটি কথা বলি—লোচনদাস ঠাকুর এক স্থানে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর।
সর্ব্বত্র মাগিলবে কৃষ্ণভক্তি বর॥"

তারপর শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে এক স্থানে বলিয়াছেন—

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥"

অর্থাৎ শ্রীহরিকেই আরাধ্য দেবরূপে সর্ব্বদা পূজা করিবে। কেন না দেবগণের যিনি ঈশ্বর সেই ঈশ্বরেরও ঈশ্বর হরি। কিন্তু তাহা বলিয়া ব্রহ্ম রুদ্র প্রভৃতি দেবগণকে কখনও কোন মতে অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

এই অবজ্ঞা করিতে নিষেধ করিয়া গোস্বামীপাদগণ যে অর্চনা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন এ কথাও মনে করা চলে না। অবজ্ঞা না করা আর অর্চ্চনা করা এক কথা নয়। ঐ ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থেই শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া গোস্বামীপাদ দেখাইয়াছেন—

"মনসৈকেন ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্
ঈশ্বরো জীব কলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥"

বৈষ্ণব কবি একছত্র পয়ারে ইহার অর্থ করিয়াছেন—

"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।"

তারপর অন্যত্র দেখা যায়—

"ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
যেই ধর্ম্মধ্বজী তার ইথে নাহি মতি॥"

কাজেই যেখানে জীবমাত্রকেই কৃষ্ণাধিষ্ঠান জ্ঞানে প্রণাম দণ্ডবতাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শনের কথা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেখানে শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতিরূপ দেবদেবীগণকে পূজা করায় কি দোষ হইল ?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥"

অর্থাৎ যে যে ব্যক্তি যে যে দেবতারই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করুক না কেন, আমি অন্তর্য্যামীরূপে সেই সেই ব্যক্তির তত্তন্মূর্ত্তিতে ভক্তিদৃঢ় করিয়া দিয়া থাকি। সাধারণতঃ স্থূলবুদ্ধি বশতঃ জীব ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখে বটে, কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভাব নাই, সকলের ফলদাতাই একমাত্র তিনি। কাজেই যে যেভাবেই তাঁহার পূজা করুক না কেন, তিনি সেই ভাবেই পূজকের অর্চ্চনার ফললাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন।

"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"—এ কথাটা তো সকলের মুখেই শোনা যায়। শঙ্কর যদি শ্রেষ্ঠতম বৈষ্ণবই হইলেন তাহা হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীগণের তাঁহার পূজা করিতে বাধা কি? শ্রীবৃন্দাবনে গোপেশ্বর মহাদেবের নিকট মস্তক অবনত করিতে কোন্ বৈষ্ণব আপত্তি করেন? কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি কামনায় যে গোপীগণ কাত্যায়নী মহামায়ার উপাসনা করিয়াছিলেন এ কথা কি মিথ্যা?

মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ—ইঁহারা কি যজ্ঞকালে অন্যান্য দেবতার পূজা করেন নাই? শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তর কাটোয়া হইতে নীলাচল-গমনকালে, আবার নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে পথে যে সব দেব-দেবীর মন্দির পাইয়াছিলেন সে সব স্থানে কি তিনি প্রণাম দণ্ডবতাদি ও স্তব, স্তোত্র কীর্ত্তনাদি দ্বারা অর্চ্চনা করেন নাই? কাজেই ইহাতে ভক্তিলোপের সম্ভাবনা কোথায়? তবে ঠাকুর মহাশয়ের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, বেদ ভাগবত আদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণ ভগবত্তা বর্ত্তমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া

বলিয়াছেন, যাহাতে পরিপূর্ণ ভগবত্তা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তিনিই হন সর্ব্ববাদিসম্মত সর্ব্বারাধ্য।

এই সর্ব্ববাদিসম্মত মতের বলেই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"না পূজিবে দেবীদেবা" ইত্যাদি। অর্থাৎ আরাধ্যরূপে একমাত্র কৃষ্ণেরই পূজা করিবে। যাহারা এই কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অংশ, কলা বা বিভূতি স্থানীয় দেবদেবীর আরাধনায় ব্যস্ত হন তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুর মহাশয় "অন্য দেব পূজক ধ্যানী দূরে পরিহরি" প্রভৃতি পয়ার বলিয়াছেন।

মহাভারত পাঠ করিলে তাহাতে পাওয়া যায়—

"বাসুদেবং পরিত্যাজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্তামৃতং সমূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষং॥"

সন্ধ্যারতির কাঁশর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। দিদি "জয় গুরু" বলিয়া দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়া গেলেন। আমরাও আরতিদর্শনমানসে চলিয়া গেলাম। বন্ধু-যুগল পরমানন্দ মনে "আবার কাল আসিব" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য ইহারা পরদিন যথাসময়েই আসিয়াছিলেন এবং দিদির অমৃতময় উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমার সেদিন উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় নাই ; কারণ আমাকে পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল।

গুণের আদর সর্ব্বত্র

আমার মধ্যমাগ্রজ পণ্ডিত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের "সুখবোধিনী" নাম্নী একটি টীকা করিয়াছিলেন। তাহা মুদ্রিত হইয়া প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই নানা স্থান হইতে পণ্ডিত ও ভক্তগণ অনেক সময় দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোঁড়ারবাগানে আসিতেন। আমি তখন ঐ কোঁড়ারবাগানেই থাকি।

একবার বরিশাল জেলার অন্তর্গত শিকারপুর নামক গ্রাম হইতে আশুতোষ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া দাদার সহিত দেখা করিয়া নবদ্বীপ যাইবার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণ যেমন নিষ্ঠাবান তেমনই ভক্ত। নবদ্বীপ যাইয়া কোথায় থাকিবেন, কোথায় আহারাদি করিবেন সেই বিষয় লইয়া একটু চিন্তিত হইয়া পড়েন। দাদাকে বলায় দাদা আমাকে তাঁহার সহিত নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, বাগানবাড়ীতে যাইয়া ললিতা দিদির নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমার শাপে বর হইল। একে তো নবদ্বীপ যাওয়া, তাহাতে আবার দিদির কাছে।

আশুবাবুকে লইয়া যথাসময়ে আমি নবদ্বীপ গিয়াছিলাম এবং কয়েক দিন দিদির নিকটেই থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। দিদির সুব্যবস্থায় আশুবাবুর ও আমার সেখানে থাকিবার এবং আহারাদির কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। এক দিন দুই দিন করিয়া ব্রাহ্মণ আট দিন সেখানে ছিলেন। আমিও বাধ্য হইয়া সঙ্গে ছিলাম।

একদিন অন্যান্য ভক্তগণ-সঙ্গে দিদি আলোচনা করিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে একটি ভক্ত বলিলেন—"মা! অনেকে বলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু জাতিভেদ মানিতেন না, এবং সেইজন্যই তাঁহার ভক্তগণও মানেন না। এ কথা কি ঠিক?"

দিদি।—শ্রীমন্মহাপ্রভু মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম পুরুষ। তাঁহার নিকট কোন রকমেই কখন কাহারও ম্যর্যাদার হানি হয় নাই বা হইতে পারে না। শাস্ত্রের প্রতিটি শব্দের সারমর্ম্মই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তাই হয়তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে লোকের মনে হইতে পারে, তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। বাবা! তিনি সর্ব্বত্রই গুণের আদর করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখতে পাওয়া যায়—

"বিপ্রাদ্দিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দ নাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যেতদর্পিতমনো বচনে হিতার্থঃ
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥"

নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে শাস্ত্রের কথা অবহেলা করা চলে কি? ভগবদ্ভক্তের সম্বন্ধে জাতি বা বর্ণের কোন কথাই উঠিতে পারে না।

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

শাস্ত্র যখন এই ভাবের কথা বলিতেছেন, তখন কাহাকে বাদ দিবে?

ভক্ত।—আমি কাহাকেও বাদ দিবার কথা বলিতেছি না, তাহা হইলে কি বুঝব জাতিভেদপ্রথা জীবকল্পিত?

দিদি।—তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।"

আবার শাস্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়—

"মুখ বাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারোজজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥"

আবার বলিতেছেন—

"অন্ত্যজানসৃজৎব্রহ্মা তামসান্ শ্রমজীবিনঃ।"

কাজেই যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ভগবানই গুণ-কর্ম্মাদিভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের বিভাগ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের পৃথক পৃথক ভাবে আশ্রমাদিও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তখন জাতিভেদ আধুনিক বা কোন ব্যক্তিবিশেষের কল্পিত বলা যায় কি করিয়া?

ভক্ত।—এখন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি, এমন কি অনেক সাধুকেও, জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে দেখি, এটা কি ঠিক?

দিদি।—ঠিক কি ভুল আমি কি করিয়া বলিব? যাঁহারা করিতেছেন তাঁহারা ঠিক বুঝিয়াই করিতেছেন। যখন ভুল বলিয়া বুঝিতে পরিবেন তখনই নিবৃত্ত হইবেন। শ্রীগুরুদেবের নিকট এ জাতীয় বহু প্রশ্ন উপস্থিত হইত, তিনি স্পষ্টই বলিতেন, "অনাদি কাল থেকে যা চ'লে আসছে তাকে নষ্ট করবার চেষ্টা করা

সম্পূর্ণ বাতুলতা।" তারপর তাঁহার নিজ আচরণে অতি ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গাদিও কোনরূপ ক্লেশ বা অসম্মান পায় নাই। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন ভেদাভেদ প্রবৃত্তির ব্যবহার লইয়া—প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ আছে, একটু লক্ষ্য করিলেই তাদের কার্য্যাদি হইতে তাহা ধরা যায়। তারপর গুণের ক্রিয়া অনুসারেই যে জাতির নির্ণয় হইয়াছে এ কথা শাস্ত্রেরই কথা।

"সর্ব্ববর্ণেঽপিতে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।"

বোধ হয় প্রসঙ্গ আরও কিছুকাল চলিত, কিন্তু হঠাৎ বাগানের পূর্ব্বদিকের একটি আমগাছ পড়িয়া যাওয়ায় সকলেই "কি হ'ল ? কি হ'ল ?" বলিয়া সেই দিকে ছুটিয়া গেল। দিদিও উঠিয়া পড়িলেন। আশুবাবু আমাকে বলিলেন—"বড় সুন্দর আলোচনা হচ্ছিল, ভাগ্যে নেই, তাই কোত্থেকে একটা উট্‌কো উৎপাৎ এসে উপস্থিত হয়ে সব মাটি ক'রে দিল।"

সেবা ও স্মরণে দিদি

নিত্যধামে নিত্যলীলা যে ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা হইতেছে, নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ যে ভাবে রূপ, গুণ ও লীলাদর্শন, শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন বা করিতেছেন, যথাযথরূপে তাহার অনুশীলন করার নামই স্মরণ। সাধক ভক্তগণ স্মরণ মননাদি দ্বারা সেই রস আস্বাদন করিয়া ধন্য হন ; কারণ ইহাই সাধকের পক্ষে সাধ্য অর্থাৎ প্রাপ্তির বিষয়। এই ভাব যাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে তিনি ইহা ছাড়া অন্য কোনরূপ যাজন করিয়া কালক্ষেপ করিতে পারেন না।

আমাদের আলোচ্য ললিতাদিদি সর্ব্বদাই এই সব লীলাস্মরণে আবিষ্ট থাকিতেন। কোন্ সময় কি ভাবের লীলায় কোন্ জাতীয় বেশভূষা ধারণ করা প্রয়োজন, শত কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকিলেও তাহাতে তাঁহার ভুল হইত না। বাহিরে

যাঁহারা তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাব জানেন না, তাঁহারা হয়তো তাঁহার এই বেশ-পরিবর্ত্তনাদিকে ভোগের কোঠায় ফেলিয়া সমালোচনা করিবেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাব কিছুমাত্রও অবগত ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার এই নব নব বেশরচনার মধ্য দিয়াই তাঁহার লীলা-রসাস্বাদনের লক্ষণ সকল স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া ধন্য হইতেন।

এমন অনেক সময় আমাদের মত বহির্ম্মুখীর ভাগ্যেও দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে যে, দিদির নিকট বসিয়া কোন হাস্যরসের প্রসঙ্গ হইতেছে কিন্তু তিনি করুণরসাত্মক শব্দ করিয়া চঞ্চলভাবে তদনুরূপ অঙ্গাদি চালনা করিতেছেন। আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, গভীর তত্ত্বালোচনার সময় শান্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্যেও দিদি হাসিতে হাসিতে "দেখ দেখ, রঙ্গ দেখ" বলিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়াছেন।

একদিন কয়েকটি বিদেশী ভক্ত সমাজবাড়ী দর্শনে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের আরত্রিক দর্শন করিয়া পরক্ষণেই সিংহাসন ও শ্রীবিগ্রহের বেশভূষার পরিবর্ত্তন ও যুগলের পরস্পর স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থানাদি দর্শন করিয়া কেমন যেন একটু বিচলিত চিত্তে দিদিকে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দিদি প্রথমে কিছুই বলিতে চাহেন না, শেষে বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদিগকে বলিলেন—

"অপ্রাকৃত প্রেম-রসময়ী পরকীয়া ভাবাত্মিকা নরলীলানুকারিণী ব্রজলীলায় শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী রাধিকা জিউর সহিত নাগরেন্দ্রচূড়ামণির যখন যেখানে যে ভাবে মিলন-লীলা হইয়াছিল, এখানকার সেবক-সেবিকারা সেই সেই ভাবেই সেবা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এখন উভয়ে স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থান করিলেও আবার অভিসারের পরে যথাযথভাবে মিলিত হইবেন।

এ ব্যবস্থা আমরা মনগড়া ভাবে করি নাই; বহুদিন পূর্ব্বে আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব পুরীধামে ঝাঁঝপেটা মঠ প্রাপ্ত হন। সেখানকার শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজার জন্য ঐ পুরীধামেরই গঙ্গামাতা মঠের বিহারীদাস

পূজারীর শিষ্য করুণাকর দাসকে ঝাঁঝপেটায় আনয়ন করান এবং তাঁহার উপরেই শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সেবার ভার দিয়া নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন কি ভাবে কখন কোন্ নিয়মে সেবা হইবে। এই করুণাকর দাসকেই সখীবেশ ধারণের পর কুসুমমঞ্জরী দাসী নামে অভিহিত করা হইত। শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশিত নিয়মটি এই—

কুঞ্জভঙ্গ হইয়া মঙ্গলারতির পরে রাধারাণী ও রাধাকান্ত পৃথক থাকিবেন। উভয়ের পৃথক স্নান, শৃঙ্গার, আরতি ও ভোগ হইবে। ভোগের পরে গোষ্ঠবেশ হইলে তবে রাধাকান্ত গোষ্ঠে গমন করিবেন; শ্রীমতীও সূর্য্যপূজার ছলে সখীগণ-সঙ্গে রাধাকুঞ্জে যাইয়া কৃষ্ণসহ মিলিত হইবেন। ঐ সময় পরমান্ন ভোগ হইয়া আরতি হইবে। আবার বেলা চারিটার সময় শীতলভোগ হইয়া উভয়ে পরস্পর পৃথক হইবেন। সায়ংকালে রাধাকান্তের গোধূলি আরতি এবং শ্রীমতীর আরতির পর জল আনিবার ছলে যুগলমিলন হইয়া আরতি হইবে। আরতির পর পরস্পর পৃথক থাকিবেন। রাত্রি দশ দণ্ডের পর অভিসার হইয়া পুনর্ব্বার মিলন ও ভোগের পর নিকুঞ্জে আরতি হইয়া উভয়ের একত্রে শয়ন দেওয়া হইবে।

শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশমত যেখানে যেখানে সেবার অধিকার পাইয়াছি, ঐ নিয়মেই আমরা সেবা করিবার চেষ্টা করি।"

যে ভক্তটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি অন্য কোথাও এ ভাবের সেবা দেখি নি তাই আমার কেমন গোলমাল লাগ্‌ছিল, সেইজন্যই আপনাকে কষ্ট দিলাম।"

দিদির স্বহস্তলিখিত একখানি খাতাতে আমরা বৃষভানুনন্দিনীর কখন, কোথায়, কতদিন অবস্থিতি তাহার একটি তালিকা পাইয়াছিলাম। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়াদিলাম—

"যদিও অপ্রাকৃত প্রেম-রসময়ী পরকীয়া ভাবাত্মিকা নরলীলানুকারিণী ব্রজলীলায় নিত্যনৈমিত্তিকাদি ব্যাপার সম্বলিত বিধায় শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী

রাধিকা জিউর শ্রীযাবট বৃষভানুপুর বা নন্দালয়ে গতাগতি বা স্থিতিকালের নিয়ম বিধিবদ্ধভাবে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, তথাপি দিক্‌দর্শনরূপে এক বৎসর যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাই লেখা হইল। নৈমিত্তিক কার্য্যানুরোধে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

১। মাঘী শুক্লাপঞ্চমী হইতে আষাঢ়ী শুক্লাচতুর্থী পর্য্যন্ত পাঁচ মাস শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বর্ষাণে পিত্রালয়ে অবস্থান করেন।

২। আষাঢ়ী শুক্লাপঞ্চমী হইতে শ্রাবণী শুক্লাপ্রতিপদ পর্য্যন্ত সাতাশ দিন শ্রীবৃষভানুনন্দিনী যাবটে শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন।

৩। শ্রাবণী শুক্লাদ্বিতীয়া হইতে হিন্দোলা উৎসব উপলক্ষ্যে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চৌদ্দ দিন বর্ষাণে অবস্থিতি।

৪। ভাদ্রীয় কৃষ্ণাপ্রতিপদ হইতে কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্য্যন্ত পাঁচ দিন যাবটে শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি।

৫। ভাদ্রীয় কৃষ্ণাষষ্ঠী হইতে কৃষ্ণানবমী পর্য্যন্ত চার দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নন্দালয়ে অবস্থিতি।

৬। ভাদ্রীয় কৃষ্ণাদশমী হইতে শুক্লানবমী পর্য্যন্ত পনের দিন নিজ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বর্ষাণে অবস্থিতি।

৭। ভাদ্রীয় শুক্লাদশমী হইতে আশ্বিনী শুক্লাপ্রতিপদ পর্য্যন্ত বাইশ দিন যাবটে অবস্থান।

৮। আশ্বিনী শুক্লাদ্বিতীয়া হইতে শুক্লানবমী পর্য্যন্ত অম্বিকা উৎসব উপলক্ষ্যে আট দিন পিত্রালয়ে অবস্থান।

৯। আশ্বিনী শুক্লাদশমী হইতে কার্ত্তিকী কৃষ্ণাত্রয়োদশী পর্য্যন্ত উনিশ দিন যাবটে স্থিতি।

১০। কার্ত্তিকী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী হইতে কার্ত্তিকী শুক্লাপ্রতিপদ পর্য্যন্ত দীপাবলি ও গোবর্দ্ধন পূজা উপলক্ষ্যে তিন:দিন সমস্ত ব্রজবাসীসহ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নীচে তাঁবুতে অবস্থিতি।

১১। কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বিতীয়া হইতে শুক্লাচতুর্থী পর্য্যন্ত ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে তিন দিন বর্ষাণে অবস্থান।

১২। কার্ত্তিকী শুক্লাপঞ্চমী হইতে মাঘী শুক্লাচতুর্থী পর্য্যন্ত তিন মাস যাবটে শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি।

মোট—বর্ষাণে	...	৬ মাস ১০ দিন
যাবটে	...	৫ মাস ১৩ দিন
নন্দালয়ে	...	৪ দিন
গোবর্দ্ধনে	...	৩ দিন
		১২ মাস

হরিসভায় বিদ্যারত্নের প্রতিমূর্ত্তি

একবার ঝুলন-পূর্ণিমার পর কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া নবদ্বীপ গিয়াছিলাম। রামকৃষ্ণপুরনিবাসী ভক্তবর সতীশচন্দ্র আঢ্য মহাশয় তখন বাগানবাড়ীতে ছিলেন। বিহারীদাস বাবাজীর সহিত সতীশবাবুর পূর্ব্বাশ্রমে বিশেষ পরিচয় ছিল, বেশাশ্রয়ের পর সে বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া উভয়েই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বিহারীদাস বাবাজী বলিলেন—"এবার আর যাবার জন্যে তাড়াহুড়া করা চলবে না।" সতীশবাবু বলিলেন—"না না, আমরা সব একসঙ্গে যাব।" আমি কাহারও কথার কোনও উত্তর না দিয়া "দেখি, ঠাকুর কি করেন" এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলাম।

দুই-তিন দিন পরে সঙ্গী বন্ধুরা চলিয়া আসিলেন। আমি নিশ্চিন্ত মনে ইঁহাদের সহিত বাগানবাড়ীতে থাকিয়া আনন্দ করিতে লাগিলাম। আমি সরকারী কাকা, সকলেই আমাকে কাকা বলিয়া ডাকে। এমনও অনেক ক্ষেত্রে

দেখা গিয়াছে যে, বাবা, মা, ছেলে ও নাতি নাতনীরা সকলেই কাকাবাবু বলে। আমিও অবলীলাক্রমে তাহাদের সকলের ডাকে সাড়া দিয়া থাকি।

একদিন বৈকালে বাগানবাড়ীর আঙ্গিনায় চাঁপাফুলগাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছি। একজন মঠের সেবক আসিয়া বলিল—"কাকা! আপনাকে মা ডাকছেন।" আমি তাহার সঙ্গে দিদির নিকট যাইয়া দেখি, দিদি সম্মুখে একখানি কার্পেটের আসন পাতিয়া দিয়া একটু দূরে বসিয়া আছেন। আমি যাইতেই "আসুন আসুন, এই আসনে বসুন" বলিয়া আসনখানি দেখাইয়া দিলেন। আমি আসনটি তুলিয়া মেঝেতে বসিতে যাইতেছি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন—"না না, আসনে বসুন, নইলে দুঃখ পাব।" কি করি, ইতঃস্তত করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামান্তে আসনেই বসিলাম।

"ক'দিন থাকা হবে?" দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—"এ সময় বাড়ীতে বিশেষ কোন কাজের তাড়া নেই, দু-চার দিন থাকতেও পারি।"

দিদি।—বেশ বেশ, দু-চার দিন কেন? এখন বেশী কিছুদিন থাকুন না? এখন এখানকার জলহাওয়া মন্দ নয় আর বিশেষ কোন উৎসবপর্ব্বের জন্য জন-সমাগমেরও সম্ভাবনা নেই। বেশ নিরিবিলিতে দিন কতক থাকুন না কেন?

আমি।—দেখি প্রভুর কি ইচ্ছা!

এই সময় সতীশবাবু নামের মালা হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দিদি।—অত হাসি কিসের আড্ডি মশাই?

সতীশবাবু।—পণ্ডিত মশাইদের সিদ্ধান্ত শুনে হাসছি দিদি! ওঁরা বলেন কিনা 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' নাম করলে—

দিদি। (বাধা দিয়া) থাক্, আর শোনবার ইচ্ছা নেই; অন্য প্রসঙ্গ হোক।

দিদির মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন ভিতরে একটু ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু বাহিরে অন্য কিছু না বলিয়া কেবল বলিলেন—

"আড্ডি মশাই! শ্রীগুরুদেবের নিকট শুনেছি, বিদ্যা চার প্রকার—অর্থকরী,

যশস্করী, বাদকরী ও স্বতত্ত্ববোধিনী। ছেলেকে শিক্ষকের হাতে দিয়েই ব'লে দেওয়া হ'ল, যাতে কোন রকমে একটু চাকরি-বাকরি ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে অনুগ্রহ ক'রে সেইরূপ একটু শিক্ষা দেবেন। এইটি হ'ল অর্থকরী। বিদ্যা। তারপর পরীক্ষা দিতে গিয়ে অপর ভাল ছেলেদের কাছ থেকে প্রশ্ন জেনে নিয়ে বা পরীক্ষককে গোপনে কিছু দিয়ে অথবা অন্য যে কোন প্রকারেই হোক পরীক্ষায় পাস ক'রে লোকের কাছে যশলাভ করার জন্য যে শিক্ষা, তাকে যশস্করী বিদ্যা বলে। আর সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় প্রভৃতি তর্কশাস্ত্র প'ড়ে বা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতে গিয়েও প্রথমেই পণ্ডিত মশাইয়ের নিকট কূটতর্ক অভ্যাস ক'রে কি ভাবে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত ক'রে লোকের কাছে আপনাকে জ্ঞানী পণ্ডিত ব'লে প্রতিপন্ন করা যায়, এই জাতীয় শিক্ষাকে বাদকরী বিদ্যা বলে।

এই তিন প্রকার বিদ্যার্জ্জন দ্বারা অজ্ঞানতা দূর হওয়া তো দূরের কথা বরং বৃদ্ধিই হয়। তাই পণ্ডিতগণ এই ত্রিবিধ বিদ্যাকেই অবিদ্যা ব'লে বর্ণন করেছেন। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যে বিদ্যাভ্যাস করা হয়, তাকেই স্বতত্ত্ববোধিনী বিদ্যা বলে।

এই বিদ্যাবলে অজ্ঞান ও অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়ে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বস্তুনির্দ্দেশ, বস্তুনির্দ্দেশ হ'লে নির্দ্দিষ্ট বস্তুপ্রাপ্তির জন্য লালসা। সেই লালসাই ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তৎতৎবস্তুপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদর্শ নিয়ে সাধনা করিয়ে অভিষ্ট বস্তু প্রাপ্ত করায়। আপনি যে পণ্ডিত মশাইদের সিদ্ধান্ত শুনে হাসলেন, এ প্রথম তিন জাতীয় বিদ্যার মধ্যে পড়ে নাকি? নীতিশাস্ত্রে বলেছেন—

"দিব্যংচূতফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বংযাতি কোকিলঃ।
পীত্বাকর্দ্দম পানীয়ং ভেকো মকমকায়তে॥"

এই সময় দুই-তিনটি ভক্ত-সঙ্গে খড়দহের প্রভুপাদ জীবেন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিদি শশব্যস্তে উঠিয়া আসন দিয়া দণ্ডবৎ

প্রণাম করিয়া বসাইয়া "কখন শুভাগমন হ'ল, শ্রীঅঙ্গের কুশল তো?" প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদও সংক্ষেপে দিদির প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন—"সখীদিদি! তোমার কাছে একটা বিষয় জেনে নিঃসন্দেহ হ'তে এসেছি। নিঃসঙ্কোচে বলবে তো?"

দিদি।—এ আবার কি ভাবের পরীক্ষা প্রভু? আমি এমন কি জানি যে, আপনাকে ব'লে আপনার সন্দেহভঞ্জন করব?

প্রভুপাদ।—আমার জানবার বিষয় কোন শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নয়। বিষয়টি হচ্ছে, নবদ্বীপ হরিসভায় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে। শুনলাম তুমি নাকি এর ইতিবৃত্ত বেশ ভাল ভাবেই জান। যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে তবে আমাকে সে ঘটনাটি বল।

দিদি।—আমি তো স্বচক্ষে কিছু দেখি নি প্রভু! তবে যেভাবে শোনা আছে আপনাকে তা বলতে পারি।

প্রভুপাদ।—তাই বল দিদি ভাই!

দিদি।—হরিসভা নাম হয় অনেক পরে, ওটা ছিল মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয়ের টোলবাড়ী। ঐখানেই নেহাল ক্ষ্যাপার ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশমত এক শুভক্ষণে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় দ্বারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ঐ টোলবাড়ীর নাম হরিসভা হয়।

প্রভুপাদ।—হ্যাঁ, এ বিষয় সেদিন মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট কিছু কিছু শুনেছি। আমার জানবার বিষয় হচ্ছে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে; তাই তুমি বল।

দিদি।—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই-ই বলছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর পাঁচ-ছ বৎসর ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় পুত্র মথুরানাথের সাহচর্য্যে খুব আনন্দের সঙ্গেই প্রভুর সেবা করেন। একদিন অপরাহ্নে নামের মালা হাতে নিয়ে নাম করতে করতে ঠাকুরবাড়ীর চতুর্দ্দিক ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। সেই সময় একটি ঘরের মধ্যে নিজের একটি প্রতিমূর্ত্তি দেখে পুত্র মথুরানাথকে জিজ্ঞেস করলেন—

"মথুর! এ মূর্ত্তি এখানে কোত্থেকে এল?" মথুরানাথ বিনীতভাবে বললেন—"একটি ভাল কারিগর পেয়েছিলাম, তাকে দিয়ে আমিই ওটি তৈরী করিয়ে রেখেছি।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় শুনে গম্ভীরভাবে একটু সময় কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন—"তুমি শাস্ত্র পড়েছ মথুর! তুমি কি জান না যে, কোন মূর্ত্তি অপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় ঘরে রাখতে নেই?" সেদিন এই পর্য্যন্ত, আর কিছু না ব'লে চ'লে গেলেন।

প্রায় ১৬।১৭ দিন পরে আবার সেই ঘরের কাছে গিয়া দেখেন যে, মথুরানাথ মূর্ত্তিটি সেখান থেকে সরায়ও নি বা অন্য কোন ব্যবস্থাও করে নি। তিনি পুত্রকে ডেকে একটু যেন ক্রুদ্ধভাবেই বললেন—"যদি একান্তই তুমি আমার এ মূর্ত্তি এখানে রাখতে চাও, তা হ'লে যত শীঘ্র সম্ভব যথাবিধি প্রতিষ্ঠা ক'রে তবে রাখ।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় তো চ'লে গেলেন। কিন্তু মথুরানাথের পিতৃদেবের আদেশ শ্রবণ করে আনন্দাতিশয্যে চোখ দিয়ে দরদরধারা বইতে লাগল। কেন না তাঁর মনোবাসনা পিতৃদেব পূরণ ক'রে দিলেন। তিনি একটি ভাল দিন দেখে যথাবিধি পূজার্চ্চনাদি ক'রে মূর্ত্তিটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের পার্শ্বে স্বতন্ত্র আসনে স্থাপন করলেন।

প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন ক'রে পিতৃদেবকে সংবাদ জানাতে ও প্রণাম করতে গিয়ে দেখেন, পিতৃদেব তাঁর ঘরে আসনের উপর স্থিরভাবে ব'সে আছেন। হাতে শ্রীনামের মালা, নয়ন উন্মীলিত। কিছু সময় যোড়হাতে অপেক্ষা ক'রে থেকেও যখন কোনরূপ সাড়া পেলেন না, তখন কাছে এগিয়ে গিয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখেন যে, দেহে কোনরূপ স্পন্দন নেই, নয়নতারাও স্থির। অবস্থা দেখে বুঝা গেল, প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেছেন। এখন পর্য্যন্তও হরিসভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের একপার্শ্বে থেকে মথুরানাথের কীর্ত্তি দর্শকগণকে আনন্দ দিচ্ছে।

প্রভুপাদ।—আচ্ছা দিদি! এ ভাবে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং তার সেবা করা তুমি সমর্থন কর?

দিদি।—প্রভু, আমার ব্যক্তিগত সমর্থনে অসমর্থনে কি আসে যায়? আপনারা সমাজের শিরোমণি। আপনাদের ব্যবস্থা, আপনাদের আদেশ পালন সেইটাই তো আমাদের কর্ত্তব্য। তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছি। যদি অভয় দেন তা' হলে বলি।

প্রভুপাদ।—না দিদি! তুমি নির্ভয়ে, অকপটে তোমার প্রাণের কথা খুলে বল। তোমার সিদ্ধান্ত আর কেউ না নিলেও আমি নেবই।

দিদি।—যাঁর কৃপায় সর্ব্বেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ প্রকাশ হ'য়ে সেবা দিয়ে ধন্য করেছেন তাঁর পূজা করা কি অন্যায়? তারপর অন্য দিক দিয়েও তো তিনি পূজ্য—জন্মদাতা পিতা এবং শাস্ত্রজ্ঞানদাতা গুরু। সে অবস্থায় যদি মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় পিতৃদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রেই থাকেন তাতে এমন কি দোষ হয়েছে বুঝি না। তবে আপনাদের শাস্ত্রে কি আছে না আছে আপনারাই বলতে পারেন।

প্রভুপাদ।—না দিদি! আর শাস্ত্রের কথা তুলে মন চঞ্চল ক'রে দিও না। তোমার যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তই আমার যথেষ্ট। সত্য কথা বলতে কি, আমার যা একটু সন্দেহ ছিল, তোমার ঐ শেষের দুটো কথায় সব সন্দেহ মিটে গেছে।

দিদি, "জয় গুরু, জয় গুরু" বলিতে বলিতে করজোড়ে উঠিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ করিলেন। প্রভুও "আজ আসি দিদি, যদি থাকা হয় তবে আর একদিন আসব।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সে দিনের সে সময়কার প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইল। সতীশবাবু কেবল বলিলেন—"শ্লোকটার ব্যাখ্যা শোনা হ'ল না। আচ্ছা, অন্য সময় হবে।" আমরা যে যাহার কাজে বাহির হইয়া আসিলাম। একটু পরেই নাটমন্দিরে প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের পাঠ আরম্ভ হইবে। আমরা পাঠ শুনিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

ব্রজবালা ও সখীদের উক্তি-প্রত্যুক্তি

শিবপুর ষষ্ঠীতলানিবাসী নারায়ণচন্দ্র পাঠক মহাশয় প্রায়ই আমাদের কোঁড়ারবাগানের বাড়ীতে আসিতেন। একবার স্বামী সচ্চিদানন্দ ব্রজবালা, পরেশচন্দ্র দত্ত, সত্যচরণ দাস, কালীপদ দাস, উমাচরণ দাস প্রভৃতি ১২।১৩ জন ভক্ত সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। তখন পূর্ব্বোক্ত পাঠক মহাশয় আমার দাদার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের পুতনামোক্ষন লীলা আলোচনা করিতেছিলেন। আমি ও আর একজন ছাত্র গ্রন্থ খুলিয়া আলোচনা শুনিতেছিলাম।

সঙ্কীর্ত্তন উপস্থিত হইতেই আমরা সকলে উঠিয়া বাহিরে গেলাম। দাদা অগ্রসর হইয়া ব্রজবালাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া ভিতরে লইয়া আসিলেন। ব্রজবালার মধুর নৃত্য এবং সুকণ্ঠ ও সুবাদক সত্যচরণের খোল বাজনার সঙ্গে সঙ্গে পদের এক একটি অক্ষর যেন সুধাবর্ষণ করিতেছিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা নৃত্যকীর্ত্তনান্তে সকলে বসিয়াছেন। আমি ও আমার ভাগিনা দুইখানি পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে চারি দিকে ঘুরিতেছি।

ব্রজবালা বলিলেন—"দেখ, সখীদের উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি পদাকারে কীর্ত্তন করলে তাঁদের বর্ণনানুযায়ী শ্রীমূর্ত্তি যেন প্রকট হ'য়ে কীর্ত্তনকারীর সম্মুখে প্রকাশ পায়। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে নবদ্বীপ গিয়েছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর কি জানি কেন মনে হ'ল একবার বাগানবাড়ীতে ললিতা সখীর কাছে যাই। তখন দুই-তিনজন ভক্ত-সঙ্গে রওনা দিলাম।

যেতে যেতে কয়েকবার মনে হ'ল সখীজির মুখে একটু রূপের কথা শুনব। কিন্তু আমার মনের সঙ্কল্প কারও নিকট প্রকাশ করলাম না। আশ্চর্য্য ব্যাপার, বাগানবাড়ীর বাইরে থেকেই বাদ্যযন্ত্রের শব্দের সঙ্গে অতি উচ্চকণ্ঠের কীর্ত্তন শুনতে পেলাম। খুব তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে দেখি, ঠাকুর-

মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দির লোকে পরিপূর্ণ—কেবল শ্রীমন্দির হইতে নাটমন্দিরের খানিকটা পর্য্যন্ত একটু সরু রাস্তা মতন ফাঁক রয়েছে আর তারই পশ্চিম দিকে ললিতা সখী সাঙ্গোপাঙ্গ-সঙ্গে ব'সে কীর্ত্তন করছেন। দুই দিকে দুইটি মৃদঙ্গ, পশ্চাতে একটি হারমোনিয়াম ও কয়েকজন ভক্তের হাতে করতাল রয়েছে আর শ্রীমন্দিরের বারান্দার উপর পত্রপুষ্পাদিতে সুসজ্জিত সিংহাসনে শ্রীশ্রীযুগল-কিশোর বিরাজমান।

নাটমন্দিরের পূর্ব্বদিকে ঝাউগাছের নিকট কিছু সময় দাঁড়িয়েছিলাম। সখীজি এক-একটি পদ বলছেন আর সঙ্গীগণ সমস্বরে তার পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ দোহারকি করছেন। কিছু সময় পরে তিনি উঠে ঐ ফাঁক মতন স্থানটিতে নৃত্য আরম্ভ করলেন। এক একবার কটি দুলিয়ে নানা ভঙ্গী করিয়া নাচতে নাচতে শ্রীবিগ্রহের দিকে যাচ্ছেন আবার সেইভাবেই নাটমন্দিরের দিকে আসছেন। চতুর্দিকে ঘন ঘন আনন্দোচ্ছ্বাস, ভক্তগণের মিলিত কণ্ঠে হরিবোল-ধ্বনি, মৃদঙ্গ-মন্দিরার গুরুগম্ভীর আওয়াজ আমাকে যেন কেমন বিহ্বল ক'রে ফেলল।

অতি অল্প সময় মধ্যেই আমার অন্তরের ভিতর যেন কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম। কখন যে আমি কীর্ত্তনের মধ্যে গিয়েছি বা কতক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করেছি জ্ঞান হ'তেও তা ঠিক বুঝতে পারি নি।

কীর্ত্তনান্তে সখীজির সঙ্গে একটু সময় আলোচনা ক'রে জানতে পারলাম যে, তাঁদের ওখানে ঝুলনযাত্রা শুক্লা-প্রতিপদ হতে আরম্ভ হয়ে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হয়। আমি যে দিন গিয়েছিলাম সেদিন সপ্তমী কি অষ্টমী হইবে। সখীজি অন্যান্য কথার পর বললেন—'এ সময় যে কয়দিন নবদ্বীপে থাকা হবে সে কয়দিনই যেন দর্শন পাই।' আমি তাঁর অনুরোধে এবং যে আনন্দ সেদিন ভোগ করেছি তার লোভে দু-তিন দিন গিয়েছিলাম। তবে সব দিন কীর্ত্তন শোনা ভাগ্যে ঘটে নি। কোন কোন দিন সখীজির সঙ্গে লীলাকথা প্রসঙ্গ ক'রেই চ'লে এসেছি। কি মধুর ভাব আর কি সুন্দর সুসিদ্ধান্ত ও যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা প্রশ্নের সমাধান।"

ব্রজবালা এই কথার পর অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া আবার কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। আমি কিন্তু তাঁহার প্রথম কথাটি সখীদের উক্তি-প্রত্যুক্তির পদ কোথা হইতে সংগ্রহ করা যায় সেই চিন্তাই করিতে লাগিলাম।

এই ঘটনার প্রায় আট মাস পরে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি দাদার এক শিষ্যাকে লইয়া আমাকে নবদ্বীপ যাইতে হইয়াছিল। শিষ্যাটি তাহার পূর্ব্বপরিচিত একজনের আশ্রমে বড়ালঘাটের কাছে রহিলেন আর আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত বাগানবাড়ীতেই পরমানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

দিদির সময় হউক না হউক, তিনি বসিতে পারুন না পারুন, ভক্তগণ বৈকালে তাঁহার ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় আসিয়া বসিবেনই। তারপর যখন নাটমন্দিরে পাঠ বা কীর্ত্তন আরম্ভ হয় তখন যাঁহার ইচ্ছা হয় উঠিয়া যান। আজ বৈকাল চারটা বাজিয়া গিয়াছে, তথাপি দিদি আসিতেছেন না। রাণাঘাটের কয়েকটি ভক্ত আসিয়াছেন, দিদির সহিত দেখা করিয়া যাইবেন। সংবাদ লইয়া জানা গেল, দিদি বিশেষ কি প্রয়োজনে উপরে গিয়াছেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর সহিত আমরা বসিয়া নিজ নিজ খুসিমত আলোচনা করিতেছি।

নন্দদাদা একখানি চিঠি হাতে করিয়া দিদিকে দিতে আসিয়া নীচে দেখা না পাইয়া বোধ হয় উপরে যাইতেছিলেন এমন সময় দিদি আসিয়া উপস্থিত। দিদির হাতে একখানি ভাঁজ করা খাতা। দিদির উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ডবৎ প্রণাম, কুশল জিজ্ঞাসা, পরিচয় প্রদান ও গ্রহণের ধুম পড়িয়া গেল।

যাহা হউক, কেবলমাত্র দিদিকে দর্শন করিতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা দর্শন করিয়াই চলিয়া গেলেন। অন্যান্য যাঁহাদের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না অথচ যখন আসিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারাও একটু সময় থাকিয়াই বিদায় লইলেন। অবশেষে আমরা যে কয়েকজন রহিলাম দিদির আসনের কাছাকাছি মিলিত হইয়া বসিলাম। নন্দদাদা দিদির নিকট বসিয়া পত্রখানি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

সত্য কথা বলিতে কি, অসময়ে দিদির উপরে যাওয়া এবং হাতে

খাতা, মুখের ভাব অত্যন্ত প্রফুল্ল;—এই সব দেখিয়া অন্য কে কি মনে করিতেছেন জানি না, আমার কেবলই মনে হইতেছে যে, নিশ্চয়ই কোন কিছু নূতন বস্তু লাভ হইয়াছে। কিছু বলিতেও পারিতেছি না, কিন্তু মনের মধ্যে বলি বলি ভাব তোলপাড় করিতেছে। সুযোগ জুটিয়া গেল। রোগা রমণ (খোলবাদক) কোথা হইতে আসিয়া দিদিকে দণ্ডবৎ করিয়া উঠিতেই দিদি বলিলেন—"কি রকম বাবাজী মশায় ! খবর কি ?" রমণ একটু তোত্‌লা। "খবর ভাল" এই কথাটি বলিতেই বেশ একটু সময় লইল। আর বিশেষ কিছু না বলিয়া "আচ্ছা এখন যাও, বিশ্রাম কর গিয়ে, পরে কথাহবে" এই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া দিদি খাতাখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

পাঠের পূর্ব্বে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কথাগুলি পাঠকগণকে শুনাইতে পারিলাম না। কারণ আমার নোট-করা খাতার ঐ স্থানটি আমার অসাবধানতায় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দিদি পাঠ করিলেন—

ললিতা— হেমকমলিনী রাইবিনোদিনী
নব মধুকর কান।
নয়ন চষকে আশকে আশকে
করিতেছে মধুপান॥

বিশাখা— রাকাশশধর শ্যামলসুন্দর
রাধিকা চকোরী তায়।
উড়িয়া উড়িয়া সুধা পিয়া পিয়া
রসেতে ভাসিয়া যায়॥

চিত্রা— (রাইর) নয়ন কমল শ্রুতি উতপল
হেরিয়া আনন্দ ভরে।
রসিক ভ্রমর নবনটবর
কাঁপিছে রসের ভরে॥

চম্পকলতা— নবজলধর রসে ঢর ঢর
রসিকশেখর রায়।
(হেরি) নব সৌদামিনী রাই বিকলিনী
বলে জড়াইতে চায়॥

রঙ্গদেবী— (রাইর) অধরযুগল পক্ক বিম্ব ফল
কাঁপিছে রসের ভরে।
নিরখি নিরখি শ্যাম শুকপাখী
ধৈরজ ধরিতে নারে॥

সুদেবী— (শ্যামের) বাহুসুবলনী করীকর জিনি
দুলিতেছে অনুরাগে।
হেরি বিকলিনী রাইকমলিনী
সরস পরশ মাগে॥

তুঙ্গবিদ্যা— জিনি করী অরি ক্ষীণকটি গোরী
কিঙ্কিণী তছু পরি।
(হেরি) মত্তমাতঙ্গ শ্যামল ত্রিভঙ্গ
ভয়ে কাঁপে থরহরি॥

ইন্দুরেখা— (শ্যামের) নাভিসরোবর বক্ষ পরিসর
ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি।
(ঐ দেখ) হিয়া দুলু দুলু আঁখ ঢুলু ঢুলু
কাঁপিছে কিশোরী গোরী॥

এতেক বচন শুনিয়া দুজন
আনন্দে মগন ভেল।
দুবাহু পসারি আপনা পাসরি.
দুহুঁ দোঁহা কোলে নিল॥

দিদি পাঠ শেষ করিয়া খাতাখানি মস্তকে স্পর্শ করিয়া রাখিয়া দিলেন।

ঐটি লিখিয়া লইবার ইচ্ছা থাকিলেও তখন আর কিছু বলিলাম না। পরে দিদির অনুমতি লইয়াই পদখানি লিখিয়া লইয়াছিলাম। আজ প্রসঙ্গক্রমে পাঠকগণকে উপহার দিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

গোবিন্দদাদার শিক্ষা

গোবিন্দদাদার সহিত দিদির প্রথম মিলন শ্রীধাম পুরীতে। দিব্যদৃষ্টিতে গোবিন্দদাদা দিদির ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই তখনকার বেশভূষা, আচার-ব্যবহার ভিন্ন রকম দেখিয়াও কেমন যেন মুগ্ধভাবেই দিদিকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন। দিদির তখন ব্রহ্মচারী বেশ, নাম জিজ্ঞাসায় জানিলেন—গোপালকৃষ্ণ। যদিও দিদি শেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রথম দর্শনে কথোপকথন ছলে খুবই তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। তখনকার বেশ, তখনকার ক্রিয়ামুদ্রা, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের নিয়ম কানুন বা আহারাদি নানা বিষয় লইয়াই এক এক সময় গোবিন্দদাদার সহিত দিদির ভীষণ বাক্‌যুদ্ধ বাধিত শেষে নবদ্বীপদাদার মধ্যস্থতায় মিটমাট হইয়া যাইত।

এই গোবিন্দদাদাই দিদিকে হাতে ধরিয়া খুঁটিনাটি সেবার কার্য্য সমস্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। নবদ্বীপদাদার অপ্রকটের পরও গোবিন্দদাদাই শ্রীগুরু-সেবা কি ভাবে করিতে হয়, শ্রীগুরুদেবের কোন্ সময় কোন্ জিনিসটি প্রয়োজন হইতে পারে, কোন্ সেবার দ্রব্যটি কি ভাবে রন্ধন করিলে প্রাণকোটীসর্ব্বস্ব শ্রীমৎরাধারমণ দেব তাহা আনন্দে গ্রহণ করিবেন, গোবিন্দদাদা পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়া দিদিকে দিয়া তাহা প্রস্তুত করাইয়া রাখিতেন।

গোবিন্দদাদা নিজে খুব ভাল রন্ধন করিতে পারিতেন। নানাপ্রকার পক্কান্ন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে দাদা সিদ্ধহস্ত; শুধু একজন সহকারী চাই। দিদিকে পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

অকপটভাবে সেবার সহকারী হওয়ায় গোবিন্দদাদার রন্ধনপ্রক্রিয়া, সেবাপরিপাটী, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সেবায় অসাধারণ প্রিয়তা, দীন দুঃখী পতিত কাঙ্গালের প্রতি সুস্নিগ্ধ ব্যবহার-কৌশল সমস্তই যে পরবর্ত্তী কালে দিদিতে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কুলদাবাবুর রাধাতত্ত্ব

একদিন হঠাৎ সুপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য ধর্ম্মবক্তা পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি. এ. মহাশয় সমাজবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। দিদি অধম লেখকের সহিত "নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর" এই পদখানির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। কলিকাতা বৌবাজার-নিবাসী নবগোপাল দে, চাংড়িপোতার বলাই ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কুলদাবাবুকে দেখিয়াই দিদি "আসুন আসুন" বলিয়া নিজহাতে একখানি আসন পাতিয়া দিলেন। কুলদাবাবু দণ্ডবৎ করিয়া বসিলে দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন আসা হয়েছে? সব কুশল তো?"

কুলদাবাবু।—আজই এসে পৌঁছেছি দিদি! গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে এক ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা ছিল। তাই রাত্রে সেখানে ছিলাম ভোরে সেখান থেকে এখানে এসেছি। শরীর তো ভালই আছে দিদি! মন বড় চঞ্চল। কি ক'রে কি করা যায় বল দেখি?

দিদি।—বেশ লোককে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন; আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিয়ে কি করব? আমি হলুম আপনাদের বাবাজী মহাশয়ের মঠের ভাঁড়ারী। আমার কাছে চাল, ডাল, তেল, নুনের খবর চান বলতে পারব; ওসব সাধনভজনের কথা, শাস্ত্রসিদ্ধান্তের ব্যাপার—ওসব তো আপনাদের একচেটে, ওসব আপনারা জানেন।

কুলদাবাবু।—দেখ দিদি! যারা তোমার কোন খবর জানে না তাদের

তুমি ঐ সব কথা ব'লে বিদায় করতে পারবে, আমি তোমার ওসব কথায় ভুলব না। যাক, এখন তুমিও ব্যস্ত আছ, আমিও পথশ্রান্ত। অন্য এক সময় এসে দেখা করব। একটু বিশেষ দরকার আছে। এবার কৃষ্ণনগরে বক্তৃতার বিষয় ছিল রাধাতত্ত্ব। ওখানে যেসব কথার আলোচনা হয়েছে, আমার সঙ্গী প্রকাশচন্দ্র তা নোট ক'রে এনেছে। বড় ইচ্ছে এ বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে ব'সে একটু আলোচনা করি।

দিদি।—এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। প্রাণেশ্বরীর কথা শোনাবেন তাতে আমার আপত্তি করবার কি কারণ আছে ?

কুলদাবাবু।—তবে আস্‌ছে কালই বৈকালের দিকে এসে বসা যাবে, এখন যাই।

কুলদাবাবু চলিয়া গেলেন, আমরাও সন্ধ্যারতির পরে "আবার আসব" বলিয়া নবগোপালদাদার সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী চলিলাম। সেদিন সেখানে চাঁপাঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল গান ছিল।

পরদিন যথাসময় আসিয়া কুলদাবাবু দিদির সহিত রাধাতত্ত্ব যেভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাই পরে কুলদাবাবু পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। দিদি আলোচনা-প্রসঙ্গে যে যে স্থানে যে সব সিদ্ধান্তাদি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন, কুলদাবাবু খুব আগ্রহের সহিতই তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই কুলদাবাবু বলিয়াছিলেন—

"অগাধ জলসঞ্চারী বিকারু নতু রোহিত।
গণ্ডুষজলমাত্রেণ সফরি ফরফরায়তে ॥"

আমরা দু-চারখানা পুঁথি পড়েই মনে করি খুব পড়েছি। কত লম্ফঝম্ফ করি। আর দিদি, লীলা-তত্ত্ব-সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে কত মূল্যবান মণিমাণিক্য পেয়েও কোনরূপ হৈ-হৈ না ক'রে চুপচাপ ব'সে আছেন। ধন্য ধন্য দিদি, তুমিই ধন্য, তোমার সাধনাই ধন্য।"

দিদির অনুভবে লীলাবর্ণন

কঠোর সাধনাদ্বারা সাধক কিছু কিছু অসাধারণ শক্তি লাভ করেন। অনেকে বলেন, ইহা অষ্টসিদ্ধির একটি। সাধারণ ভাষায় ইহাকে সিদ্ধাই বলে। অনেক ক্ষেত্রে এই সিদ্ধাই-ই সাধকের ইষ্টসাধনে বিঘ্ন আনিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। কেমন করিয়া সর্ব্বনাশ হয় তাহাই এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই—

"অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তি প্রেরণমীশিতা॥
গুণেম্বসঙ্গোবশিতা যৎ কামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ॥"

অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কাম্যপ্রাপ্তি—এই আটটিকেই সাধারণতঃ অষ্টসিদ্ধি বলে। এতদ্ব্যতীত গুণহেতু সিদ্ধিও অনেকগুলি আছে।

"অনুর্ম্মিমত্ত্বং দেহেহস্মিন্ দূর শ্রবণ দর্শনম্।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়-প্রবেশনম্॥
স্বচ্ছন্দ মৃত্যুর্দেবানাং সহ ক্রীড়ানু দর্শনম্।
যথাসঙ্কল্প-সংসিদ্ধিরাজ্ঞাহপ্রতিহতাগতিঃ।
ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বু-বিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোহপরাজয়ঃ॥"

অর্থাৎ অনুর্ম্মিমত্ত্ব—ক্ষুৎপিপাসারাহিত্য, দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, মনোজব অর্থাৎ মনের ন্যায় দ্রুতগতিতে যথেচ্ছগমন, পরকায় প্রবেশ, স্বচ্ছন্দ মৃত্যু, দেবগণসহ ক্রীড়ানুদর্শন, সঙ্কল্পসিদ্ধি, অপ্রতিহতগতি, ত্রিকালজ্ঞত্ব, অদ্বন্দ্ব অর্থাৎ শীত-

উষ্ণতাদিতে ক্লেশ বোধ না করা, পরচিত্তাদির অভিজ্ঞতা অর্থাৎ পরের মনের কথা জানা, অগ্নি সূর্য্য জল ও বিষাদির ক্রিয়া-সংরোধ, ইত্যাদি।

এই সকল শক্তির যে-কোন একটি বা কয়েকটি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা প্রয়োগ করিবার দুর্ব্বার বাসনা সাধককে চঞ্চল করিয়া তোলে। বুঝিতে দেয় না যে, ইহাই তাহার সাধনার চরম ফল নহে। সে তখন ঐ সিদ্ধির সামান্য সামান্য কাজ দেখাইয়া সাধারণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুগ্ধ ব্যক্তি তখন নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া নানাপ্রকার কার্য্যের জন্য অনুরোধ উপরোধ করিতে থাকে। দুর্দ্দৈব ঘটিলে এইখানেই সাধকের সাধনা শেষ হইয়া যায় এবং সে তখন অসম্ভবকে সম্ভব করাইয়া, সাদা কথায় ম্যাজিক দেখাইয়া, তাহার ইষ্ট আরাধনার পথ বন্ধ করিয়া দেয়। ক্বচিৎ দুই-একজন এই দুর্ব্বার লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার মোহ এড়াইয়া সাধনপথে অগ্রসর হয়। ইহারাই মহাপুরুষ।

এই জাতীয় মহাপুরুষদিগের জীবনেতিহাস লেখা শুধু তাঁহার জীবনের গোটাকয়েক স্থূল ঘটনা বিশ্লেষণের দ্বারাই পূর্ণ হয় না। মর্ত্ত্যবাসীর মৃত্যুভয়-নিবারক অমৃতসাধনার ইঙ্গিত, ঘনঘোর অন্ধকারের বিরুদ্ধে উন্নত উজ্জ্বল আলোর প্রচার, কি করিয়া একের আদর্শে অপর দশজনের মঙ্গল হইতে পারে তাহার কিছু কিছু সন্ধান জীবনীর মধ্যে থাকা দরকার। মানুষ যে শক্তির এক কণার অধিকারী হইয়া লম্ফঝম্ফ করে, সে শক্তি কাহার, কোথা হইতে কেমন করিয়া তাহা লাভ হইল—এই সকল বিষয় বিশেষ বিচার দ্বারা জানিতে হইবে। অভ্যাসের দ্বারা, কি ভাবে কিরূপ আচরণ দ্বারা লভ্যভাব রক্ষা হইতে পারে তাহার জন্যও চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ললিতাদিদিকে প্রায়ই বলিতে শুনিতাম, "যথাবস্থিত দেহকে লক্ষ্য না ক'রে সর্ব্বদা সিদ্ধদেহভাবনায় লীলাগত থাকবার চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। যথাসাধ্য অষ্টকাল লীলাস্মরণ বিশেষ প্রয়োজন। শরীরগত না হ'লেও অন্ততঃ বাক্যে মনে নিজ ভাবগত থাকবার জন্য চেষ্টা করাই প্রধান সাধন। প্রাকৃত রাজ্য

হতে অনাসক্ত থাকার জন্য চেষ্টা করা দরকার। মায়া সম্বন্ধ হতে দূরে থেকে পরমার্থ সম্বন্ধ জাগাবার চেষ্টা করাই উচিত। শারীরিক না হ'লেও মানসিক ভাবে মায়ার রাজ্য হতে পৃথক ভাবে অবস্থান করার চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য।"

বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ সাল ৩০ শ্রাবণ এক ভক্তকে পত্র লিখিতে লিখিতে অন্যান্য কথার পর লিখিয়াছেন—"..... সর্ব্বদা নিজের অভীষ্ট দেবের কথা স্মরণ, মনন, ধ্যান, ধারণায় থাকিও। হাতে সংসারের কাজ করিয়া মনকে অন্য রাজ্যে রাখিতে অভ্যাস করা ভাল। এখন ঝুলনলীলার সময়; দিবারাত্রে ঝুলন কেলিবিলাস যাহা আস্বাদন করিয়াছ, তাহা শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া, পল্লবিত করিয়া, শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি করিয়া, কলাচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া প্রাণের প্রাণ যুগলকিশোরের এবং সঙ্গিনীদের আনন্দবর্দ্ধন করিতে চেষ্টা করিবে। কখনও বা সঙ্গিনীদের পক্ষে থাকিয়া রসকলাচাতুর্য্যে প্রাণেশ্বরীকে লজ্জিতা, বিচলিতা, উত্তেজিতা করিতে চেষ্টা কর; আবার কখনও বা রসকলাকটাক্ষে' নাগরেন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়া বাক্‌চাতুর্য্যে পরাস্ত করিয়া প্রাণেশ্বরীর আনুগত্য স্বীকার করাও, কখনও কামকলাপরিপূর্ণ কটাক্ষে যুগলকিশোরকে বিলাসরসসাগরে ডুবাইয়া দর্শনস্পর্শে সেবাপ্রসঙ্গে থাকিয়া সঙ্গিনীদের আনন্দবর্দ্ধন করতঃ জীবন ধন্য কর। বৃথা সময় নষ্ট করিও না। স্মরণ মনন দ্বারা কালাতিপাত করিবে। মঙ্গলময় শ্রীগুরুদেব যখন যে ভাবে যেখানে রাখিয়া সুখী হন তাহাতেই নিজে সুখী হওয়া উচিত। ইতি

শ্রীগুরুপদাশ্রিতা
তোমাদের দিদি"

শ্রীমৎস্বামী গুরুগৌরবানন্দ (গৌরগোপাল গোস্বামী) মহারাজ বলিতেন—আমার বাড়ী নবদ্বীপে হইলেও দিদি কখনও সেখানে যান নাই, অথচ আমার বাড়ীর কোথায় কি হইতেছে সমস্তই আমাকে বলিতেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিতাম—দিদি! আপনি কেমন করিয়া এসব জানিলেন?

দিদি রহস্য করিয়া বলিতেন—"আমি যে গভীর রাত্রে সারা নবদ্বীপ ঘুরে বেড়াই।" যাঁহারা জানেন দিদি নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিন ছাড়া সমাজবাড়ীর বাহিরে কোথাও যান না তাঁহারাও দিদির এই দূরদর্শন বিষয় চিন্তা করিয়া আশ্চর্য্য হইতেন।

পাঠকগণ কিছু পূর্ব্বেই অষ্টসিদ্ধির আলোচনায় গুণহেতু সিদ্ধি সম্বন্ধে শুনিয়াছেন। এই সিদ্ধাইকেই চরমপ্রাপ্তি মনে না করিয়া যিনি অগ্রসর হইতে পারেন তিনি ইষ্টপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত করিয়া থাকেন। ভক্ত সাধকের মুখে শুনিয়াছি—"অষ্টসিদ্ধি নবনিধি নাছদুয়ারে গড়াগড়ি যায়।"

দিদি সর্ব্বদাই লীলাস্মরণে থাকিতেন, কাজেই কখন কোথায় কি লীলা হইতেছে তাহার প্রতিবিম্ব সহজেই তাঁহার সুনির্ম্মল চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হইত। বাংলা ১৩৪২, ১২ পৌষ পঙ্কজিনীকে পত্রে লিখিতেছেন—

"কল্যাণীয়া প্রীতিমঞ্জরী! (দিদি পঙ্কজিনীকে প্রীতিমঞ্জরী বলিয়া ডাকিতেন)

প্রাণেশ্বরীর সঙ্গে শ্রীসূর্য্যকুণ্ড হইতে আমরা যাবটে আসিতেছি। আজ মধ্যাহ্নে এক অপূর্ব্ব ঘটনা। প্রাণেশ্বরী সূর্য্যকুণ্ডে পূজার সম্ভার রাখিয়া শ্রীকুণ্ডের তীরে বকুলতলায় উৎকণ্ঠিতা—বড়ই কাতরা দেখিয়া শ্রীললিতাদিদি ও বৃন্দাদেবী কৃষ্ণের অন্বেষণে বাহির হইলেন। এদিকে নাগরেন্দ্র রাইবিরহে ব্যস্তসমস্ত ভাবে মধুমঙ্গলের সঙ্গে রাইমিলনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে শ্রীগিরিরাজের নিকট দিয়া শ্রীকুণ্ডের দিকে আসিতেছেন। এমন সময় পদ্মা এবং চন্দ্রাবলী জোর করিয়া নাগরেন্দ্রকে গিরিরাজের একটি গুহায় লইয়া গেলেন। পদ্মা চন্দ্রাবলীর সহিত শ্যামসুন্দরকে রাখিয়া মধুমঙ্গলকে লইয়া বাহিরে আসিলে মধুমঙ্গল অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। পদ্মা কুসুমসরোবরের নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষতলে ললিতা এবং বৃন্দাদেবীকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন, আজ আমাদের যূথেশ্বরীর সৌভাগ্যের কথাটা ললিতাকে বলিতে হইবে। এইরূপ বিচার করিয়া ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ললিতে! চম্পামেতো তিনগুণ হ্যায়—রূপ, গুণ, সুবাস।
ক্যা এক অপ্‌গুণ হ্যায় যো ভ্রমর না আতে পাস॥"

অর্থাৎ চম্পকবরণী শ্রীরাধাতে তিনটি গুণ—রূপ, গুণ এবং সুগন্ধ। কিন্তু মধু না থাকাতে ভ্রমররূপী শ্যামসুন্দর পদ্মার সখী চন্দ্রাবলীতে মধুপানে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছেন। শুনিয়া চতুরিণী ললিতা বলিলেন—

"পদ্মে! চম্পামেতো বিচিত্র গুণ হ্যায় রূপ, রস, গুণ, সুবাস।
হর ফুল জানা ভ্রমর কো কভী না লেতে পাস॥"

অর্থাৎ পদ্মে! চম্পকবরণী আমার প্রাণেশ্বরীতে এত গুণ, রস, রূপ, সুগন্ধি ও গরব রহিয়াছে যে, অন্য ফুলের মধুপান করে যে ভ্রমর সে বহুবার প্রার্থনা করিলেও সে তাহাকে নিজের কাছে লয় না।

শুনিয়া পদ্মার মুখ কালো হইল। ললিতাদেবী অন্যদিকে চলিয়া যাইতেই মধুমঙ্গলের সঙ্গে দেখা হইল। তখন বৃন্দাদেবী বলিলেন—

বটো! তোমার সখাকে চন্দ্রাবলীর সহিত মিলন করাইলে, এদিকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী যে অতিশয় কাতরা। বটু বলিল—দেবী! সখাও রাই-বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া আমার সহিত শ্রীকুণ্ডে যাইতেছিলেন। উহারা জোর পূর্ব্বক ধরিয়া লইল কি করে। আচ্ছা, আমি দেখি। এই বলিয়া সেই গুহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জোরে চিৎকার করিতে লাগিল।—আরে বড় বিপদ, কংস-প্রেরিত এক প্রবল অসুর আসিয়া গোবৎস সব ঘিরিয়া লইয়াছে, গোপবালক ব্যাকুলভাবে ভাই কানাই বলিয়া কাঁদিতেছে। বলরামচন্দ্র একা কিছুই করিতে পারিতেছে না। সখা যে কোথায় গেল আমি তো খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান। আর উপায় নাই।

শুনিয়া নাগরেন্দ্র মনে মনে বটুকে ধন্যবাদ দিয়া ব্যস্তভাবে চন্দ্রাবলীর ক্রোড় হইতে উঠিয়া 'প্রিয়ে চলিলাম' বলিয়া একেবারে ছুটিয়া কুসুমসরোবরের নিকট দিয়া শ্রীকুণ্ড অভিমুখে যাইতেছেন। এমন সময় বৃন্দা ও ললিতাকে দেখিয়া কাতরভাবে প্রাণেশ্বরীর মিলন প্রার্থনা করায় ললিতা নাগরেন্দ্রের প্রাণের অবস্থা বুঝিয়া শ্রীকুণ্ডে বকুলতলায় প্রাণেশ্বরীর সহিত মিলন করাইয়া পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন করিলেন ও হইলেন। ইতি

শ্রীগুরুপদাশ্রিতা
তোমাদের স্নেহের "দিদি"

ললিতাদিদির এইভাবে লীলাভোগ হইত। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, এজন্য তিনি নিজ সাধন-গৌরবে কখনও আত্মবিস্মৃত হইতেন না। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ জনকেও তিনি বলিতেন—"প্রাণেশ্বরী দয়া করিয়া দাসীকে অযাচিতভাবে যাহা দান করেন তাহার তুলনা দিবার ভাষা নাই। তাঁহার কৃপার জয় জয়কার" (১৩৪০।২৫ ভাদ্রের পত্র)।

ঐ পত্রের মধ্যেই এক স্থানে লিখিয়াছেন—"অষ্টকালীয় স্মরণ যথাসাধ্য সাধন করিও, বাহ্যিক দেহে মায়াস্পর্শ থাকিলেও অন্তশ্চিন্তিত নিজ সিদ্ধ দেহে যেন তাহার দাগ না লাগে।"

শ্রীভগবান লীলাময়। তাঁহার লীলা নিত্য। একবার হইয়াই যে শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা নহে। ত্রিকালসত্য তাঁর লীলা। তাই তিনিও নিত্য, তাঁহার লীলাও নিত্য। পরমহংসদেব সামান্য কলাগাছের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন—"কলাগাছের খোল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাজ পাওয়া যায়। খোল থাকিলেই যেমন মাজ আছে, তেমনি মাজ থাকলেই খোল আছে বুঝতে হবে। খোলেরই মাজ, মাজেরই খোল। নিত্য বললেই লীলা বুঝায়, আবার লীলা বললেই নিত্যত্ব বুঝায়।"

দিদি নিত্যলীলা সম্বন্ধে মুখে কিছু না বলিয়া তাঁহার প্রতিটি আচরণের মধ্য দিয়া,—সেবার মধ্য দিয়া লীলার নিত্যত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা ভ্রান্ত, চঞ্চলচিত্ত, তাই তাঁহার উপদেশ সকল সময় ধরিতে পারি নাই। একবার দিদির শরীর খুবই অসুস্থ হইয়াছিল, একটু সুস্থ হইয়া একজনকে পত্র লিখিতেছেন—

"...প্রথম কয়েক দিন ফণি, হরিদাস প্রভৃতি তিন-চারজনের জর লইয়া বড়ই ঝঞ্ঝাটে ছিলাম। তৎপর যেদিন ইন্দুদিদির পত্র পাই সেইদিন আমার ১০৪ জর। মনে করিয়াছিলাম বোধ হয় রাধারাণী অযোগ্যা দাসীকে আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু তাহা হইল না, আবার এই অযোগ্য দেহ লইয়াই রহিলাম। অবশ্য কৃপাময়ী আমাকে অন্য কোনই দুঃখে রাখেন নাই, কেবলমাত্র এই অযোগ্য

দেহের জন্যই প্রাপ্তবস্তু ভোগ করিতে পারিলাম না। তোমাদের দুই ভগ্নীর হৃদয়ের একনিষ্ঠভাব দেখিয়া আমার ঈর্ষা হয়। মনে ভাবি, আমাকে উহারা কোন্ গুণে বড় বোন বলে ? আবার ভাবি—প্রভো ! উহাদের হৃদয়ের অবস্থা আরও উচ্চ হউক ; উহারা রঙ্গদেবী, সুদেবীর ন্যায় শ্রীমতীর প্রেমপাত্রী হউক, আমি তখন জোর করিয়া উহাদের নিকট হইতে প্রেমধনের ভাগ লইব। ইতি

তোমাদের স্নেহের অযোগ্যা

দিদি"

সখীগণ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে যাইয়া দিদি নানাপ্রকার শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইয়া শেষে লিখিয়াছেন—"সখী অনেক প্রকার। তন্মধ্যে প্রিয় নর্ম্মসখী তিন প্রকার—সেবাপরা, রসপরা ও বিলাসপরা। সেবাপরা সখীদিগের নাম মঞ্জরী। বিশেষ অন্তরঙ্গা। রসপরা শ্রীললিতাদি। বিলাসপরাগণই যূথেশ্বরী নামে খ্যাতা। তন্মধ্যে শ্যামলা, বিমলা, মঙ্গলা ও অমলা প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান। উঁহারা সম্পূর্ণ শ্রীমতীর অনুগা এবং প্রাণসমা (রসোদ্গারাদির অধিকারিণী) হইয়াও সময়ে সময়ে নিজ কুঞ্জে প্রাণেশ্বর-সহ মিলনসুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

ললিতাদি সখীবৃন্দ যূথেশ্বরীসমগুণা হইলেও এবং প্রাণেশ্বর কর্ত্তৃক বিলাসাদি জন্য প্রার্থিতা হইলেও একমাত্র শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী ভিন্ন অন্য জানেন না বা নিজ নিজ দেহ দ্বারা রসিকশেখরের অভিলাষ পূর্ণ করিতে যত্নশীলা হয়েন না। তবে যে তাঁহাদের সহিত সময়ে সময়ে বিলাসাদি দেখা যায় সে কেবল প্রাণেশ্বরীর ইচ্ছা বা সুখ-বিধানের নিমিত্ত। সেবাপরা(মঞ্জরী)গণের সহিতও যে সময়ে সময়ে বিলাসাদি দেখা যায় সেও ঠিক এইরূপ। অর্থাৎ ইঁহারা একমাত্র প্রাণেশ্বরীর সুখে সুখী, তাঁহার বিলাসে ইহাদের যতদূর আনন্দ, নিজ বিলাসে তাহার শতাংশের একাংশও নহে।

এই জাতীয় হৃদয় না হইলে উঁহাদের গণে গণ্য হওয়া যায় না। সুতরাং এই ভাবটি (রসপরা ও সেবাপরা) আমাদের স্মরণীয় বা আচরণীয়। আর অধিক কি লিখিব—যথার্থই বলিতেছি, এবার তোমাদের সহিত লীলাপ্রসঙ্গ

বা ইষ্ট-গোষ্ঠীর সময়টা উপস্থিত হইলে আমাকে বিশেষভাবে বিচলিত করিয়া ফেলিতেছে। বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ সময়টা আজ পর্য্যন্ত মনটাকে স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমরা যেমন মনকে সহজে স্থির করিতে পার, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন সহজে তোমাদের মত হইতে পারি। জয় গুরু, জয় গুরু!

শ্রীগুরুপদাশ্রিতা

তোমাদের স্নেহের দিদি"

১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ সরযূকে অন্যান্য কথার পর লিখিয়াছেন—"এখন স্বামিনী একাগ্রচিত্তে প্রাণবল্লভের জন্য নানাবিধ রন্ধন করিতেছেন। এমন একতান যে—

"দোলত কুণ্ডল লোলত অঙ্গ
কুচযুগ কঞ্চুক ভেল উচঙ্গ
বসন ভূষণ সব আনত ভেল।"

প্রতি অঙ্গজ্যোতিতে রন্ধনভবন উজ্জ্বল হইল। লোভী কীট গবাক্ষে নয়ন দিয়া প্রাণভরে দর্শন করিয়া পরশ লাগি অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে, কম্পিত কলেবরে চোরের ন্যায় ভীত হইতেছে। প্রাণেশ্বরী বিশাখার চাতুরীতে গবাক্ষে যাহা দেখিলেন বা মনে যে ভাবের উদয় হইল, নয়নে নয়নে উভয়ে যে কথা ও প্রাণের ব্যথা বলাবলি করিলেন তাহা বুঝাইবার ভাষা নাই, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার। ইতি

শ্রীগুরুপদাশ্রিতা

তোমাদের দিদি"

পাঠকগণকে একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে সবিনয় অনুরোধ করি যে, কতদূর স্মরণ-মননে চিত্তনিবিষ্ট হইলে এইভাবে লীলা প্রত্যক্ষ হয়। সাধক সাধনা করেন প্রাকৃত রাজ্যে কোনও স্থানে আসনে বসিয়া। কিন্তু তাঁহার চিন্তা হয় অপ্রাকৃত রাজ্যের অপ্রাকৃত লীলার। আমরা তো কোন্ ছার, অনেক বড় বড় চিন্তাশীল লেখকও এই স্থানে আসিয়া লেখনীকে সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মঠে মন্দিরে ঠাকুর রসাইয়া খুব জাঁকজমকে তাঁহার উৎসবাদি করিয়া আমরা মনে করি, খুব কিছু করিলাম। কিন্তু যে উৎসবপর্ব্ব সমাধা করিলাম, তাহার কোনরূপ ছাপ চিত্তে লাগিল কি-না সে বিষয় আমরা আদৌ চিন্তা করি না। নবদ্বীপ সমাজবাড়ীতে সমস্ত উৎসবপর্ব্বই দিদি যথাযথভাবে করিতেন। তাঁহার সুনির্ম্মল চিত্তদর্পণে উৎসবপর্ব্বের চিত্র এমন নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হইত যে, বর্ণনভঙ্গীতে মনে হইত যেন লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ১৩৪৩ সাল, ২৮শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-উৎসব সমাপনান্তে দিদির সঙ্গী সরযূকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ আস্বাদন করুন। দিদি লিখিয়াছেন—

"স্নেহের ভগ্নী সরযূ! আশা ছিল না যে এবার ঝুলনে এত আনন্দ দিবেন। ১৪ দিন ঝুলন হইবার কথা, কিন্তু এবার তিথির গোলমালে ১৫ দিন হইল। পূর্ণিমার পরদিন রাইরাজা। প্রাণেশ্বরীর অপার করুণা, লাড়িলী-কুণ্ডে সন্ধ্যার সময় ১০ দিন এবং বৃন্দাবনে ৫ দিন; কি যে আনন্দের পাথার বহিয়া গিয়াছে তাহা বলিবার ভাষা নাই। অত মাতামাতি আনন্দের পর একবার যাবটে গিয়াছিলেন। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গত ষষ্ঠীর দিন শ্রীনন্দালয়ে আসা হইয়াছিল। প্রাণেশ্বরীর জন্মাষ্টমী এক মাস পিছাইয়া গেল বলিয়া শ্রীযুক্তা শাশুড়ী ঠাকুরাণী নন্দালয় হইতে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব করায় মা বলিলেন—আমার তো কোনই আপত্তি করিবার নাই, তবে লালীর জন্মতিথি উপলক্ষে অন্ততঃ ১০।১৫ দিন পূর্ব্বে উহাকে ত ছাড়িয়া দিতে হইবে!

মায়ের বুদ্ধির কৌশলে পড়িয়া বুড়ী বলিল, আমার ঘরের লক্ষ্মী, আমি ভাদ্র মাসে ত দিতে পারিব না; কাজেই তুমি এখান হইতেই লইয়া যাও। সুতরাং গতকল্য বৈকালে নন্দালয় হইতে বর্ষাণে আসা হইল। এখন এক মাস মায়ের আদরে আবদারী দিদিকে লইয়া আমরা পরমানন্দে বর্ষাণে কাটাইব।

নন্দালয়ে যে কয়দিন থাকেন ঐ কয় দিন নানারূপ ব্যস্ত থাকার জন্য সূর্য্যকুণ্ডে (বড়) যাওয়া হইয়া উঠে না, নন্দগ্রামস্থ সূর্য্যমন্দিরেই সূর্য্যপূজা

হয়। সূর্য্যপূজা উপলক্ষে প্রাণবঁধুর সহিত মিলন হওয়া অসম্ভব। দর্শন-স্পর্শন ত সর্ব্বদাই হইতেছে, মাত্র বৈকালে শ্রীললিতাদেবীর কৌশলে স্নানের ছলে পাবন সরোবরের তীরে বনমধ্যে মিলন প্রভৃতি হইয়া থাকে।" ইত্যাদি।

অনুভব—অনুভব। কিন্তু দিদির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, নিজে অনুভব করিয়া সঙ্গীদের তাহার আস্বাদ না দিয়া পারিতেন না। যখন যে ভাবের যে লীলার যতটুকু আভাস চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গীদের সঙ্গে পরমানন্দে ভোগ করিয়াছেন। ভাবুক কবি প্রাণের আবেগে প্রাণকান্তের নিকট অকপট প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছেন—

"ভুলায়ে রেখ না ভবে ভাবে ভাবে ভাবাও ভবে
ভাবনিধি হৃদয়বল্লভ !
সুখে বা দুঃখেতে রাখ যা ইচ্ছা তোমারি
তুমি আমার আমি তোমার (আর) সকলি তোমারি ॥"

আমরা ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হই, তবু ভাবনার শেষ হয় না। কি ছাই মাথামুণ্ডু যে ভাবি অনেক সময় তাহাও ভাবিয়া পাই না। দিদি কথায় কথায় একদিন বলিয়াছিলেন—"ভাবিতে হয়তো এমন ভাবনা ভাব, যে ভাবনার শেষ নাই, অথচ অবসাদও নাই। 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' যত ভাবিবে ততই আনন্দ, ততই ভাবিবার জন্য আগ্রহ বাড়িবে।"

কথাটা তখন তত তলাইয়া ভাবি নাই। মধ্যে মধ্যে মনের মধ্যে সেই দিন হইতে তোলপাড় করে। আর থাকিতে না পারিয়া শেষে দিদির কাছে মনের কথাটা লিখিয়া পাঠাইলাম। দিদি কৃপা করিয়া ১৩২৮ সাল ১লা আশ্বিন তাহার জবাবে লিখিয়াছিলেন—

"...পত্রে মনোভাব অবগত হইলাম। আর কি চিন্তা করিবেন? চিন্তা করিতে হয় তো শ্রীশ্রীরাধারাণীর লীলা, রূপ, গুণ চিন্তা করুন। সর্ব্বদা মানসে ব্রজে বাস করিয়া অষ্টকাল সেবায় নিযুক্ত থাকিতে চেষ্টা করুন। নিকুঞ্জেশ্বরীর আজ্ঞাসেবা গ্রহণ পূর্ব্বক নিকুঞ্জরাজের শ্রীকরাকর্ষণে তাঁহার

বিশাল বক্ষঃস্থলস্থিতা হইয়া আনন্দচিন্ময় রসভাবিতা হউন। নাগরের শ্রীমুখচন্দ্রে তৃষিতা চাতকীর ন্যায় নয়নযুগল অর্পণ করতঃ সুখের পাথারে ডুবিয়া যাউন। নিত্যনূতন ভাবে, নূতন স্থানে, নূতন বেশভূষায় ভূষিত যুগল-কিশোরের মিলনানন্দ উপভোগ করুন। সখী মঞ্জরীগণের পরম প্রেষ্ঠা হউন। শ্রীগুরুরূপা সখীর অনুগামিনী হউন। দিন দিন অপ্রাকৃত আনন্দরস-সুধাপানে পরিতৃপ্তা ও স্নিগ্ধা হইবেন। স্থূলদেহও সুস্থ হইবে। বাজে বিষয় ভাবিয়া দুর্লভ মনুষ্যজীবনের নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর কাল কাটানো উচিত কি ?" ইত্যাদি আরও অনেক কথা লিখিয়াছিলেন।

কোনরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইলে আমরা নানা প্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা সঙ্কট মোচনের চেষ্টা করি। হায় হায়, কি হইবে, কেমন করিয়া এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইব—এইরূপ নানা ভাবনা করিয়া সম্মুখে যাহা পাই তাহাই অন্ধ-বিশ্বাসের বলে আঁকড়াইয়া ধরি। মুর্শিদাবাদ হইতে কোন ভক্ত একবার এই ভাবের সঙ্কটে পড়িয়া দিদির শরণাপন্ন হইলে দিদি তাঁহাকে অভয় দিয়া লিখিয়াছিলেন—

"...তোমাদের পরীক্ষার সময় উপস্থিত। এখন একটু ধৈর্য্য ধরিবার প্রয়োজন। নিশ্চয়ই জানিবে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ভিন্ন মানুষের কোনই হাত নাই। যদিও কর্ম্মফলানুসারে জীবের ভোগাভোগ হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহাও মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। দুঃখ করিয়া কোনই ফল নাই। হায় কি হইবে, হায় কি করিব বলিয়া দিবানিশি হায় হায় করা অপেক্ষা ততক্ষণ তাঁহাকে ডাকা উচিত। তিনি অমঙ্গলের মধ্য দিয়া, অশান্তির মধ্য দিয়া পরম মঙ্গল, পরম শান্তি দান করিয়া শ্রান্ত, ভ্রান্ত, মহামোহগ্রস্ত জীবকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অভয় পদারবিন্দে স্থান দিয়া থাকেন।

সর্ব্বদা প্রাণে প্রাণে প্রাণেশ্বরীর শ্রীচরণসমীপে থাকিয়া তাঁহার লীলা অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার যে, তিনি বড় বড় বিপদ, বড় বড় অশান্তির সাগরের মধ্যে থাকিয়াও কেমন তাঁহার প্রাণকোটীসর্ব্বস্ব প্রাণেশ্বরকে চিন্তা

করিয়া শান্তিতে কাল যাপন করেন। আমরা তত দূর না পারিলেও তাঁহার দাসী তো? একটুও তো করা উচিত? আর অধিক কি লিখিব; সর্ব্বদা নামের আশ্রয়ে থাকিও, বিপদে সম্পদে নামই রক্ষা করিবেন। ইতি—

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা
তোমাদের দিদি"

বড় বাবাজী মহাশয়ের প্রসাদে-নিষ্ঠা শিক্ষাদান

প্রসাদে নিষ্ঠা শিক্ষা দিতে বড় বাবাজী মহাশয় বহুবার বহুভাবে নিজে আচরণ দ্বারা সঙ্গীগণের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। 'চরিতসুধা' গ্রন্থে অনেক বর্ণনা আছে, তবু আমরা নূতন যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহার দুই-একটি পাঠকগণকে উপহার না দিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। 'চরিতসুধা' গ্রন্থে দিদি তাঁহার নিজের সম্পর্কিত বহু ঘটনাই বর্ণন করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে যেটুকু না দিলে নয়, মাত্র সেইটুকুই দিয়াছেন। ইহা তাঁহার চিরকালের স্বভাব। নিজের কথা বলিয়া নিজের ঢাক নিজে পিটাইয়া আমরা যেমন তিলকে তাল করিয়া তুলি; দিদি তাহা তো করিতেনই না, বরং নিজের কথা ঢাকা দিয়া নিজে যেন কিছুই নয় এই ভাবের কথাই পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিতেন। তাই আমরা তাঁহার অবর্ণনীয় ঘটনাগুলির দুই-একটি প্রকাশ করিয়া দিতেছি। অবশ্য তিনি প্রকট থাকিলে এ সব প্রকাশ করিতে দিতেন কিনা সন্দেহ। একদিনের একটি ঘটনা বলি—

ঝাঁঝপেটা মঠে আজ ঠাকুরের শয়ন হইয়া গিয়াছে। অভ্যাগত যাঁহারা মঠে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। দিদি ঠাকুরের আঙ্গিনায় বসিয়া তুলসীমালা দ্বারা হাতের বাজু তৈয়ার করিতেছেন। কাছে বসিয়া কুসুমদিদি, দয়ালদাদা ও কুঞ্জদাদা আবশ্যকমত দিদিকে সাহায্য করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দয়ালদাদা দিদিকে বলিতেছেন—

"বাবাজী মহাশয় ক'দিন মঠে নেই, সব যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।" কুঞ্জদাদা বলিলেন—"সত্যি বলছি ভাই, আমার এক মুহূর্ত্তও আর এখানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না।"

দিদি।—তিনি ইচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ, তাঁর যেভাবে যাকে রেখে সুখ হচ্ছে তাতে, দাদা! আমরা সমালোচনা ক'রে কি করব?

এই ভাবের দুই-চারিটা কথার পরই কুঞ্জদাদা উঠিয়া গেলেন। কেন গেলেন, কোথায় গেলেন তিনিই জানেন। ইঁহারা কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করিলেন না। যে যাহার কাজ করিতে লাগিলেন।

কুঞ্জদাদা উঠিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই "নিতাই গৌর হরিবোল" ধ্বনি করিয়া বড় বাবাজী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে কেহ নাই, রাত্রও অনেক হইয়াছে কাজেই একটু যেন ইতস্ততঃ ভাবেই ললিতাদিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু আছে কি? প্রসাদ পাওয়া হয় নি।" বলিয়া দিদিকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই আবার বলিলেন—"ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই।"

দিদি।—ব্যস্ত হবার কি আছে? শ্রীরাধাকান্তের ভোগের পারসখানিই প্রসাদীঘরে তোলা আছে।

বাবাজী।—বেশ, বেশ। আচ্ছা, দেখি নিতাইচাঁদের কি ইচ্ছা!

ললিতাদিদি প্রসাদ আছে এই কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাবাজী মহাশয়ের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রসাদ আনিতে ছুটিলেন। কিন্তু প্রসাদের ঘরে গিয়া দেখেন, কুঞ্জদাদা পারসখানি লইয়া প্রসাদ পাইতেছেন। দিদি ব্যাকুলভাবে কুঞ্জদাদাকে সমস্ত কথা বলিলেন। কুঞ্জদাদা আর গ্রহণ না করিয়া ঐ প্রসাদ বাবাজী মহাশয়ের জন্য আনীত থালায় তুলিয়া দিলেন। দিদি সমস্ত ব্যবস্থামত সাজাইয়া বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিলেন।

এদিকে বাবাজী মহাশয় যেন কিছুই জানেন না এইরূপ ভাব দেখাইয়া প্রসাদ পাইলেন এবং অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহা দেখাইয়া ললিতা দিদিকে বলিলেন—"কুঞ্জকে বঞ্চিত ক'রে আমাকে প্রসাদ দিয়েছিলে; এখন এইটা নিয়ে

তাকে দাও।" দিদি এই কথা শুনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, কাঁদ কাঁদ স্বরে করযোড়ে বলিলেন—"আমি ঘোর অপরাধিনী, আপনাকে কুঞ্জদাদার উচ্ছিষ্ট দিয়েছি। হায়, হায়, কেন আমার মরণ হ'ল না!" এইরূপ নানাপ্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় যেন একটু ক্রুদ্ধভাবেই বলিলেন—"এতদিন রাধাকান্তের সেবা ক'রে, এত সাধু মহান্তের কৃপা পেয়ে বুঝি এই লাভ হয়েছে? প্রসাদ কখনও উচ্ছিষ্ট হয়? এ অন্ন তুমি রাধাকান্তকে সমর্পণ কর নি?"

দিদি।—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিশোরীদিদি রাধাকান্তকে সমর্পণ করেছেন।

বাবাজী।—তবে? তোমাদের কতদিন কতবার বলেছি না—মহাপ্রসাদ কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না?

"কৃষ্ণে নিবেদিত যে কিছু হইবে।
মহাপ্রসাদ জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিবে॥"

দিদি।—আজ্ঞে, আমরা তো সেই জ্ঞানেই গ্রহণ করি, কিন্তু এ যে কুঞ্জদাদার উচ্ছিষ্ট!

বাবাজী।—(ধমক দিয়া) আবার ঐ কথা! কুঞ্জ তো আর অপ্রসাদী অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণ করে নি! সে তো রাধাকান্তে নিবেদিত প্রসাদই পেয়েছিল। মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে শাস্ত্রকার উর্দ্ধবাহু হয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

"কুক্কুরাণাং মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পাবনং মহৎ।"

মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখবে এবং সেইভাবে নিজেরা চলবে, অপর ছেলেদেরও চলতে শিক্ষা দিবে। মনে রেখো, তোমার উপর আমার এই সব ছেলেদের ভার দিয়েছি। শেষে যেন এদের আচার ব্যবহার কোনরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হয়, লোকে যেন কোনরূপ কটাক্ষ করতে না পারে। পুনরায় তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—

"স্পর্শদোষে কৃষ্ণপ্রসাদ নষ্ট নাহি হয়।
নষ্টদোষ ঘটাইলে নরক নিশ্চয়॥"

বাবাজী মহাশয় নিবৃত্ত হইলে ললিতাদিদি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাবাজী মহাশয়ের অধরামৃত লইয়া কুঞ্জদাদাকে দিলেন। কুঞ্জদাদাও উপস্থিত সকলকে কিছু কিছু দিয়া অবশিষ্ট নিজে গ্রহণ করিলেন।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, ললিতাদিদি জানিয়া শুনিয়াও কুঞ্জদাদার নিকট হইতে প্রসাদ লইয়া বাবাজী মহাশয়কে দিলেন কি প্রকারে? ইহাতে প্রীতি ও মর্য্যাদাবোধ কোন্‌টির প্রাধান্য দেওয়া হইল? উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, "মর্য্যাদা লঙ্ঘনে হয় নরকগমন" এ উক্তি শুনিয়াও ভক্ত প্রিয়তমের প্রীতির জন্য মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া নরকগমন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। কারণ সে বুঝে, আমার যা হয় হউক, প্রিয়তমের সুখ হইলেই হইল। গোপীগণ নারদের নিকট শ্রীগোবিন্দের শিরঃপীড়ার সংবাদ শুনিয়া এবং তাঁহাদের পদধূলি পাইলে ভাল হইবেন জানিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। গম্ভীরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ বলিয়াছিলেন—

"গোবিন্দ কহয়ে মোর সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিম্বা নরকে গমন॥"

একাঙ্গী, সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা—এই চার প্রকার প্রেম। একাঙ্গী—এক পক্ষ চায়, অন্য পক্ষকে গ্রাহ্যও করে না। সাধারণী—শুধু নিজের সুখ চায়। সমঞ্জসা—সমান সমান, তোমারও সুখ হউক আমারও হউক। আর সমর্থা—সর্ব্বোচ্চ প্রেম, ইহাতে আত্মসুখ একেবারে থাকে না। শুধু তোমার সুখ হউক, আমার তাহাতে যাহা হয় হউক। শ্রীমতী রাধিকার এই ভাব ছিল। তাই শ্রীমতীর সমর্থারতি।

শারদীয়া পূজায় অপূর্ব্ব দর্শন

একবার নবদ্বীপ সমাজবাড়ীতে দুর্গাপূজার সময় এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সে অপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন করিতে নবদ্বীপবাসী অনেকেই সমাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দেবীকে স্নান করাইবার জন্য নানা তীর্থবারিপূর্ণ ঘট ও একখানি বড় থালা লইয়া পুরোহিত ঠাকুর বসিয়া আছেন। সুগন্ধী তৈল হরিদ্রাদি সমর্পণান্তে যথাবিধি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঐ থালার উপর জল ঢালিয়া তিনি দেবীকে স্নান করাইতেছেন। ললিতাদিদি তন্ত্রধারকের আসনের নিকট বসিয়া দেবীর মহাস্নানলীলা স্মরণে মগ্ন। স্নানবারি ঢালা শেষ হইলে পুরোহিত ঠাকুর নূতন গাত্রমার্জ্জনী লইয়া দেবীর অঙ্গ মার্জ্জন উদ্দেশে দর্শন করাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া থালার দিকে দৃষ্টি দিয়া স্নানজলে দেবীর প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে যাইয়া দেখেন, একগাছি লম্বা চুল থালার মধ্যে রহিয়াছে। দিদি স্নানলীলা স্মরণে বিভোর। পুরোহিত মহাশয়ের আহ্বানে থালার দিকে চাহিয়া সুদীর্ঘ কেশ দর্শনে ভাবগদগদকণ্ঠে 'জয় মা কাত্যায়নী' বলিয়া সকলকে উহা দেখাইতে লাগিলেন।

সমালোচকের অভাব কোন কাজে কোন কালেই হয় নাই, আজই বা হইবে কেন? দুই-একজন 'ও কিছু নয়' বলিয়া ভ্রূকুটি-কুটিল-কটাক্ষে বিদ্রূপবাক্য বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। পুরোহিত ঠাকুর কেশগাছি তুলিয়া "এত বড় কেশ তো এখানে কাহারও নাই" বলিতে বলিতে ভাবাবেগে "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া নয়নজলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। নবদ্বীপবাসী বহু ভাগ্যবান এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

একটি কথা পূর্ব্বেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু বলা হয় নাই। কথাটি আর কিছু নয়, বাগানবাড়ীর পৌরোহিত্য কে করিতেন এই কথা। প্রথম বাগানবাড়ী গ্রহণের পর হইতে কিছুদিন বড় বাবাজী মহাশয়ের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গোপাল

ঘটক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ করেন। তারপর ললিতাদিদি বাগানবাড়ীর নিকটস্থ বিনোদবিহারী সান্যাল নামক একটি ব্রাহ্মণ-বালককে নিজের কাছে রাখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ক্রিয়াপদ্ধতি শিক্ষা দিয়া পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া লয়েন। আজ উক্ত সান্যাল মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি তিনি দিদির শিক্ষানুসারে মঠের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম্মে পৌরোহিত্য করিতেছেন।

এই সান্যাল মহাশয়ের নিকট হইতে দিদির দেবদেবীর পূজার শিক্ষাদান-প্রণালী যাহা শুনিলাম, তাহার সকলগুলি সাধারণে প্রকাশযোগ্য নয় বলিয়া প্রকাশে বিরত হইলাম। একটি নিয়মের পরিচয় ইনি দিলেন—"রাজরাজেশ্বর" নারায়ণ চক্রকে সমস্ত সমর্পণপূর্ব্বক সেই প্রসাদ দ্বারা অন্যান্য দেবদেবীর অর্চ্চনা করা। তিনি বলিলেন, এই নিয়মেই বাগানবাড়ীতে কার্য্য হইয়া আসিতেছে।

দুর্গাপূজা পদ্ধতি যাহা দিদি সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তদনুসারে বাগানবাড়ীতে তো পূজা হয়ই, অন্যান্য বহু স্থানে, বিশেষতঃ বাবাজী মহাশয়গণের ভিতর, এখনও সেই ধারা ধরিয়াই কার্য্য চলিতেছে।

তিনের আদর্শ তিনজন

ভক্তি যাহার আছে, তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ ভক্ত বলিয়া অভিহিত করি। এই ভক্তির কথা বলিতে যাইয়াই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, দৈন্যেরই নামান্তর ভক্তি। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, ভক্তিরূপ মহামূল্য মণিকে রক্ষা করিবার সর্ব্বোত্তম সুদৃঢ় আধারই হইল দৈন্য।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই দৈন্যলাভ হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে এক কথায় বলা যায়, একমাত্র ভক্তের পূজা দ্বারাই এই দৈন্যভাব সম্যকরূপে সত্বর লাভ হয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।"

শ্রীভগবান তাঁহার পরম প্রিয় ভক্তের দ্বারাই ভক্তিধন দান করিয়া প্রীতিলাভ

করেন। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানের কৃপালাভের সুযোগও ভক্ত-কৃপাতেই পাওয়া যায়। শাস্ত্রবাক্য—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত পরিচর্য্যা রতাত্মনাম্॥"

অর্থাৎ যিনি ভগবান অচ্যুতের সেবা করেন তাঁহার সিদ্ধিলাভে বরং সংশয় থাকিতে পারে, কিন্তু যিনি তদীয় ভক্তের পরিচর্য্যায় রত থাকেন তাঁহার সিদ্ধিলাভে কোনরূপ সংশয়ই নাই।

ভক্তি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। নরকাদি ভয়ে ভীত হইয়া স্বর্গাদি ভোগকামনায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে ভগবৎভজন তাহাকেই সাধারণতঃ বৈধী ভক্তি বলে। এই বৈধী ভক্তি আচরণশীল ভক্ত ভগবানের সুখ-অসুখ, প্রীতি-অপ্রীতি কিছুই দেখিতে চান না। তিনি চান শাস্ত্রোক্ত বিধি পালন করিতে এবং নিষিদ্ধ নিয়ম বর্জ্জন করিতে। আর রাগমার্গীয় ভক্ত শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল প্রাণে ভগবানে লোভপরায়ণ হইয়া ভজন করেন। তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্র সুখকামনা বা কোনরূপ ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সর্ব্বদাই কিসে ভগবানের সুখ প্রীতি হইবে সেই চেষ্টা। এ জাতীয় ভক্তের সর্ব্বদাই ভগবৎসুখানুসরণ ও তাঁহাতে সুদৃঢ় শ্রদ্ধা বর্ত্তমান থাকে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈধী ভক্ত কার্য্য করিয়া কামনা মত ফল চায়, আর রাগমার্গীয় ভক্ত উপাস্যের সুখ চায়, নিজের তাহাতে যাহা হয় হউক। এক কথায় মহাজনগণ বলিয়াছেন—"বিধি বহিরঙ্গ, রাগ অন্তরঙ্গ।"

আমাদের আলোচ্য ললিতাদিদির ভজন ছিল এই অন্তরঙ্গ রাগ পর্য্যায়ে। দিনে রাতে, শয়নে স্বপনে প্রতিটি কার্য্য ছিল তাঁর সেব্যের সুখবিধান জন্য। বড়বাবাজী মহাশয়কে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার এই সুমধুর ভজনপ্রণালী আরম্ভ হয়। এতৎপূর্ব্বে তিনি কি ভাবে কি করিতেন তাহা পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতেই বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এই বড়বাবাজী মহাশয় যে সময় প্রকট থাকিয়া দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়া

অলৌকিক লীলাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, সে সময় অপেক্ষা আজ তাঁহার নাম প্রচার হইয়াছে বেশী। আজ আর তাঁহার অনুগত শিষ্যমহলেই তাঁহার নাম সীমাবদ্ধ নাই। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা তো বটেই, পাঞ্জাব, গুজরাট, মাদ্রাজ, এমন কি সুদূর ব্রহ্মদেশে পর্য্যন্ত তাঁহার অলৌকিক লীলাকাহিনীর সহিত নামপ্রচারের সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রধান শিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের শিষ্য যোগেশ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, তিনি যে সময় পাশ্চাত্ত্য দেশে ধর্ম্ম-সম্মিলনীতে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন তখন সেখানেও নাকি কয়েকজন উচ্চপদস্থ অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী বড়বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া কি প্রকার আনন্দানুভব করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিয়াছিলেন।

বড়বাবাজী মহাশয়ের আশ্রিত ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ-মিলিততনু বলিয়া মনে করেন, আবার কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবেশ-অবতার বলিয়াও বলিয়া থাকেন। তাঁহার আশ্রিত ভক্তের নিকট তিনি যাহাই হউন না কেন, তিনি যে একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পরম প্রেমিক আদর্শ বৈষ্ণব ছিলেন এবং কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম জনসমাজে অবিকৃতভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই যে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল এ বিষয় নিঃসন্দেহ। নানাবিধ অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনাবলী পরিপূর্ণ জীবনী 'চরিতসুধা' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

বাল্যকাল হইতে আচার্য্যপাদগণের নিকট শুনিয়া আসিতেছি—

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
এই তিনে নিষ্ঠা হৈলে মিলে কৃষ্ণধন॥"

বড়বাবাজী মহাশয়ের অগণিত ভক্তের মধ্যে আমরা তিনজন ভক্তকে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের আদর্শজনোচিত আচরণ করিতে দেখিয়াছি। একজন সাধু নিত্যানন্দ দাস। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তকে বুকে তুলিয়া লইয়া সেবা করিয়া

জীবে দয়ার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। আর একজন, যাঁর নামস্মরণে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার দর্শনলালসায় ছুটিতেন, সেই প্রেমকণ্ঠ ভক্তশ্রেষ্ঠ রামদাস বাবাজী মহাশয়। যৌবনকাল হইতে অক্লান্ত নিষ্ঠার সহিত দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে নামপ্রচার দ্বারা নামে রুচির আদর্শ দেখাইয়াছেন। আর একজন গুরুগতপ্রাণা সাক্ষাৎ সেবাময়বিগ্রহ আমাদের আলোচ্য এই ললিতা সখী। মানুষ যে সকল গুণের এক-একটি লাভ করিলে জনসমাজে প্রভূত প্রতিষ্ঠা এবং পূজালাভে সমর্থ হয়, সেই সকল গুণের অনেকগুলিতে বিভূষিত হইয়াও সখীবেশ ধারণ করিয়া একাধিকক্রমে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল একই স্থানে একই ভাবে থাকিয়া অকাতরে অবিচারে যথাযথভাবে বৈষ্ণবসেবা করিয়া চিরদিনের জন্য জগতে এক মহান্ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

আজ আমরা এই ললিতাদিদির জীবনী আলোচনা করিতে বসিয়া তাঁহার মহান্ চরিত্রের কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি বর্ণনা করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। ললিতাদিদির নিকট যে জাতীয় ভক্ত যে কোন সন্দেহ লইয়াই উপস্থিত হইয়াছেন তিনিই দিদির সহজ সরল যুক্তিপূর্ণ উপদেশে নিঃসন্দেহ হইয়া ফিরিয়াছেন। এমন বিরাট প্রতিভার অধিকারী হইয়াও কেহ কোনদিন নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিতে তাঁহাকে দেখে নাই। এক কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয়—প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠার লিপ্সা দিদির অন্তর কোনদিনই স্পর্শ করিতে পারে নাই।

প্রমথ তর্কভূষণ ও অর্দ্ধেন্দুবাবু

কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ পণ্ডিত মণ্ডলীকে লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী স্থাপন করেন। আমাকে কিছুদিন সম্মিলনীর গৃহনির্ম্মাণাদি ব্যাপারে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে

হইয়াছিল। সেই সময় মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কথা-প্রসঙ্গে একদিন আমাকে বলিলেন—"দেখ দীনেশ! প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শুনেছিলাম যে, নবদ্বীপ বাগানবাড়ীর ললিতা সখী নাকি তোমারই সহোদর ভাই?"

আমি।—আমরা চার ভাই, ললিতাদিদি আমারই উপরের। আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ। তা ভাই হ'লে কি হবে, তাঁর সঙ্গে কোন সম্বন্ধে জড়িত আছি—এ কথা বলা আমার মত সংসারের কীটানুকীট জীবের কি সাজে?

তর্কভূষণ।—আরে, সে সাজা না-সাজার কোন কথা হচ্ছে না। তোমার সঙ্গে যে তাঁর একটা সম্বন্ধ ছিল এটা তো ঠিক? তা যাই হোক, আমি এবার নবদ্বীপ হরিসভার নিমন্ত্রণে গিয়ে সেখানকার সভার কাজ শেষ ক'রে সখীজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি তো দেখে অবাক্। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! কোনমতেই বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে, একজন পুরুষ-দেহধারী এমনভাবে সখীবেশ ধারণ ক'রে আছেন? চলন, বলন, হাবভাব প্রত্যেকটি একেবারে নিখুঁত।

আমার কোনরূপ পরিচয়ই তাঁকে দি নি, তথাপি তিনি কি অমায়িক ব্যবহার যে আমার সঙ্গে করলেন তা বলবার নয়। আমার লজ্জা হ'তে লাগল।

আমি যখন গিয়েছিলাম তখন তিনি বাগানবাড়ীর স্কুলঘরের নিকট দাঁড়িয়ে কয়েকটি ভক্তের সঙ্গে কথা বলছিলেন। একটি ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—'মা! আমরা তো গৃহস্থ, আমরা কি ভাবে কি করব? আমাদের কর্ত্তব্য কি? একটু বুঝিয়ে বলুন।'

সখীজি একটু হেসে তাকে বললেন—'বাবা! নতুন কথা আমি আর কি তোমাকে বলব! পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ সব কথাই ব'লে গিয়েছেন, একটু খুঁজে দেখে নিতে হবে। তুমি গৃহস্থ ব'লে নিজেকে অযোগ্য মনে করছ কেন? তোমার মতই 'গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি' এই প্রশ্ন একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁর পরম প্রিয় গৃহস্থভক্ত কুলীনগ্রামনিবাসী রামানন্দ বসু জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রভু তদুত্তরে তাঁকে যা বলেছিলেন, বৈষ্ণব কবির দুই ছত্র পয়ারে আমরা তা বিশেষভাবে জানতে পারি।

"প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন।"

ভাই, কথাগুলি আমার এত মিষ্টি লাগল যে, তা ভাষায় প্রকাশ ক'রে বুঝাতে পারব না। সত্য কথা বলতে কি, যদি আমাকে কেউ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত তা হ'লে আমি বোধ হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বচন-প্রমাণ তুলেও এমন সহজ সরলভাবে উত্তর দিতে পারতাম না। এবার আমার নবদ্বীপ যাওয়া সত্য সত্যই সার্থক হয়েছে।"

আন্দুলনিবাসী অর্দ্ধেন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য বি. এ., বি. এল. মহাশয় একদিন কথা-প্রসঙ্গে ঠিক এই ভাবেরই অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তিনি অকপটে তাঁহার প্রথম দর্শনের পর মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমি তখনও কাছারিতে যাওয়া শুরু করি নি, সবেমাত্র কলেজ থেকে বেরিয়েছি। কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলাম। সেখানকার কার্য্য সমাপনান্তে নবদ্বীপে যাই। সেখানে অন্যান্য দর্শনীয় সকল দর্শন ক'রে বাগানবাড়ীতে যাই পূর্ব্বশ্রুত ললিতাসখীকে দেখবার জন্য। তৎপূর্ব্বেই শুনেছি ললিতাসখী নাকি পূর্ব্বাশ্রমে ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত ব'লেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। তবুও কেন যে তিনি স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ ক'রে এভাবে ঘরের মধ্যে বসে আছেন যদি তার কিছু সন্ধান জানতে পারি, আমার ও বন্ধুবর্গের এইটাই সেখানে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য।

যথাসময়ে সকলে মিলে বাগানবাড়ীতে গেলাম। সন্ধান নিয়ে জানলাম তিনি উপরে গিয়েছেন, নামতে আধ ঘণ্টা বিলম্ব হবে। আমরা ইতিমধ্যে বাগানবাড়ীর অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু সকল দেখে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরেই তিনি নীচে নেমে এলেন। সকলের সঙ্গে আমিও একটা প্রণাম করলাম কিন্তু আমরা যে কয়জন গিয়েছিলাম সকলেই তাঁর চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ

তথাপি তিনি আমাদের প্রতিপ্রণাম করলেন। আমাদের বসিয়ে তিনিও বসলেন এবং একে একে আমাদের পরিচয় নিতে লাগলেন। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ দু-একটা প্রশ্নও করলেন, উনি উত্তর দিলেন। শেষে বিদায় নিয়ে চ'লে এলাম। সত্য কথা বলতে কি, আমার ভাল লাগল না বরং বন্ধুগণের সঙ্গে একটু বিপরীত সমালোচনাই করলাম।

কিছুদিন পরে আমাদের এক আত্মীয় ডাক্তারবাবু সখীজির খুব ভক্ত শুনে তাঁর সঙ্গে আর একবার যাই। এবার আন্দুলের আর একটি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আমার সঙ্গে চললেন। এই ডাক্তারবাবুটি যাবার পূর্ব্বে বেছে বেছে কতকগুলি প্রশ্ন লিখে নিয়েছিলেন, সখীজিকে জিজ্ঞাসা করবার জন্য।

আমার আত্মীয় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যাওয়ায় সখীজিকে খুব নিভৃতে পেয়েছিলাম। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার আত্মীয়তার পরিচয় পেয়ে সখীজিও আমাকে খুব সম্মান দিয়ে বসালেন।

কিছু সময় পরে আমার সঙ্গী আন্দুলের ডাক্তারবাবু একটি প্রশ্ন সখীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন। সখীজি এত সহজে ও এমন সুন্দর যুক্তি দ্বারা প্রশ্নটির উত্তর দিলেন যে, আমরা সকলেই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হলাম। তারপর যত আলোচনা হয় ততই তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সাধনলব্ধ অনুভূতির পরিচয় পেতে লাগলাম। তখন আমার মনে মনে পূর্ব্ববারের ধারণার মধ্যে যে কি মারাত্মক ভুল করেছি তা ভেবে এবং বন্ধুগণের সহিত বিপরীত সমালোচনার জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হলাম।"

এই অর্দ্ধেন্দুবাবুই অতঃপর অবসর পাইলেই নবদ্বীপ যাইয়া অন্ততঃ এক বেলাও দিদির সহিত আলাপ না করিয়া আসিতেন না।

নামসঙ্কীর্ত্তন ও রসকীর্ত্তন

ললিতাদিদির ভজন মুদ্রা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা মাদৃশ অযোগ্যের সাধ্যাতীত। আমি বাহ্যিক আলাপ-আলোচনায় যখন যতটুকু পাইয়াছি তাহাই সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম মাত্র। যদি যোগ্য ব্যক্তি কেহ চেষ্টা করিয়া অন্তরঙ্গ ভজন-কথা প্রকাশ করেন তবেই হইবে, আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং অক্ষম।

সখীবেশ গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ-মননে সর্ব্বদা বিভোর থাকিতেন। কিন্তু বাহ্যিক ব্যবহারে কখনও তাঁহার কোনরূপ ত্রুটি কেহ দেখিতে পায় নাই। সমাগত অতিথি, বৈষ্ণবের সম্বর্দ্ধনা, নৈমিত্তিক উৎসব-পর্ব্বের আয়োজন, মঠবাসী সেবকগণের আবশ্যকীয় বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি, এ সব কোন ব্যাপারেই কখনও কোন ত্রুটি হইতে দেখি নাই।

নামসঙ্কীর্ত্তনের কোন প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি কি ভাবে সকলকেই উৎসাহিত করিতেন তাহা যাঁহারা তাঁহার নবদ্বীপবাসকালীন ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন তাঁহারা বিশেষ ভাবেই অবগত আছেন। নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি বলিতেন—

"নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শুধু কীর্ত্তনকারী মনুষ্য নয়, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, এমন কি স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত উপকৃত হয়। আর কীর্ত্তনকারী উহাদের নিকট যে কোন ভাবেই ঋণী থাকুক না কেন, সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হয়।"

উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা বর্ণনে তিনি পরম করুণাময় অযাচিত কৃপাকারী শ্রীগুরুদেবের আদর্শ দেখাইয়া বলিতেন—

"শাস্ত্রযুক্তি বা সিদ্ধান্ত খুঁজিতে দূরে যাইতে হইবে না। সঙ্গীগণ-সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে নাচিয়া গাহিয়া প্রভু আমার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করাইয়া, সর্ব্বসমক্ষে বৃক্ষকে নাচাইয়া, পাষাণ গলাইয়া, দুর্দ্ধর্ষ মদ্যপায়ী লম্পটকে কীর্ত্তনে

গড়াগড়ি দেওয়াইয়া যে আদর্শ তোমাদের দেখাইয়াছেন সেই আদর্শ ধরিয়া চল, সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ হইবে, শুধু নামের শক্তি বা ক্রিয়া লইয়া তর্কযুক্তি দেখাইয়া সমালোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। নাম সর্ব্বশক্তিমান, নাম-নামী অভেদ—এই ধারণা হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া লইয়া নাম কর।"

একটি ভক্ত প্রশ্ন করিলেন—"মা! কোন্ নাম করব ?"

দিদি।—বাবা! যে নামে যার রুচি হয় সে সেই নামই করবে। ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোকের ভিন্ন ভিন্ন নামে নিষ্ঠা দেখেই তো শত শত—সহস্র সহস্র নামের প্রকাশ ক'রে দয়াময় তাঁর দয়ার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার বলেছেন—

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিলা অনেক নামের প্রচার।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবশিক্ষার জন্য দৈন্যভরে নিজ মুখে বলেছেন—

"নাম্নামকারী বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশি তবকৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমিদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ॥"

সকলের রুচি ত এক নয়; তাই ভিন্ন ভিন্ন নামের প্রকাশ হয়েছে। লক্ষ্য স্থির রেখে যার যে নামে রুচি হয় সে সেই নামই করতে পারে।

ভক্ত।—বৈষ্ণবেরা না হয় হরিনাম করল, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ী শাক্ত, শৈব, সৌর বা গাণপত্য এঁরা কি নাম করবে ?

দিদি।—শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শুনেছি—"হৃ"ধাতুর উত্তর "কি" প্রত্যয় ক'রে হরি শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। "হৃ"—হরণে। "হৃ" ধাতুর অর্থ হরণ; যিনি আমাদের চিত্ত হরণ করেন তিনিই হরি। এই অর্থ ধরলে শাক্তগণ হরি শব্দে কালীকে, শৈবগণ শিবকে, সৌরগণ সূর্য্যকে এবং গাণপত্যগণ গণপতিকেই বুঝবেন। কাজেই যিনি যাঁর উপাসক, তিনিই তাঁর হরি। সুতরাং তাঁর

নামকীর্ত্তনই তাঁর অবশ্যকর্ত্তব্য। তবে যুগোচিত তারকব্রহ্ম নাম গ্রহণে কোন সম্প্রদায়েরই আপত্তির কারণ নেই। শাক্ত শৈব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই কলিযুগোচিত—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই নাম করতে পারেন। এতে কারও আপত্তি উঠলে বুঝতে হবে তাঁর তুর্দ্দৈব এখনও যায় নি।

ভক্ত।—নামসঙ্কীর্ত্তনে কি হয়?

দিদি।—নামসঙ্কীর্ত্তনে কি হয়—এ প্রশ্ন তোমার ঠিক হয় নি, কি হয় না বল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনের মহিমা বলছেন—

"চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে প্রভু বলেছেন—

"হরি শব্দের বহু অর্থ তুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন॥"

সোজা কথায় জেনে রাখ—নামসঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্ববিধ অমঙ্গল দূর হয়, ভবব্যাধি বিনাশ হয়, এমন কি বহু কৃচ্ছ্র সাধনায়ও যা লাভ হয় না সেই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধন লাভে জীব ধন্য হয়। জীবকে মায়াবন্ধন হ'তে মুক্ত ক'রে ভগবৎ-সেবানন্দ-সুখে মগ্ন করতে নাম ভিন্ন আর কে আছেন?

ভক্ত।—এই সঙ্কীর্ত্তন বলতে লীলাকীর্ত্তনকেও বুঝায় তো?

দিদি।—কীর্ত্তন তুই প্রকার, নামকীর্ত্তন ও লীলাকীর্ত্তন।

ভক্ত।—এ তু'য়ে প্রভেদ কি?

দিদি।—(সহাস্যে) তোমাদের রামদাদাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না কেন?

ভক্ত।—আজ্ঞে তিনি বলেন—"আমাকে খোল করতাল এবং 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই নাম দিয়ে ব'লে দিয়েছেন, ওতেই সব আছে—বিশ্বাস রাখিস, সব পাবি। আমি আর কিছু জানি না।"

দিদি ভক্তটির অকপট ভাব এবং এই সব জানিবার ও বুঝিবার আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"বাবাজী যা বলেছেন খাঁটি কথা। তবে তুমি যেভাবে বুঝতে চাইছ, সেভাবে আলোচনা করতে হ'লে, একটু সময়ের দরকার। আর আমি সে ভাবের আলোচনার যোগ্যাও নয়। তবু তোমার আগ্রহ মেটাতে সংক্ষেপে কিছু বলি।

সাধারণতঃ সঙ্কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তন এই দুটি কথা ব্যবহৃত হয়। সঙ্কীর্ত্তন বলতে নামকীর্ত্তন আর শুধু কীর্ত্তন বলতে রসকীর্ত্তন বা লীলাকীর্ত্তনকেই বুঝায়। প্রাচীন মহাজনগণের পদাবলী অবলম্বনে শ্রীবৃন্দাবনের লীলা বিষয়ক পালা-কীর্ত্তনকেই রসকীর্ত্তন বলে।

নীলাচলধামে গম্ভীরায় অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছিলেন—

"বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নামসঙ্কীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন॥"

দশে পাঁচে মিলে কাতরভাবে তাঁর নিকট কৃপা প্রার্থনা ক'রে যে শরণাগতির ভাব এইটিকে নামসঙ্কীর্ত্তন পর্য্যায়ে ধ'রে নিতে পার। এতে সকলের সমান অধিকার। আর যাকে রসকীর্ত্তন বা লীলাকীর্ত্তন বল তা কীর্ত্তনের বা শ্রবণের অধিকারী সকলে নয়। কেন নয় তাই বলছি।

রসের একটা মূর্ত্তি আছে, কীর্ত্তন-গানেরও একটা প্রাণ আছে। রসস্ফূর্ত্তির যে ক্রমিক ধারা অর্থাৎ সুরবিন্যাস বা পর্য্যায় তা অস্বীকার করলে চলবে না। উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতময় মূর্ত্তি। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই তিনটি ব্রজের রস। প্রত্যেক রসটি প্রকৃষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে বিভিন্ন পদকর্ত্তার শরণ নিতে হয়। বৈষ্ণবের ধ্যান বলিতে বুঝায় শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা ও সেবা প্রভৃতির

সম্যক পরিচিন্তন। "ধ্যানং—রূপ-গুণ-ক্রীড়া-সেবাদেঃ সুষ্ঠুচিন্তনম্।" কীর্ত্তন এ বিষয় একান্ত সহায়কারী। কিন্তু তা না ক'রে কেবলমাত্র নানাপ্রকার সুরের কসরৎ দেখিয়ে জিনিসটাকে কালোয়াতী ধরণে পরিবেশন করলে সুখ হবে না।

ভক্তের প্রাণের উচ্ছ্বাস পদাবলীরূপে প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে প্রাণ নেই, কেবল ওস্তাদি সেখানে কীর্ত্তন খুলবে না। যখন যে পদটি গান হবে তখন কীর্ত্তনীয়াকে সেইভাবে ভাবিত হ'তে হবে, তবেই কীর্ত্তন করা সার্থক হবে। সুর তাল কীর্ত্তনের বহিরাবরণ। লীলানুযায়ীভাবে চিত্তকে অনুপ্রাণিত ক'রে পদবর্ণিত ভাব প্রাণে অনুভব ক'রে প্রাণের কান্নাটিকে বাইরে টেনে গাওয়াটাই যথার্থ কীর্ত্তনাঙ্গ গান বা পদাবলী-কীর্ত্তন।

কীর্ত্তনীয়ার মত শ্রোতাকেও উপযুক্ত হ'য়ে রসকীর্ত্তন শুনতে হয়। শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে আপনাকে নিত্যলীলার কোনও সখীর অনুগতা একটি গোপবালিকা ব'লে ধারণা ক'রে নিয়ে তাঁর পশ্চাতে থেকে যে রস-লীলা কীর্ত্তন হচ্ছে তদুচিত পদের রসাস্বাদ করতে হবে। এর নামই প্রকৃত রসকীর্ত্তন বা লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ।

সাধনার অপরিহার্য্য এবং অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ কীর্ত্তন হ'লেও নাম-সঙ্কীর্ত্তন যেমন সর্ব্বাবস্থায় সকলের পক্ষে উপযোগী, রসকীর্ত্তন সেরূপ নয়। যিনি অন্তরঙ্গ সাধক তাঁর পক্ষে উত্তম ফললাভ হ'লেও অন্যের নিকট অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত ফল ফলতে দেখা যায়। যাত্রা শোনা বা অভিনয় দেখার মত বহিরঙ্গ বিষয় লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ নয়।

রসকীর্ত্তন-গায়ক ও শ্রোতা উভয়ে যদি এইভাবে পরস্পর সমভাবাপন্ন হয় তবেই কীর্ত্তন করা বা শোনা সার্থক। সখীর আনুগত্যে তৎতৎলীলাদর্শন ও আস্বাদন না হ'লে প্রেমময় প্রেমময়ীর নিত্য প্রেমলীলার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত জগতের কামলীলারই ভোগ হয়ে থাকে। কাম ও প্রেমে কত তফাৎ তা জান তো?

ভক্ত।—পণ্ডিত মশাইদের কাছে পাঠ বক্তৃতা শুনবার সময় কিছু কিছু

শুনেছি, কিন্তু তত্ত্ব কিছুই বুঝি নি। যদি অসুবিধা না হয় তবে আপনি দয়া ক'রে একটু বলুন না মা!

দিদি।—'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'কার বলেছেন—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য প্রেম মহাবল॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"

যাতে আত্মসুখের ইচ্ছা থাকে তাকেই বলে কাম। আর যা আত্ম-সুখাভিসন্ধিরহিত এবং কেবল কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসিত তাই প্রেম। কাম প্রাকৃত, প্রেম অপ্রাকৃত। কাম ঘোর অন্ধকার আর প্রেম সুনির্ম্মল চন্দ্রালোক। কাম অসপত্ন্য, প্রেম বহুজন-লিপ্সু।

প্রেম অপ্রাকৃত ধামের; প্রাকৃত জগতে প্রেম নেই। কোন না কোন প্রকারে স্বার্থের পুতিগন্ধ প্রাকৃত জগতের সকল কাজেই পাওয়া যায়। একেবারে নিঃস্বার্থভাবে তাঁর প্রীতির উদ্দেশে যে কার্য্য তাকেই প্রেম বলা হয়। গোপীগণ নিজ নিজ দেহের পরিচর্য্যা ক'রে উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণ-সন্নিধানে উপস্থিত হতেন। ঐ বেশভূষা কি নিজের ভোগের জন্যে? কখনই না। সন্দর্শনে কৃষ্ণ সুখী হবেন এইই তাঁদের মনোভাব। তাই না শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কার বলেছেন—

"আত্ম সুখ দুঃখ গোপী না করে বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥

*　　*　　*

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহ ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥

এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ সাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করেন অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥"

গোপীগণের এই ভাব লক্ষ্য করেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলেছেন। যথা, লঘুভাগবতামৃতে—

"নিজাঙ্গ মাপি যা গোপ্যা মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ় প্রেমভাজনম্॥"

অর্থাৎ গোপীগণ নিজ অঙ্গকেও আমার ভোগ্য ব'লে যত্ন করে। তাই বলি, হে অর্জ্জুন! এই গোপীগণ হ'তে আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেউই নেই। শ্রীচরিতামৃতকার পুনরায় বলেছেন—

"কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী রূপগুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে॥"

বাবা! দিবারাত্র সমানভাবে আলোচনা করলেও এ সব তত্ত্বের অন্ত পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণায় যেটুকু স্ফূর্ত্তি হ'ল, তোমাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে ধন্য হলাম। সকলে আমাকে কৃপা কর আর তোমরাও নিয়মিতভাবে নামাশ্রয় ক'রে ধন্য হও।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিশেষ প্রয়োজনে দিদি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আমরাও আজিকার আলোচনা এইখানেই শেষ হইল মনে করিয়া দণ্ডবতান্তে যে যাহার প্রয়োজনে চলিয়া গেলাম।

ঘরে গিয়া দেখি, আমাদের শ্রদ্ধেয় অবধূত পাগলা দাদা গান করিতেছেন—

"প্রেম কথাটি শুনতে ভাল
যদি না ছোঁয় মদনে।

কাম থাকিতে প্রেম হবে না
ব্রজগোপীর ভাব বিনে ॥
গুরু অনুগত যারা
তারা জানে মানুষ ধরা
গুরুপ্রেমে যারা ভোরা
পলক নাই তাদের নয়নে ॥
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তাদের পীরিত সত্য মানি
এক মরণে দু'জন মরে
এমন মরে ক'জনে ॥" ইত্যাদি।

বিদ্যারত্নের গর্ব্ব খর্ব্ব

আমার এক পণ্ডিত বন্ধু পূর্ব্ব হইতে পত্র লিখিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমাকে লইয়া একবার পূজার ছুটিতে শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইবেন। ১৩৪২ সালে দুর্গাপূজার ছুটি হইলে তিনি আসিয়া আমার মাসিলার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আমি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি মত কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ষষ্ঠীর দিন ভোরেই নবদ্বীপ যাত্রা করিলাম।

বন্ধুবর একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক। কাহারও ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাইতে চান না, অন্য খাবার বিষয়ে তো কথাই নাই। তবে আমার সঙ্গে যাইতেছেন, বিশ্বাস আছে আমি তাঁহার যাহাতে নিয়মভঙ্গ না হয় সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিবই। যথাসময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অবসরমত জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভাই! নবদ্বীপে তো যাচ্ছ, তোমার আহারাদির ব্যবস্থা কি ভাবে করা হবে?"

বন্ধু।—তোমার কি রকম ব্যবস্থা?

আমি।—আমি বাগানবাড়ীতে থাকি, সেইখানেই ঠাকুরের প্রসাদ পাই।

বন্ধু।—সেখানে কি ব্রাহ্মণেই পাক করে?

আমি।—ভাই! সে খবর আমি ঠিকমত তোমাকে বলতে পারব না। তবে ঠাকুরের ভোগ হয় এবং ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, এমন কি গোস্বামী-সন্তান যাঁরাই সেখানে উপস্থিত থাকেন সকলেই প্রসাদ পান দেখি। তাই আমিও আর কোন আপত্তি করি না।

বন্ধু।—তোমার দাদাই তো মঠের মালিক, তিনি তোমার সম্বন্ধে কোন পৃথক ব্যবস্থা করেন না?

আমি।—ভাই! সে অনেক কথা। প্রথম যখন মঠে গিয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনাকে সিধা দেওয়া হবে, না মঠেই প্রসাদ পাবেন?' আমি একটু হেসে বলেছিলাম—বাঁকা পথে চ'লে চ'লে শ্রান্ত হয়েই তো এখানে এসেছি, যাতে একটু সিধে হ'তে পারি তার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, আমি অতশত বুঝি না। তিনি 'জয় গুরু, জয় গুরু' ব'লে হাসতে হাসতে মঠের লোককে বলে দিলেন—'এঁরা মঠেই প্রসাদ পাবেন।' সেই থেকে যখনই নবদ্বীপে যাই ঐ মঠেই থাকি এবং ঐখানেই ঠাকুরের প্রসাদ পাই।

বন্ধু।—ঠাকুরের প্রসাদের উপর তো কোন কথাই নেই, তবে কি জান ভাই! বহু দিনের সংস্কার কি-না তাই কেমন যেন মনটা খুঁতখুঁত ক'রে। আচ্ছা, চল তো, তারপর 'ক্ষেত্র কর্ম্ম বিধিয়তে' যা হয় হবে। অসুবিধা দেখি, না হয় দু-তিন দিন জলটল খেয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

এই ভাবের প্রসঙ্গ হইতে হইতে নবদ্বীপ স্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। আমরা নামিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া যথাসময়ে বাগানবাড়ী আসিয়া পৌছিলাম।

দিদি সে সময় বকুলতলায় দাঁড়াইয়া কয়েকজন মাড়োয়ারী ভক্তের সহিত কথা বলিতেছিলেন। আমরা প্রণাম করিলে তিনিও তাঁহার পূর্ব্ব স্বভাবমত প্রণাম করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। সংক্ষেপে আমাদের আগমনের

কারণ বলিলাম। তাহাতে তিনি পূজার কয়দিন মঠে থাকিবার অনুরোধ জানাইয়া একজন ভক্তকে ডাকিয়া স্কুলবাড়ীর উপরের ঘরে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন। আজ যেন দিদিকে অন্যদিন অপেক্ষা একটু ব্যস্তই দেখিলাম।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখানেও আবার বলি—বাগানবাড়ীতে সমস্ত পূজা-পার্ব্বণই যথাযথভাবে হইয়া থাকে। দুর্গাপূজা যদিও ঘটস্থাপনা করিয়া চিত্রপটে হয়, কিন্তু ব্যবস্থা সমস্তই প্রতিমাপূজার ন্যায়ই হইয়া থাকে। আজ ষষ্ঠী, সন্ধ্যায় বোধন অধিবাস হইবে। তাই দিদি সেই সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছেন।

আমরা নির্দ্দিষ্ট ঘরে জিনিসপত্র রাখিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলাম। বন্ধুবর গঙ্গার ঘাটে বসিয়াই তাঁহার সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া লইলেন। আমি মঠে আসিয়া নিজকৃত্য করিতে বসিলাম।

তিলক সেবা করিয়া বসিয়া নাম করিতেছি, এমন সময় দিদি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার সঙ্গে যিনি এসেছেন তিনি মঠেই প্রসাদ পাবেন তো ?" আমি বন্ধুবরের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"কি গো বিদ্যারত্ন ভায়া ! কি করবে বল না ?" বন্ধুবর দিদির দিকে চাহিয়া কি যেন বলিতে যাইয়াও বলিতে পারিতেছেন না, এইভাবে হ্যাঁ-না-তা-হঁ্যা ইত্যাদি একাক্ষরীয় অস্ফুট বাক্যদ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া দিদি বলিলেন—"আমি গোয়ালিনী, আমি ভোগের দ্রব্য স্পর্শ করি না। নারায়ণের ভোগ ব্রাহ্মণেই প্রস্তুত করেন। তারপর আজ রাত্র থেকে যোগমায়া দেবীর জন্য যে বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা হয়েছে তাও ব্রাহ্মণেই প্রস্তুত করবেন।

বন্ধু।—আর বলতে হবে না, আমি সকলের সঙ্গে মঠেই প্রসাদ পাব।

দিদি।—জয় গুরু ! আমি শেষে অপরাধী না হই এই জন্যই জিজ্ঞেস করা। জানেন তো আশী বছর না হ'লে গয়লার বুদ্ধি হয় না ?"

এই বলিয়াই দিদি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

বন্ধুবর কেমন যেন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ভাই! তোমার দাদাই তো সখীবেশ ধরেছেন, তবে নিজেকে গয়লা বলছেন কেন?

আমি।—ভাই! ওসব তত্ত্ব আমি গুছিয়ে বলতে পারব না, তুমি সময়-মত ওঁকেই জিজ্ঞেস ক'রো; উনিই বলবেন।

বন্ধু।—শুনেছি উনি খুব পণ্ডিত, কোন শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞেস করলে যথাযথ তার জবাব দেবেন তো?

আমি।—সে ওঁর ইচ্ছে। উনি বলেন—আমি গোয়ালা, তাতে স্ত্রীজাতি, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আমি কি জানি?

বন্ধু।—তুমি যে অবাক্ ক'রে দিলে ভাই, নিজের বিষয় এমন ক'রে কি কেউ ভুলতে পারে?

আমি।—ভাই! ভুলতে না পারলে এভাবে থাকাও সম্ভব নয়। তোমাকে বলতে কি, এখানে আরও দু-চার জন ঐ ভাবে ছিলেন; কিন্তু শেষরক্ষা করতে না পেরে ফিরে ঘরে গিয়েছেন। দিন কয়েক এঁদের কাছে থাক, দেখ, বোঝ বৈষ্ণব বাবাজীদের ভেতর কি আছে না আছে।

এইভাবে কিছু সময় বন্ধুর সহিত কথা হইতে হইতেই প্রসাদ পাইতে যাইবার জন্য আহ্বান আসিল। আমরা দুইজনে পাশাপাশি দিদির ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ পাইতেছি আর দিদি রকের নীচে দাঁড়াইয়া এটা দাও, ওটা দাও বলিয়া দিতেছিলেন।

বন্ধু।—আপনি উপরে উঠে বসুন না?

দিদি।—কি সর্ব্বনাশ, আমি ওখানে উঠে বসতে পারি কি? একে নীচ জাতি, তাতে অনাচারী। আপনারা উচ্চবংশসম্ভূত সদাচারী নিষ্ঠাবান; আমার ছায়া স্পর্শ করলেও যে আপনাদের স্নান করতে হবে।

বন্ধু।—আর কেন লজ্জা দিচ্ছেন?

দিদি—এতে আর লজ্জা দেওয়া কি? আপনারা যে কৃপা ক'রে এখানে

কিছু গ্রহণ করেন সেইই যথেষ্ট। একে তো ন্যাড়া বাবাজীদের মঠ, তাতে আবার যদি অনাচারী লোকের সংস্পর্শ হয় তবে কি আর রক্ষে আছে ?

আমি।—বন্ধু! কথায় পারবে না, চুপচাপ প্রসাদ পেয়ে নাও, যদি কিছু বলবার থাকে অন্য সময় স্থির হ'য়ে ব'সে ব'লো। এটা জেনে রাখ, উনি যা করবেন মনে করেন তা করবেনই।

এ সময় আর বিশেষ কোন কথা হইল না। আমরা প্রসাদ পাইয়া একটু বিশ্রাম করিবার জন্য আমাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে চলিয়া আসিলাম।

বৈকালে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া নীচে আসিয়াই দেখি, নাটমন্দিরে পাঠের আসন হইয়াছে। ৺কাশীধামের কে একজন বড় পণ্ডিত আসিয়াছেন। তাঁহার পাঠ হইল আমরাও বসিয়া শুনিলাম।

পাঠ অন্তে দিদির সহিত দেখা করিতে যাইয়া দেখি, বারান্দায় সৌরীনবাবু, হাজারীবাবু, রামবাবু প্রভৃতি কয়েকজন বাছা বাছা ভক্ত লইয়া দিদি লীলাকথা আলোচনা করিতেছেন। আমরাও এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম।

দিদি।—গুণের আদর তো সর্ব্বত্রই আছে। স্ত্রী বা পুরুষ, বয়ঃজ্যেষ্ঠ বা বয়ঃকনিষ্ঠ, ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণেতর জাতি, যে-ই গুণী সে-ই আদর পায়। সীতাদেবীর গুণ বর্ণনা করতে করতে অরুন্ধতী যে কথা বলেছিলেন, মহাভারতে আমরা তা দেখতে পাই—

"শিশুত্বং স্ত্রৈণং বা ভবতুনন্থ বন্দ্যাসি জগতাম্।
গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ ॥"

ধ্রুব প্রহ্লাদ শিশু, ভীষ্ম ক্ষত্রিয়; ধর্ম্মব্যাধ ব্যাধজাতি হ'লেও তাঁরা কি ব্রাহ্মণের পূজ্য নন? সীতা, সাবিত্রী স্ত্রীজাতি তথাপি জগৎপূজ্যা।

রামবাবু।—দিদি! শাস্ত্র তো অনেক কিছুই বলেছেন। সজ্জনগণ আচরণ ক'রেও অনেক কিছু দেখিয়েছেন, এখনও দেখাচ্ছেন, কিন্তু আমরা তো যে তিমিরে সেই তিমিরেই প'ড়ে আছি। আমাদের ভাগ্যে কিছু লাভ হয় না

কেন ? আর তাঁরা কৃপা ক'রে দর্শনাদি দিলেও আমরা তাঁদের আচরণ বা উপদেশ গ্রহণ করতে পারি না কেন ? বরং বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রে নানা প্রকার নিন্দাবাদই ক'রে থাকি, এর কারণ কি ?

দিদি।—ডাক্তারবাবু! সৎসঙ্গ লাভ সত্যই দুর্লভ। তারপর কিছু সুকৃতি না থাকলে সঙ্গ পেয়েও বিশেষ কিছু হয় না।

"সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ কথমপিহি পুণ্যেন ভবতি।"

সেদিন কলকাতা থেকে একজন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত এসেছিলেন, তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন 'অবদানকল্পলতা'য় বর্ণিত বৌদ্ধকবি ক্ষেমেন্দ্রপাদের একটি শ্লোক—

"স্মরণং শ্রবণং বাপি দর্শনং বা মহাত্মনাম্।
সেয়ং কুশল বল্লীনাং মহতী ফল সন্ততিঃ॥"

সকল সম্প্রদায়ই সৎসঙ্গের মহতি ফলের কথা বলেছেন। কাজেই একটু যদি স্থিরভাবে চিন্তা ক'রে দেখেন তা হ'লে আপনার সমস্ত প্রশ্নেরই মূলে ঐ সাধুসঙ্গের অভাব বশতঃই যে অনর্থ ঘটছে, তা বেশ উপলব্ধি হবে। সাধুসঙ্গ করতে গিয়ে শুধু বাইরের হুজুগ নিয়ে মাতামাতি করলে চলবে না।"

অনেক দিন দিদির কাছে অনেক কথা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। কিন্তু আজ দিদির কথাগুলি যেমন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তেমনই শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা সমর্থিত। শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল, যেন কোন অধ্যাপক শ্রোতৃমণ্ডলীকে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শুনাইতেছেন। আরও মনে হইয়াছিল, আমার বন্ধুবর বিদ্যারত্ন মহাশয় পণ্ডিতাভিমানী ; আজ তাঁহার সম্মুখে এই ভাবের আরও যদি কিছু শাস্ত্রসিদ্ধান্ত দিদি বলেন, তাহা হইলে বন্ধুবরের গর্ব্ব কিছু খর্ব্ব হয়। এই ভাবের চিন্তা আমার মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন ভক্ত দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই যে প্রতিমাপূজা, এটা কি ভাবপ্রবণতা বা অন্ধবিশ্বাসের ফলে প্রচলন হয়েছে ? এর মূলে কি কোন কল্পনাপ্রসূত ভাব আছে ?"

দিদি।—বলেন কি ? আর্য্যঋষিগণ কখনও অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে বা

ভাবাবেগে কিছু করেন নি। শাস্ত্রীয় বেদবিধি অনুসারে মৃণ্ময়ী, প্রস্তরময়ী, দারুময়ী বা ধাতুময়ী মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা চক্ষুদানাদি ক'রে দেবদেবীর আবির্ভাবের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ক'রে নিয়ে, এক কথায় প্রতিমাকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠা ক'রে তবে তাঁর আরাধনা বা উপাসনা করবার ব্যবস্থা দিয়েছেন এবং নিজেরাও তাঁর আরাধনা ক'রে অভীষ্ট ফল লাভ করেছেন। তারপর কোন মূর্ত্তিই যে কল্পনাপ্রসূত নয়, এ কথাও বিশ্বাস করুন। অধ্যাত্মবিদ্যাসম্পন্ন তত্ত্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আপন আপন সাধনলব্ধ যোগবলে দিব্যচক্ষুর সাহায্যে (বর্ত্তমান যুগের রঞ্জন রশ্মির আলোকে দেখার ন্যায়) যা দেখতে পেয়েছিলেন তাই প্রচার করেছেন এবং ভবিষ্যৎবংশধরগণের জন্য লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছেন।

আপনারা পণ্ডিত, আপনাদের কাছে কোন শাস্ত্রের প্রমাণ তুলে দেখিয়ে বাহাদুরি নিতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। তবে যখন প্রসঙ্গ উঠেছে এবং প্রসঙ্গটি বর্ত্তমান সময়োপযোগী ব'লে মনে হচ্ছে তখন এ সম্বন্ধে প্রাণের দুটো কথা অকপটে আপনাদের কাছে নিবেদন করি। যে স্থলে অশাস্ত্রীয় বা অযৌক্তিক ব'লে মনে হবে দয়া ক'রে সংশোধন ক'রে দেবেন।

বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা—এই কয়টি ধর্ম্মপথের প্রধান সম্বল ব'লে শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে বহুবার শুনেছি। আর এ কথাও তিনি বলতেন যে, অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞানলাভে শাস্ত্রজ্ঞানই চক্ষুস্বরূপ। অবিশ্বাসী বা নাস্তিকজনের কোন সাধনাতেই অধিকার নেই। শ্রীভগবান প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করে জীবগণকে উপদেশদানচ্ছলে বলেছেন—"ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।" আবার অন্যত্র বলেছেন "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" আবার এক স্থানে অধিকারী নির্ণয় করতে গিয়ে বললেন—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" এ সব কি মিথ্যা ?

পণ্ডিত।—অনেকে যে বলেন বাঙালী জাতি অনুকরণপ্রিয় এবং ভাবপ্রবণ, এ কথা কি সত্য ?

দিদি।—অনেকে বলেন বলবেন না; দু-একজন তথাকথিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী বাবুরা বলেন বলুন। কিন্তু যাঁরা বলেন তাঁদের বেশভূষা,

চালচলন, হাবভাবে কি অনুকরণপ্রিয়তা প্রকাশ পায় না? অপরের দোষ দেখাতে হ'লে নিজেকে দোষশূন্য হতে হয়। ভাবের প্রাবল্যে কোথাও কোথাও কখন কখন কর্ম্মশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি কিছু কিছু যে দেখা যায় না তা নয়। কিন্তু তাতেই যে একটা জাতি ভাবপ্রবণ ব'লে নিন্দনীয় হবে এমন কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। ভাবাবেগ যে কিছু নয়, সর্ব্বক্ষেত্রে এ কথাও বলা চলে না। পণ্ডিতজি! বিচার করতে হ'লে সব দিক ভেবেচিন্তে বিচার করতে হয়।

পণ্ডিত।—আচ্ছা, কোন জন-হিতকর কার্য্য করতে গেলে, অনেকে তাতে বাধা দেয়। তাতে কি সে কার্য্য হ'তে বিরত হ'তে হবে?

দিদি।—কাজটি জন-হিতকর হ'লেও যাঁরা বাধা দেন বুঝতে হবে কোন না কোন প্রকারে তাতে তাঁদের স্বার্থে আঘাত লাগছে। তবে দু-চার জনের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বহুর কল্যাণসাধনে নিবৃত্ত হওয়া সমীচীন নয়। তারপর আর একটা মস্ত বড় কথা—আত্মত্যাগের আদর্শই শুধু প্রয়োজন নয়, স্বার্থত্যাগের আদর্শও প্রয়োজন। জনকল্যাণকর কার্য্যে বাধাপ্রদানকারী নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সঙ্গত অসঙ্গত নানা প্রকার কৌশলই অবলম্বন ক'রে থাকে, তাদের সঙ্গে কলহ ক'রে অসন্তোষ সৃষ্টি না ক'রে ধীরভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মত পরিবর্ত্তন করিয়ে দিতে হবে। তা নইলে বিপ্লব উপস্থিত হয়ে সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

এই সময় নাটমন্দিরে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া দিদি দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়া গেলেন। আমরাও দিদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ কীর্ত্তন শুনিতে গমন করিলাম। বন্ধুবর বিদ্যারত্ন ভায়া যাইতে যাইতে আমাকে বলিলেন—"ভাই, আজ আমার সুপ্রভাত, সত্য সত্যই আমার কতকগুলি পুঞ্জীভূত সন্দেহ আজ দূর হ'ল। প্রথম তোমার দাদাকে দেখে যা ভেবেছিলাম এই সামান্য ক্ষণের আলোচনায় আমার সে ভ্রান্ত ধারণা দূর হ'ল। তোমাকে বলতে কি, এখন আমার মনে হচ্ছে যে, তোমার দাদার কাছে থেকে সর্ব্বক্ষণ এই সব আলোচনা শুনি।"

আমি।—তা থাক না ভাই, এঁরা তাতে সন্তুষ্ট ছাড়া অসন্তুষ্ট হবেন না।

বিদ্যারত্ব ভায়া কি যেন বলিতে চাহিলেন কিন্তু সেই সময় হঠাৎ পা পিছলিয়া পড়িয়া গেলেন। আমরা দুই-তিনজনে ধরিয়া তুলিয়া তাঁহাকে ঘরে লইয়া গেলাম। আর তাঁহারও বলা হইল না, আমাদেরও শোনা হইল না।

পরমহংসদেব সম্বন্ধে দিদির উক্তি

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যা গৌরীপুরী দেবী। তাঁহার প্রধানা শিষ্যা ব্রহ্মচারিণী দুর্গাপুরী দেবী। ইনি আমাদের ললিতাদিদির সহিত গৃহত্যাগের পর সখীবেশ ধারণের পূর্ব্বে কিছুদিন একসঙ্গে ছিলেন। দুর্গাপুরী দেবী শ্রীধাম নবদ্বীপ বাগানবাড়ীতে যাইয়াও দিদির সহিত নানা প্রকার লীলাতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন।

একবার অধম লেখক দুর্গাপুরী দেবীর আহ্বানে নবদ্বীপে তাঁহাদের এক উৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিল। সেই সময় দুর্গাপুরী দেবী ললিতাদিদির সহিত দেখা করিয়া কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"দূর থেকে লোকের মুখে যা শোনা যায়, কাছে এসে চোখে দেখে মিলিয়ে নিতে গেলে আকাশ পাতাল তফাৎ হয়।"

দিদি।—কেন একথা বলছ দিদি!

দুর্গাপুরী।—তোমার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের কথা শুনে, মনে মনে এক রকমের ধারণা করেছিলুম। কিন্তু কাছে এসে তোমাকে দেখে এবং তোমার আচরণ ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গী দেখে আমার সে ধারণা আর ধ'রে রাখতে পারলুম না। সত্যি বলতে কি, শুনেছিলুম যা, দেখলুম তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

দিদি।—জয় গুরু জয় গুরু। দিদি! আশীর্ব্বাদ কর যেন তাঁর আদেশমত ঠিক ঠিক পথে চলতে পারি।

দুর্গাপুরী।—ঠাকুরের জীবনী আলোচনা ক'রে জানতে পারি, তিনি নাকি কোন সময় তোতাপুরীর কাছে নির্ব্বিকল্প সমাধি বিষয়ে শিক্ষা করেছিলেন। ঠাকুরের সাধনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে ঐ তোতাপুরী মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন—'আমি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কঠোর সাধনা ক'রে যা পেয়েছি, তুমি মাত্র তিন দিনের সাধনায়ই তা লাভ করলে।' উত্তরে ঠাকুর 'মা' 'মা' ব'লে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন—'মা! এ আবার কি করলি? কোথেকে একটা বোঝা এনে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার মহিমা দেখিয়ে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা ঢালতে লাগলি; আমার এ সব কিছু দরকার নেই—মা! কিছু দরকার নেই। শুধু তুই আমার মা আর আমি তোর ছেলে এইটে যেন মনে প্রাণে ঠিক রাখতে পারি দয়া ক'রে এই করিস মা।

দিদি।—আমারও দিদি, তোমাদের কাছে এই প্রার্থনা, এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তাঁর সেবা, তাঁর সুখ-সম্পাদন, অবিচারে তাঁর আদেশ পালন করাকে জীবনের ব্রত ক'রে নিতে পারি। সুখদুঃখ কিছুতেই যেন ব্রত ভঙ্গ না হয়।

দুর্গাপুরী।—পারি কি গো, তুমি তো ডঙ্কা মেরে সব শঙ্কা কাটিয়ে ঘুঁটি পাকিয়ে নিয়েছ। তোমার আর ভাবনা কি!

অতঃপর উভয়ে নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া কিছু সময় আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও তাহার কোন কথাই দিদির নিকট হইতে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পুনঃ পনঃ জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করায় বলিয়াছিলেন—

"আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা
আপনারে হবে সাবধান।"

আমি ইহার পর আর কোনদিন এ সম্বন্ধে জানিতে চাহি নাই।

বাংলা ১৩৫১ সালের বৈশাখ মাসে কিছুদিন পুরীতে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। পূজনীয় রামদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপাদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর

লীলাসহচর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চরিত্র নাটকাকারে লিখিতে আরম্ভ করিয়া। সেখানে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে সেই সময়কার মহান্ত গোপীদাস বাবাজীর নিকট শুনিয়াছিলাম, ললিতাদিদির নিকটে থাকিবার সময় তিনি নাকি প্রসঙ্গক্রমে একদিন বলিয়াছিলেন—

"গোপী! পরমহংসদেবের জীবনী আলোচনা করবে, অনেক কিছু জানতে পারবে, তাঁর মুখে ঘন ঘন 'মা মা' ধ্বনি শুনে, ব্যাকুল প্রাণের অকপট প্রার্থনায় ভাববিহ্বল স্বরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' 'গোবিন্দ গোবিন্দ' ধ্বনি শুনে শুনেছি কেউ কেউ নাকি তাঁকে উপহাস করতেন, পরমহংসদেব তাঁদের শ্লেষপূর্ণ উক্তি শুনে নাকি বলেছিলেন—'আরে আমি মায়ের নাম করছি আর তোরা ও সব কি বলছিস? আচ্ছা দাঁড়া, আজ আমি মাকে সব ব'লে দেব।'

তোতাপুরীও এক সময় এই ভাবে বিদ্রূপের সূক্ষ্ম হাসি হেসে পরমহংসদেবকে অনেক কিছু বলেছিলেন। পরমহংসদেব তাঁকে বলেছিলেন—'সময় হ'লে মা তোমাকে এ সব তত্ত্ব ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দেবেন।' তাতেও তোতাপুরী নিবৃত্ত না হয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসে বলছিলেন—'ঐ যে তুমি 'মা মা' করছ ও তোমার মা নয় গো, মায়া-মায়া। বৈদান্তিকের কাছে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা, বুঝলে?'

পরমহংসদেব তোতাপুরীকে ন্যাংটা ব'লে ডাকতেন। তাঁর এই সব শুষ্ক ব্রহ্মভাবের কথা শুনে বললেন—'হ্যাঁ ব্রহ্মই সত্য, কিন্তু তুমি দেখ নি ন্যাংটা! আমি দেখেছি তোমার ঐ ব্রহ্মই পঞ্চভূতের ফাঁদে প'ড়ে কেঁদে সারা হয়। চোখ বুজে মনকে যতই বোঝাও না কেন—কাঁটা নেই, কিন্তু যেমনি প্যাট ক'রে পায়ে ফুটল অমনি উহুঁ-হুঁ ক'রে উঠলে। দিন রাত তুমি মনকে বোঝাচ্ছ, তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, পাপ নেই, পুণ্য নেই, সুখ নেই দুঃখ নেই, তুমি জরামরণ-রহিত। কিন্তু যেমনি একটু সর্দ্দি কাশি এসে দেখা দিল বা অন্য কোনরূপ অসুস্থতা প্রকাশ পেল অথবা কোনরূপে রূপরসের প্রলোভন এসে উঁকি মারল অমনি সব গুলিয়ে গেল। তুমি তখন দুঃখ-যন্ত্রণার তাড়নায় ছুটোছুটি আরম্ভ

ক'রে দিল। প্রতিকারের চেষ্টায় তোমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল। তারপর বলি যদি তোমার কথাই সত্য ব'লে মেনে নিই, মা যদি মায়াই হন তাতেও তো দুঃখ করবার কিছু নেই। মায়া দোর ছেড়ে না দিলে কি কেউ জ্ঞানের মন্দিরে ঢুকতে পারে? আমার বিরাট শক্তিময়ী মাতৃরূপিণী মহামায়ার দয়া না হ'লে কি দুঃখের অবসান কখনও হয়?

আমি মায়ের সন্তান; তিনি দয়া ক'রে আমায় পথ ছেড়ে দেন তাই আমি তাঁকে দেখি, তাঁর সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলি। ন্যাংটা! জেনে রেখো, মার কৃপা না হ'লে তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন, কিচ্ছু হবার উপায় নেই,—উপায় নেই—উপায় নেই।

পরমহংসদেব ঈশ্বরকে স্নেহময়ী জননীরূপে প্রত্যক্ষ ক'রেই 'মা মা' ক'রে ব্যাকুল প্রাণে কাঁদতেন আর বলতেন—'মা, আমি সাধন জানি না, ভজন জানি না, ধর্ম্ম জানি না, অধর্ম্ম জানি না, ভাল জানি না, মন্দ জানি না, আমি জানি একমাত্র তোকে। যা করতে হয় তুই করিস মা।'

তিনি না চাইলেও জীবশিক্ষার জন্য মা তাঁকে দিয়ে এক এক ক'রে সব সাধন-পথের নিয়মকানুনগুলিই আচরণ করিয়ে নিয়েছেন। কখনও ভৈরবী এসে সাধন শিক্ষা দিলেন। কখনও তোতাপুরী এসে নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগ শিক্ষা দিলেন। কখনও মুসলমান ফকিরের আনুগত্যে কোরাণের শিক্ষা চলল—যীশু খ্রীষ্টের চিত্র দর্শনে কখনও ভাবাবিষ্ট হ'য়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু যতই তিনি মত থেকে মতান্তরে—পথ থেকে পথান্তরে যাতায়াত করুন না কেন, আমরা কিন্তু তাঁর সহজ সরল ভাবে মাতৃ আরাধনা—মায়ের কাছে ছোট ছেলের মত আবদার ক'রে সন্তানের হক্ প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা করাকেই সব চেয়ে সুন্দর ভাবে গ্রহণ না ক'রে পারি না।" (গোপীদাসের খাতা হইতে সংগৃহীত)

গোপীদাস নিজে আমাকে বলিয়াছেন—"কাকা! মায়ের (ললিতাদিদির) ভাণ্ডার কত ভাবের কত রত্ন দিয়ে যে পরিপূর্ণ তা যাঁরা তাঁকে ভালভাবে ভোগ করবার সুযোগ পান নি তাঁরা বুঝতে পারবেন না। নবদ্বীপে অবস্থানকালে

একদিন আমি তাঁর শ্রীচরণ সেবা করতে করতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মা! সেবা করতে গিয়ে মন চঞ্চল হয় কেন? ললিতা মা তার উত্তরে আমাকে যা বলেছিলেন আমি সেটি আমার খাতায় লিখে রেখেছি, এই দেখুন।"

এই বলিয়া গোপীদাস খাতাখানি আমার হাতে দিলেন। আমি তাঁহাকেই পড়িতে বলিলাম। তিনি পড়িতে লাগিলেন। অন্যান্য অনেক কথার পর লেখা আছে—

"গোপীদাস! মুখের কথায় যদি মন স্থির হ'য়ে যেত তা হ'লে আর আচার্য্য-পাদেরা এত সব নিয়মকানুন ক'রে দিতেন না। নিরন্তর সৎসঙ্গ করা, সৎগ্রন্থ পাঠ করা এবং সৎবিষয়ের চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন। মনটাকে ভোগের অধীন ক'রে ফেললে আর তোমার থাকল কি? বেশ বিচার ক'রে ভোগ করতে হবে।

গোপী! যা কিছুই কর না কেন, লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে সবই পণ্ডশ্রম হবে। তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব সবল ও কর্ম্মঠ আছে, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক তোমার জিহ্বার আস্বাদগ্রহণশক্তি লোপ পেলে যেমন কিছুতেই সুখ পাও না সেই মত হচ্ছে ভগবৎচিন্তাবোধ। যত কিছুই কর না কেন, অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবৎ স্মরণ-মনন না হ'লে মনে কিছুতেই যথার্থ শান্তি পাবে না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখবে, মানুষ ক্ষুদ্র নয়। সৃষ্ট যাবতীয় জীবের মধ্যে মানুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নির্জ্জনে ব'সে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কাজ ক'রে যাও, শান্তি পাবেই পাবে।

বর্ত্তমান যুগে যে কেন কারণেই হোক আমরা ভক্তি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। "ত্যাগাৎ শান্তি নিরন্তরম্" এ কথা আমরা ভুলে গেছি। আমরা ত্যাগ করেছি সৎকে—ত্যাগ করেছি ইষ্টকে। অনিত্যকে ত্যাগ করলে সেই ত্যাগের দ্বারা এই ঘোর অবিশ্বাসী যুগেও যে, সংসারকে পরম শান্তির আগার ক'রে নেওয়া যায়, এই সব ভোগ করতে করতেই যে তাঁর করুণালাভে জীবন ধন্য করা যায় এই সব শিক্ষা দিতেই এই সকল মহাপুরুষ আমাদের মধ্যে এসে নিজেরা আচরণ ক'রে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে যান।

সর্ব্বপ্রথম দরকার আহার-শুদ্ধির। আহার শুদ্ধ না হ'লে চিত্ত কিছুতেই স্থির হবে না। অভক্ষ্য ভক্ষণ ত্যাগ ক'রে সাত্ত্বিক আহারের দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধ ভাব বৃদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজন।

"অভক্ষ্যস্য নিবৃত্তাত্তু বিশুদ্ধং হৃদয়ংভবেৎ
আহার শুদ্ধৌ চিত্তস্য বিশুদ্ধির্ভবতি স্বতঃ।"

কেউ কেউ বলেন স্থূল দেহের স্থূল ভোগবিলাসের সঙ্গে মনের কোন সম্বন্ধ নেই। বাবা! তর্ক করলে চলবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষীগণ বহুভাবে পরীক্ষা ক'রে স্থির করেছেন যে, স্থূল আহার্য্য পরিপাক হ'য়েই নানারকমে মনকে পুষ্ট করে। "আহার শুদ্ধৌ চিত্ত শুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতি" এ বাক্য কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। তাঁরা তোমার আমার চেয়ে বহু সহস্র গুণে দূরদর্শী ছিলেন। মনে স্থির বিশ্বাস রাখবে যে, স্থূলদেহের সামান্য মালিন্যও মনকে চঞ্চল করে। এই জন্যই ভগবৎ আরাধনা বা অন্য কোন সৎকার্য্য করতে হ'লে আগে স্নান-শৌচাচারাদি দ্বারা স্থূল দেহটাকে মালিন্যশূন্য ক'রে নিতে হয়। এ বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নেই। তাই বলি যে ভাবে স্থূল দেহটাকে রাখলে মনে কোনরূপ চাঞ্চল্য না আসে সেই ভাবে রেখে বাইরের কোলাহল থেকে একটু তফাতে থেকে স্থির ধীরভাবে ইষ্টচিন্তায় রত হবে।

গোপী।—বিষয় থেকে মনকে ইষ্টচিন্তায় দিতে পারি কই?

ললিতা মা।—বিষয়ভোগ বাসনা হ'তে মনকে ফেরাতে হ'লে তা যে আপাতঃ মনোরম এবং পরিণামে অত্যন্ত দুঃখদায়ক এই ভাবটি বিশেষ বিচারের দ্বারা ঠিক ক'রে নিতে হবে।

গোপী।—এ কি আমার দ্বারা সম্ভব হবে মা?

ললিতা মা।—হতাশ হ'য়ো না গোপীদাস! একবারে না হয় শতবার—সহস্রবার চেষ্টা কর। অভ্যাসের দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হ'তে পারে। গীতায় শ্রীভগবান জীবশিক্ষার জন্য প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে বলেছেন—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপ জায়তে।" বিষয়ের ধ্যান করতে করতে যেমন

বিষয়ই লাভ হয় এবং সেই বিষয়ের সঙ্গপ্রভাবে অন্যান্য সর্ব্বনাশকারী কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির উদয় হ'য়ে যেমন ধ্যানকারীকে অধঃপাতিত করে, সেইরূপ ঐ সর্ব্বনাশকারী বিষয়চিন্তা না ক'রে সর্ব্বমঙ্গলময় ইষ্টচিন্তা করলে ধ্যানকারীর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলই যে সাধিত হবে তাতে আর সন্দেহ কি!

আনন্দ-রসঘন নিত্যশুদ্ধ ইষ্টদেবচরণে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারলে—প্রভু, সখা, প্রিয়তম, মাতা, পিতা প্রভৃতি যেভাবে তোমার ভাল লাগে সেই ভাবের মধ্যে তাঁকে সম্বন্ধযুক্ত ক'রে নিয়ে তদনুরূপ ভজনে প্রবৃত্ত হ'তে পারলে আর ভাবনা থাকবে না।

গোপীদাস! তাঁর চিন্তা করতে করতে যখন সাধকের শরীর পুলকিত হবে, মন প্রফুল্লিত হ'য়ে উঠবে, প্রেমাশ্রু বর্ষণে মুখ বুক ভেসে যাবে, ভাবগদগদ বাক্যে কণ্ঠ রোধ হ'য়ে আসবে তখন যে তিলমাত্র সময় পাবে না অন্য বিষয় চিন্তা করতে। এ অবস্থায় সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য ও সাযুজ্য এই চার প্রকার মুক্তিও সাধকের দ্বারে দাঁড়িয়ে ব্যাকুলভাবে তার কৃপাদৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করবে।—

"রোমাঞ্চেন চমৎকৃতাতনুরিয়ং ভক্ত্যামনোনন্দিতম্।
প্রেমাশ্রুণি বিভূষয়ন্তি বদনং কণ্ঠং গিরো গদ্‌গদাঃ॥
নাস্মাকং ক্ষণমাত্রমপ্যবসরঃ কৃষ্ণার্চ্চনং কুর্ব্বতম্।
মুক্তির্দ্বারি চতুর্ব্বিধাপি কিমিয়ং দাস্যায় লোলায়তে॥"

মনে রেখো গোপীদাস! আগ্রহ যদি তোমার অকপট হয় নিশ্চয়ই তিনি তোমার সহায় হবেন। 'সৎ-ইচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান' এ কথায় কোন ভুল নেই।" (গোপীদাসের খাতা হইতে)

গোপীদাস মহান্ত তাঁহার খাতা হইতে এই প্রসঙ্গটি পাঠ করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—"কাকা! যা পেয়েছিলুম তার আর তুলনা নেই। দুর্ভাগ্য যে, কাছে থেকে বেশীদিন সেবা করতে পারলুম না বা তাঁর আদেশমত কাজ করতে পারলুম না। দুর্দ্দৈব কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চল্‌ল।"

দিদির গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা

কি পুরীতে, কি নবদ্বীপে দিদির গুরুভক্তি ও গুরুসেবা পরিপাটি দর্শন করিয়া অনেকেই "ন ভূত ন ভবিষ্যতি" বলিয়া প্রসংশা করিয়াছেন। কেহ কেহ "ললিতাদিদি গুরুসেবার মূর্ত্ত বিগ্রহ" একথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। দিদির সেবানিষ্ঠা সত্য সত্যই আদর্শনীয় ছিল। শ্রীগুরুদেবে তাঁহার কি জাতীয় ধারণা ছিল, ভাষাদ্বারা তাহা প্রকাশ অসম্ভব; তথাপি আত্মশোধন মানসে একদিনের একটি প্রসঙ্গ আলোচনা করি।

আষাঢ় মাস, শ্রীগুরু-পূর্ণিমার রাত্রি। সকালের দিকে বেশ একটু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তথাপি সমস্ত দিনটাই আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টির সহিত একটু ঝড় বাতাস হইয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, এদিকে নির্ম্মল পূর্ণিমার চন্দ্র-কিরণ সমগ্র বাগানবাড়ীটির উপর পড়িয়া বাগানের শোভা শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। জলে-ভেজা গাছের পাতায় চন্দ্রকিরণ লাগিয়া মনে হইতেছে যেন অসংখ্য শ্বেতপুষ্পশোভিত বৃক্ষশ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে। শ্রীমন্দিরের সন্ধ্যারতির পর যথারীতি দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া ৭।৮টি বিদেশী ভক্ত দিদির ঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। অধম লেখকও তাঁহাদের সহিত একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

কিছু সময় পরে ললিতাদিদি সেখানে আসিয়া তাঁহার জন্য রক্ষিত স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিলেন। ভক্তগণ যথাযথভাবে প্রণামাদি করিয়া বসিলে দিদি সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় এবং আগমনের কারণ জানিয়া লইয়া বলিলেন—"আজ বড়ই শুভদিন, এমন দিনে করুণাময় প্রভু যে আপনাদের ধাম-দর্শনের সুযোগ ক'রে দিয়েছেন এটা বিশেষ সৌভাগ্যের কথা।"

জনৈক বয়স্ক ভদ্রলোক দিদিকে বলিলেন—"মা! শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার শ্রীমুখে কিছু শুনতে সাধ হয়, কৃপা ক'রে কিছু বলবেন কি?"

দিদি।—বাবা! আমি অবলা অশিক্ষিতা গোয়ালিনী, আমার তো কোন তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান নেই; তার উপর আবার সর্ব্বতত্ত্বসার শ্রীগুরুতত্ত্ব জানতে চাইছেন, আমি কি বলব বলুন?

ভক্ত।—না মা, বঞ্চিত করবেন না; দয়া ক'রে কিছু বলুন।

দিদি।—বাবা! সে করুণা বরুণালয় প্রেম-ঘন বিগ্রহের তত্ত্ব কি দু-চার কথায় ব'লে শেষ করা যায়? যিনি আপন মহিমায় সকল সময় সর্ব্বত্র বিরাজিত থেকে নির্ম্মল জ্ঞানের আলো জেলে অজ্ঞানীর অজ্ঞান অন্ধকার নাশ ক'রে দিচ্ছেন, চির বহির্ম্মুখীকে কৃপাকর্ষণে টেনে নিয়ে অন্তর্ম্মুখী ক'রে দিচ্ছেন, চিরবঞ্চিত পতিত অধম জনকে মহামূল্য প্রেমধন দানে ধন্য ক'রে দিচ্ছেন, সেই অযাচিত কৃপাকারী অজ্ঞানতিমিরনাশক শ্রীগুরুদেবের অপার অসীম করুণার কি তুলনা আছে?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার রসিকভক্ত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীচরণ এক স্থানে বলেছেন—

"কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ।
কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥"

অন্যত্র বলেছেন—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে॥"

শ্রীগুরুস্বরূপের কথা স্মরণ হ'লে প্রাণ আনন্দে ভরপুর হ'য়ে যায়। নিখিল জীব-হৃদয়ে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানের জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত; তাই স্থানাস্থান কালাকাল বা পাত্রাপাত্রের কোনরূপ বিচার না ক'রে সর্ব্বত্র কৃপা প্রকাশের জন্য লালায়িত। এ কৃপা, এ দান যে কি, তা মুখে ব'লে বোঝাবার নয়; শরণাগতভাবে প্রাণে প্রাণে অনুভব করবার।

সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, শ্রীগুরুকৃপাই সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির মূল। নিজের কোন প্রয়োজন না থাকলেও নিজে আচরণ ক'রে

আশ্রিত জনকে নানাভাবে ভজনমুদ্রা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। বাবা! 'গুরু কৃপাহি কেবলম্' গুরু কৃপা না হ'লে কিছু হয় না—হবে না—হতে পারে না এ নিশ্চয় জানবে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাগ্রন্থে লিখেছেন—

"শ্রীগুরুচরণে রতি এই যে উত্তম গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।"

এই আশা কি? তাহার ব্যাখ্যায় আচার্য্যপাদ বলেছিলেন—"শ্রীবৃন্দাবনে মণি-নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োশ্চামরব্যজন-পাদসম্বাহনাদিরূপা আশা।" উত্তমগতির ব্যাখ্যায় বলেছেন—উত্তমাচাসৌ গতিশ্চেতি উত্তম গতিঃ। "পুনরায় বলেছেন—"প্রাপ্য বস্তুনাং শ্রেষ্ঠং শ্রীরাধা-প্রাণবন্দোশ্চরণকমলয়োঃ পাদ-সম্বাহনাদিরূপা প্রেমসেবা।" যাঁর করুণায় এমন উত্তমগতি লাভ হয়, প্রেম-সেবাদি লাভ করিয়া আশা পূর্ণ হয়, সেই পরম করুণ অযাচিত কৃপাকারী শ্রীগুরুদেবের মহিমার কথা আমার মত ক্ষুদ্রমতি বিষয়সেবী ইন্দ্রিয়-কিঙ্কর কি ক'রে বর্ণনা করবে? যাই হোক, আজ শুভ গুরু-পূর্ণিমা তিথিতে আপনারা অযাচিতভাবে উপস্থিত হয়ে আমাকে দিয়ে শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে দুটো কথা আলোচনার সুযোগ দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করলেন। আপনারা পণ্ডিত, শাস্ত্রাদি আলোচনা ক'রে তত্ত্ব নিরূপণ ক'রে নেবেন। জয় গুরু, জয় গুরু!"

দিদি এই বলিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আর কিছু বলিলেন না। দিদির গম্ভীর ভাব দেখিয়া সহজেই অনুমান হইল যে, তিনি ভিতরে ভিতরে কোনও অপ্রাকৃত-রস ভোগ করিতেছেন। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া দিদি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলিতে বলিতে দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

হতভাগ্য লেখক ভক্ত-শ্রোতাগণের এক পাশে বসিয়া সকলই শুনিতেছিল এবং দিদির অজ্ঞাতসারে কথাগুলি কাগজে টুকিয়া লইতেছিল। দিদি উঠিয়া যাইতেই পূজনীয় নন্দদাদা বলিলেন—"ভট্টচাযি্য মশাই, এইবার একখানি গুরুতত্ত্ব

সম্বন্ধে গান করবেন ?" আপত্তি বা কোনও কারণ দেখাইবার কোনরূপ অবসর না দিয়াই একটা হারমোনিয়ম আনিয়া সম্মুখে বসাইয়া দিলেন। অগত্যা ভক্তকবি স্থবোধচন্দ্রের নিম্নলিখিত শ্রীগুরুমহিমাদ্যোতক গানখানি গীত হইল। পাঠকগণের অবগতির জন্য গানখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

শ্রীগুরুচরণারবিন্দে ভৃঙ্গ হয়ে থাক। (রে মন)
নিত্যানন্দে অঙ্গরাগ পুণ্যপরাগ মাখ॥
(যবে) ব্রজসুন্দর প্রেম সৌরভে
বহিবে মলয়া মহাউৎসবে
গুঞ্জনে গুরু জয় গৌরবে
মধুচন্দন মাখ॥
তমসাঘন তিমির অন্ধ সংশয়ভরা নয়নে
জ্ঞানাঞ্জন লেপন করি দেখাইল দীনশরণে
পরম করুণা কণিকা বিতরি
মানস-মুকুর মার্জ্জিত করি
রিক্ত এ দাসে যে দিয়াছে ভরি
সেই দীনদয়ালে ডাক॥

শ্রোতাগণের আগ্রহে দুই-তিন বার গানখানি গাওয়া হইল। শেষে নন্দদাদার আদেশে শ্রীগুরুদেবের জয় দিয়া গান শেষ করিয়া আমরা প্রসাদ পাইবার জন্য চলিলাম। অন্যদিন দিদি প্রসাদ পাইবার সময় অন্ততঃ একবারও দর্শন দিয়া থাকেন, কিন্তু আজ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অনেকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। শেষে সংবাদ লইয়া জানিলাম, দিদি শ্রীগুরুতত্ত্ব আলোচনার পর কেমন যেন আবিষ্ট ভাবে পড়িয়া আছেন, তাই আর বাহিরে আসিতে পারেন নাই।

প্রবন্ধ প্রাপ্তি

কোঁড়ারবাগানের বাড়ী হইতে মাসিলায় আসিয়া বাস করিবার পর তিন-চার বৎসর নিয়মিত ভাবে শ্রীধাম নবদ্বীপে উৎসবের সময় ছাড়াও দুই-তিন বার যাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এমন কি কখন কখন ১৫।২০ দিন দিদির সান্নিধ্যে থাকিয়া উপদেশাদি গ্রহণের সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। একবার মাঘ মাসের বড় উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বেই সস্ত্রীক নবদ্বীপে গিয়াছি এবং মঠের পূর্ব্বদিকে রাস্তার উপরেই একটি বাড়ীতে আছি। সঙ্গে স্ত্রী পুত্র ও কন্যা তিনজন ছাড়া একটি ভক্ত ছিলেন।

একদিন বৈকালে বাগানবাড়ীর বিরাট ফুলের বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, হাতে শ্রীনামের মালা। অভ্যাসবশে মালা চলিতেছেন কিন্তু মন নানা জাতীয় ফুলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছে। একটা গাঁদাফুলের গাছে অফুরন্ত ও অস্বাভাবিক বড় বড় ফুল দেখিয়া সেই স্থানে একটু দাঁড়াইয়াছি, হঠাৎ কানে আসিল—"দীনেশ, ও দীনেশ! ওখানে কি হচ্ছে? এস, এস, এখানে এক মজার ব্যাপার ঘটেছে।" ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, পূজনীয় বিহারীবাবাজী ফুল-বাগানের দক্ষিণ দিকের ইঁদারার কাছে দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিতেছেন।

আমি ব্যস্তভাবে সেখানে গিয়া কি ব্যাপার জানিতে চাহিলে, বিহারীবাবাজী বলিলেন—"দিদির বারান্দায় যাও; দিদির পদলেখার খাতার মধ্যে একখানা কাগজ পাওয়া গিয়েছে, তাতে অনেক ভাল ভাল কথা সব লেখা আছে। সকলেই খুব মন দিয়ে শুনছে।" আমি আর বিলম্ব না করিয়া বাগানের গেট দিয়া বাহির হইয়া দিদির ঘরের দিকে ছুটিলাম।

সেখানে যাইয়া দেখি, আমাদের সুরেনদাদা (স্বরূপদাস), নবগোপালদাদা, বুড়ো বিহারীদাদা, যুগল দত্ত, মাণিক মল্লিক প্রভৃতি অনেকেই মণ্ডলীবদ্ধ ভাবে বসিয়া কি যেন আলোচনা করিতেছেন। স্বরূপদাসের হাতে একখানি কাগজ।

তিনি মধ্যে মধ্যে সেটি পাঠ করিতেছেন এবং তাহারই কোন কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। বসিয়া বসিয়া পাঠ শুনিলাম এবং পাঠান্তে সেটি সংগ্রহ করিয়া নকল করিয়া লইয়াছিলাম। তখন 'ভক্তি' পত্রিকায় প্রকাশ করিব এই উদ্দেশ্যেই আনিয়াছিলাম। কিন্তু দিদির অনুমতি না পাওয়ায় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় নাই।

আজ নিষেধ করিবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেহ নাই ; আর দিদির সম্বন্ধেই যখন যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে বসিয়াছি, তখন এটি পাঠকগণকে উপহার দিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করিয়াই মুদ্রিত করিলাম। কাগজখানিতে লেখা ছিল—

"প্রাচীন তত্ত্বদর্শী সাধকগণ প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নব নব রূপায়ণের মধ্য দিয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের বিভিন্ন ছন্দোময় এক পরম সত্তার সন্ধান পাইতেন। শুধু সন্ধান পাইয়াই যে তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতেন তাহা নহে ; সেই বিভিন্ন ছন্দোময় পরম সত্তার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আস্বাদনে বিশ্ববাসী মানবকে বিশেষভাবে অধিকারী করিয়া দিতেন। এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কি উপায়ে সনাতন সত্যপথে চলিয়া পরিবর্ত্তনশীল কালের বিভিন্ন গতির বিভিন্ন রূপ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া আনন্দময় জীবনের সর্ব্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগে সমর্থ হয় তাহাও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বিশেষ পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে কি জানি কেন সে ধারা ধরিয়া, ঋষিগণের মঙ্গল নির্দ্দেশ মানিয়া সেই পরমানন্দময় রসাস্বাদনে অগ্রসর হইবার আগ্রহ বড় কেহ দেখায় না। এটা ভাল কি মন্দ, যুগের ধারা কি শিক্ষার দোষ, সে সব বিচার এখানে করিতে চাই না। আর করিলেও যে কেহ বিশেষ আগ্রহ করিয়া শুনিবে তাহাও মনে হয় না। তথাপি শ্রীগুরুদেব কৃপাপ্রেরণা দ্বারা হৃদয়ে যে ভাবটি জাগাইয়াছেন তাহা প্রকাশ না করিয়া পারিলাম না।

বেদ সামচ্ছন্দে যে দেবতার বন্দনা গান করিয়াছেন তিনি হইলেন ইন্দ্র।

বেদের এই ইন্দ্রদেবতাই নিজ উপাসনা দ্বারা আনন্দঘন শ্রীগোবিন্দের সাধনার আবশ্যকতা প্রকাশ করিয়াছেন।

ইন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীগোবিন্দের গোবর্দ্ধনধারণ লীলা দর্শন করিয়া আপনাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র শক্তিবিশিষ্ট মনে করিয়া গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোবিন্দপদে আপনাকে একেবারে বিকাইয়া দিলেন এবং গোবিন্দকে গো-গণের (ইন্দ্রিয়গণের) ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করিয়া নানাভাবে নিজ অযোগ্যতা জানাইলেন।

শুধু ইন্দ্র নয়,—মিত্র, সোম, বায়ু, অগ্নি ও বরুণ সকলেই সেই অতুলনীয় ভুবনমোহন শ্রীগোবিন্দের অরুণ চরণ-কমলের নখ-কিরণ গরিমায় মোহিত হইয়া নিজ নিজ গর্ব্ব ভুলিয়া শ্রীচরণতলে লুটাইয়া কৃতার্থ হইলেন। এ সকল কথা আমাদের মনগড়া কথা নহে; নিবিষ্টচিত্তে বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি আলোচনা করিলেই ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

তারপর ভাগ্যবান সাধক রসময় ঋষভ দেবতার এই দেবমোহন লীলাকে যেদিন আপন হৃদয়ে উপলব্ধি করিলেন সেদিন মধুর মধুর ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত হইয়া উঠিল। দশদিক ব্যাপ্ত হইয়া ধ্বনি উঠিল—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্ণ সন্তোষধিঃ
ওঁ মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদ্যৌরস্তনঃ পিতা
ওঁ মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তনঃ। ইত্যাদি।

বিশ্বপ্রকৃতির এই গোপন চাতুরী কি জানি কোন্ অপ্রাকৃত প্রভাবে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের মধ্য দিয়া অতি সুন্দরভাবে, উজ্জলতমরূপে তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে ব্যক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারাও আনন্দে আত্মহারা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের এই অপ্রাকৃত আনন্দবার্ত্তা নানাছন্দে, নানাভাবে বিশ্বসংসারে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। উর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চকণ্ঠে তাঁহারা বলিলেন—এ ধামের তরুগুল্মলতা এমন কি ধূলিকণা পর্য্যন্ত আনন্দময়।

শ্রীবৃন্দাবন যে চিন্তামণিময় ভূমি এ কথা শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় আমরা অতি পরিষ্কারভাবেই জানিতে পাই। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

বৃন্দাবন রম্যস্থান দিব্যচিন্তামণিধাম
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী নীরে রাজহংস কেলি করে
তাহে শোভে কনক কমল॥
তার মধ্যে হেমপীঠ অষ্টদলে বেষ্টিত
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে বসি আছেন দুইজনে
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ও রূপ লাবণ্যরাশি অমিয় পড়িছে খসি
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
'নরোত্তম দাস' কয় নিত্যলীলা সুখময়
সদাই স্ফুরুক মোর মনে॥

ভাবাবেগে ভক্ত সাধক এই পদের ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিয়াছেন—"ব্রজের এক একটি রজঃরেণু কোটি কোটি চিন্তামণিকেও তুচ্ছ করে।" আবার বলিয়াছেন—"সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হেথা গুল্ম হ'তে বাঞ্ছা করে।" ইত্যাদি।

চিন্তামণিময় ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন ইত্যাদি বাক্যে শুধু ধামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, এই আনন্দময় ধামের কোটি কন্দর্প বিজয়ী দেবতা শ্রীগোবিন্দই জীবের একমাত্র আরাধ্য। ইহাকে আরাধনা করিলে জীবের যাবতীয় যন্ত্রণার অবসান হইবে। এবং জীব দুর্ব্বার কামনা-বাসনার হাত হইতে অক্লেশে পরিত্রাণ পাইয়া পরম শান্তিময় স্নিগ্ধ প্রেমানন্দের অধিকারী হইবে।

জীব যতই মায়ামুগ্ধ, আশাপাশবদ্ধ হউক না কেন, এইরূপ দেবতাকেই তো সে চায়; তাই ঘোষণাবাণী শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই নানা ভাবে উপাস্য দেবতার সন্ধানে সাধনা চালিতে লাগিল। ক্রমে দেবতাও আসিয়া বিভিন্ন ভাবে সাধককে আপনার কাছে টানিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীললিতাসখীর হস্তাক্ষর

শ্রীগুরবেনমঃ শ্রীশ্রীমাতাজী—

জয় নিতাইগৌর রাধেশ্যাম। ১৩৫৪/১২/১৭ কাশী

জয় হর। হরেকৃষ্ণ হরেরাম॥

জয় গুরু শ্রীগুরু জয় গুরু শ্রীগুরু জয় গুরু শ্রীগুরু জয় গুরু শ্রীগুরু জয় গুরু শ্রীগুরুদেব

জয় শ্রীগুরুদেব। স্নেহের ভগ্নীবরেষু:

প্রায় ৩ দিন তোমার পত্র পাইয়াছি নানারূপ কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তাহার পর শ্রীযুক্ত আনন্দ গোপাল প্রভুর পত্রখানা বাড়ী ঠাকুরকে দেখাইয়া তোমায় লিখিব বলিয়া দেরী হইল মনে কিছু করিও না। আগামী শুক্রবার সন্ধ্যায় পত্র পাইবে। তোমায় আশীর্বাদ করি যে শ্রীযোগমায়ার অঘটন ঘটন পটীয়সী শক্তির প্রভাবে যদি সুবিধা করিতে পার বড়ই আনন্দ হয়। কাশী যে আমার পত্রের সংবাদ দিলাম। কি জানি কি করিবে। তুমি সর্বশক্তিমান শ্রীগুরুদেবকে বলিও শান্তিদাতা শান্তি প্রদান করিবেন। আমার শরীর এক প্রকার ভালই আছে।

বৃন্দাবন রম্যস্থান দিব্যচিন্তামণিধাম
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী নীরে রাজহংস কেলি করে
তাহে শোভে কনক কমল ॥
তার মধ্যে হেমপীঠ অষ্টদলে বেষ্টিত
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে বসি আছেন দুইজনে
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ॥
ও রূপ লাবণ্যরাশি অমিয় পড়িছে খসি
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
'নরোত্তম দাস' কয় নিত্যলীলা সুখময়
সদাই স্ফুরুক মোর মনে ॥

ভাবাবেগে ভক্ত সাধক এই পদের ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিয়াছেন—"ব্রজের এক একটি রজঃরেণু কোটি কোটি চিন্তামণিকেও তুচ্ছ করে।" আবার বলিয়াছেন—"সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হেথা গুল্ম হ'তে বাঞ্ছা করে।" ইত্যাদি।

চিন্তামণিময় ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন ইত্যাদি বাক্যে শুধু ধামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, এই আনন্দময় ধামের কোটি কন্দর্প বিজয়ী দেবতা শ্রীগোবিন্দই জীবের একমাত্র আরাধ্য। ইঁহাকে আরাধনা করিলে জীবের যাবতীয় যন্ত্রণার অবসান হইবে। এবং জীব দুর্ব্বার কামনা-বাসনার হাত হইতে অক্লেশে পরিত্রাণ পাইয়া পরম শান্তিময় স্নিগ্ধ প্রেমানন্দের অধিকারী হইবে।

জীব যতই মায়ামুগ্ধ, আশাপাশবদ্ধ হউক না কেন, এইরূপ দেবতাকেই তো সে চায়; তাই ঘোষণাবাণী শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই নানা ভাবে উপাস্য দেবতার সন্ধানে সাধনা চালিতে লাগিল। ক্রমে দেবতাও আসিয়া বিভিন্ন ভাবে সাধককে আপনার কাছে টানিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীললিতাসখীর হস্তাক্ষর

শ্রীগুরবে নমঃ — শ্রীশ্রী[illegible]
জয় নিতাই গৌর জয় [illegible]। ১৩৪৪/১৭
[illegible] ১২ ই [illegible]॥ [illegible]

জয় গুরু শ্রীগুরু জয় গুরু শ্রীগুরু জয় গুরু
শ্রীগুরু জয় গুরু শ্রীগুরু জয়গুরু শ্রীগুরুদেব

জয় শ্রীগুরুদেব! স্নেহের [illegible]:
গত ৩ দিন তোমার পত্র পাইয়া [illegible]
[illegible] হৈ ছিলাম, তাহার পরে শ্রীযুক্ত আনন্দ
গোপাল প্রভুর কাছে, বাকী [illegible]
[illegible] তোমার লিখিত বাক্য দেখী
হইল মনে কিছু [illegible]। আগামী
শুক্র বারে [illegible] হইবে।
তোমার [illegible] শ্রী যোগমায়ার
[illegible] শক্তির প্রভাব
যদি বুঝিয়া করিতে পার বড়ই আনন্দ
হয়। [illegible] যে আর কার্য্যের সংবাদ
দিলাম। কি আর লিখিব। তুমি
সর্ব্বশক্তিমান শ্রীগুরুদেবের [illegible]
শান্তি [illegible] শান্তি প্রদান করিবেন।
আমার শরীর এক প্রকার ভালই আছে।



এইভাবে চির-মধুময় শ্রীবৃন্দাবনধামের চিরসুন্দরের অপূর্ব্ব লীলামাধুরী দিক হইতে দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। আজও সে লীলার বিরাম নাই, তবে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না। শুনিয়াছি—

অদ্যাপিহ সেই লীলা বৃন্দাবনে হয়।
ভাগ্যবান জনে তাহা প্রত্যক্ষ করয়॥

শ্রীবৃন্দাবনধাম-মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"বিন্দ্রাবন অউর গৌলক তৌলে তুলসীদাস।
যো ভারি উওঁ রহে গিয়া হাল্‌কি চঢ়ে আকাশ॥"

শ্রীবৃন্দাবন বিনোদিনী, শ্যামজলদজড়িত স্থির বিজুরীসমা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী রাধিকাদি গোপীগণের কৃপা যিনি কণামাত্রও লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আনন্দময় বৃন্দাবনধামের নিত্য লীলারস কথঞ্চিৎ আস্বাদনে অধিকারী।

শ্রীবৃন্দাবনের এই নিগূঢ় তত্ত্ব অনুভব হওয়া বড় সহজ নয়। মর্ত্ত্যভূমি বৃন্দাবনের লীলাকে অমর্ত্ত্য সত্যের রসমাধুরীতে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য—অঘটনকে সংঘটন করাইবার জন্য এক অপরূপ মাধুরীতে বৃন্দাবনের গুপ্তলীলা ব্যক্ত করিলেন। এই ব্যক্ত করিবার কর্ত্তা কে? উত্তরে সমস্বরে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এ কর্ত্তা আর কেউ নয়, এ আমাদের শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি। মধুর শ্রীবৃন্দাবনের যুগলমিলন-মাধুরী আজ সঙ্কীর্ত্তনধ্বনির মধ্য দিয়া এক সঙ্গে—এক অঙ্গে ফুটিয়া উঠিল।

এই শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালায় নবজীবনের জোয়ার দেখা দিল। সেই জোয়ারের প্রেমপ্লাবনে জগতের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই ভাবুক কবি ভাবের আবেগে গাহিয়াছেন—

"শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়।"

এই অপূর্ব্ব প্লাবনে কলিকলুষিত জীবের তথা ভারতের সকল গ্লানি কালিমা বিধৌত হইয়া গেল, ভারতভূমির আচণ্ডালাদি সকলকে প্রেমে নাচাইয়া দিল,

ধনী নির্ধনী এক হইয়া গেল, অতিবড় নাস্তিকও ভগবানে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া উঠিল। তার্কিক তর্ক ভুলিল, ছুঁৎমার্গ কোথায় যেন লজ্জায় মুখ লুকাইল। এক কথায় সকলেই ভেদাভেদ বিস্মৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া ধন্য হইল।

"তেহিনো দিবসা গতাঃ।" আজ আর সেদিন নাই ; আজ জগতের যে দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় সেই দিকেই যেন হা-হুতাশভরা নিরানন্দময় ছন্নছাড়া ভাব। তাই দেশের এই দুর্গত পরিস্থিতি দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—প্রভু! তুমি আবার আইস ; তেমনি করিয়া আবার আসিয়া প্রেমের বন্যায় সকলকে ভাসাইয়া দাও। পতিত আমরা, তাপিত আমরা, ভ্রান্তপথে পথহারা পথিক আমরা, ভেদ বিরোধ দ্বন্দ্বে অভিভূত আমরা তোমার প্রেমবন্যার এককণা স্পর্শে ধন্য হইয়া যাই। মহাজনমুখে শুনি, তুমিই নাকি বলিয়াছ—

"পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

সেদিনের আর কতদিন বাকি? আমাদের ভাগ্যে কি সে সুখময় লীলাদর্শন হইবে না? তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

জয় শচীনন্দন জগজনরঞ্জন
ত্রিভুবনবন্দন দয়াময় হে।
অনাথশরণ আশ্রিতপালন
পতিতোদ্ধারণ দয়াময় হে॥

জয় জয় শ্রীগুরু, জয় জয় শ্রীগুরু, জয় জয় শ্রীগুরু। অলমিতি।"

লেখাটি দিদির হাতের ছিল, কিন্তু রচনাটি কার জানিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলাম। উপস্থিত অনেকেই দিদিকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, কিন্তু দিদি কোনও উত্তর না দিয়া 'জয় গুরু' 'জয় গুরু' বলিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন। এখন পাঠকগণ এ প্রবন্ধটির রচয়িতা কে অনুমান করিয়া লউন।

দুঃখে ভয় কি ?

কাজে দেখাইতে না পারিলে শুধু মুখে বড় বড় কথা বলিলেই হয় না। সংসার অনিত্য, দেহ অনিত্য, বিষয়বৈভব, স্ত্রীপুত্র সকলই অনিত্য—এ কথা বোধ হয় দিনে শতবার বলিব। কিন্তু এই অনিত্যকে ছাড়িয়া বা ভুলিয়া নিত্যকে ধরিবার বা ভাবিবার চেষ্টা দিনের মধ্যে কতটুকু করি, এই তো আমাদের দশা। দেহে কোন ব্যাধির প্রকাশ হইলে আর রক্ষা নাই—'বাবা গো, মা গো, গেলুম গো, কে আছে গো' ইত্যাদি রবে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলি। কিন্তু সেই নিত্যসত্য চিরমঙ্গলময়ের নাম একবারও মুখে বলি না। আবার এমন লোকও আছেন যাঁহারা যন্ত্রণাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নামোচ্চারণের স্বরও বৃদ্ধি করিয়া দেন। কেহ কেহ বেশ দৃঢ়স্বরেই ভগবানের উদ্দেশে বলেন—

ভেবেছ কি দুঃখ দিয়ে ভুলিয়ে দিবে মোরে ?
বেদনার আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিবে দূরে ?
ভুলে যাও হে দুঃখহারী হরি !
আমি, সার করেছি নামের তরি।
দুঃখ শেষে দুঃখ পাবে তোমার নামের জোরে।

আবার আর এক রসিক ভক্তের মুখে শুনি—

দুঃখ এলে বলব হেঁসে,
আয় লো সখি আয় লো ঘেঁষে
কর, দেহের সঙ্গে কোলাকুলি
আমার, আমি তো তুই পাবি না।
আমি এখন দরিয়ার পার
সেথায় যেতে পারবি না।

ললিতাদিদির জীবনে আমরা এ ভাবটি প্রত্যক্ষ করিয়াছি বহুবার বহু ঘটনায়। কি করিয়া রোগযন্ত্রণায় তিনি হাসিমুখে থাকিতেন, এ প্রশ্ন অনেকেই তাঁহাকে করিয়াছে; কিন্তু তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাসিমাখা মুখে 'জয় গুরু জয় গুরু' বলিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে নিরস্ত করিয়াছেন।

একবার মঠবাসী একজনের যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি শুনিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিলেন—"প্রাকৃত পচা দেহের জ্বালা-যন্ত্রণায় যাতে মন নিবিষ্ট না হয় তার চেষ্টা কর ভাই! লীলাগত নিজদেহে সর্ব্বদা প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরীর কাছে কাছে থেকে তাঁহাদের লীলার সহায়কারিণী হ'তে চেষ্টা কর, জীবন ধন্য হবে, সকল জ্বালার শান্তি হবে। ভাই! আমাদের আর বলবার বা করবার কি আছে? পরমমঙ্গলময় শ্রীগুরুদেব যখন যেখানে যে অবস্থায় রাখবেন তাঁর কৃপার দান ব'লে তাতেই মনকে পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা কর। আমাদের সম্বন্ধে আমরা যতটুকু ভাবি বা বুঝি তা অপেক্ষা করুণাময় অনেক বেশী ভাবেন বা বোঝেন। কাজেই আমাদের প্রাণের কাতরতা তাঁর শ্রীচরণে জানিয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য। মনে রেখো কণামাত্র কৃপাকটাক্ষে মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হতে পারে।"

বিশ্বাস ও প্রাপ্তি

শ্রীধাম নবদ্বীপে অসংখ্য ঠাকুরবাড়ী। কোনটি প্রাচীন, কোন কোনটি পরবর্ত্তী কালে হইয়াছে। অনেক ঠাকুরবাড়ীতেই ভেটের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দিদি বাগানবাড়ীতে কোনরূপ ভেটের ব্যবস্থা করিতে দেন নাই। অবশ্য এ জন্য নবদ্বীপের অনেক প্রভুসন্তানও দিদির উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। নানাভাবে নানা প্রকার কটাক্ষ দিদিকে সহ্য করিতে হইয়াছে।

ভেট তো দূরের কথা, কোনরূপ মাসিক বন্ধানি করিতেও দিদির ঘোর আপত্তি ছিল। ভক্তেরা ইচ্ছামত যখন যাহা দিতেন দিদি পরমাদরে তাহা গ্রহণ

করিয়া সেবায় ব্যয় করিতেন। মাসে মাসে কেহ কিছু দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে দিদি তাঁহাকে বলিতেন—"আপনি যখন যেমন ইচ্ছা সেবার জন্য দিতে পারেন, আমরা তাহার কোন হিসাবনিকাশ রাখিতে পারিব না বা কোন সময় না দিলে তাহার জন্য কোনরূপ তাগিদও করিতে পারিব না। আপনি যদি মনে করেন আমরা আপনার সাহায্য নিয়মিতভাবে পাইবার জন্য আপনাকে তাগাদা করিব তাহা হইলে কিন্তু ভুল বোঝা হইবে। শ্রীগুরুদেবের এইরূপই আমাদের উপর আদেশ।"

সেবা করিবার অকপট ইচ্ছা থাকিলে যে কোনরূপ অভাব হয় না এ কথা অনেকের নিকট শুনিয়াছিলাম; কিন্তু প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল দিদির কাছে। সেবক আসিয়া জানাইল, অমুক জিনিস নাই, দিদি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"যাঁর কাজ তিনিই ব্যবস্থা ক'রে দিবেন। তোমরা সেবক তোমাদের কাজ তোমরা কর। কাজের প্রেরণা প্রাণে জাগিয়ে দিয়ে তিনি কি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকবেন? যিনি প্রেরণা জাগিয়েছেন তিনিই সমাধান করবেন।" পাঠকগণ অভাগার কথা বিশ্বাস করুন, আশ্চর্য্যভাবে অতি অল্প সময় মধ্যেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একদিনের একটি ঘটনা যাহা আমার সম্মুখে হইয়াছিল তাহা বলি।

একবার বড় মহোৎসবের সময় মালপোয়া প্রস্তুতের জন্য গুড়ের অভাব হয়। নবদ্বীপ বাজারে গুড় নাই; সকলেই চিন্তিত। দিদির কাছে বলায় দিদি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"যদি বৈষ্ণবসেবায় মালপোয়া দেবার তাঁর ইচ্ছা থাকে তবে তিনিই ব্যবস্থা করবেন।" আমরা দিদির অজ্ঞাতসারে কি ভাবে কি করা যায় সেই পরামর্শ করিতেছি। এমন সময় নবদ্বীপ স্টেশন হইতে সংবাদ আসিল যে, একটি ওয়াগানে পঁচিশ কলসী গুড় আপনাদের জন্য আসিয়াছে, আপনারা শীঘ্র লইয়া যাউন। দীন লেখক আশ্রমের সেবকগণের সঙ্গে যাইয়া দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত গুড় লইয়া আসিল।

গীতাপাঠে আমরা দেখি শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"দুঃখে স্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ।
বীতরাগ ভয়ক্রোধ স্থিতধীর্মুনি রুচ্যতে॥"

ললিতাদিদির জীবন অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেকটি কার্য্যের মধ্যে আমরা ঐ সকল লক্ষণ দেখিতে পাই। কোন জিনিস প্রাপ্তিতেও যেমন, আবার কোন জিনিস হারাইলেও সেইরূপ সমভাব সর্ব্বদা ললিতাদিদির মধ্যে প্রকট ছিল। এ যে কেবল বাহিরে তাহা নহে, ভিতরেও কোন বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন হইত না।

একবার নবদ্বীপ বাগানবাড়ীর ঠাকুরঘরের তালা ভাঙ্গিয়া চোরে ঠাকুরের রূপার সিংহাসন, গহনা ও অন্যান্য বহু মূল্যবান জিনিস লইয়া গিয়াছিল। দিদি তাঁহার একজন ভক্তকে সেই সংবাদ জানাইতে কি ভাবের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা পত্রখানির কিয়দংশ পাঠ করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। অন্যান্য কথার পর দিদি পত্রে লিখিয়াছেনঃ—

"...গত মঙ্গলবার রাত্রে প্রাণেশ্বরীর ঘরের বাহিরের দরজার তালা ভাঙ্গিয়া ও ভিতরের দুইটি তালা ভাঙ্গিয়া, নন্দালয়ের নারায়ণের ছোট রূপার সিংহাসন, সখীদের হাতের চুড়ি, মটরমালা, মহাপ্রভুর নূপুর, বেঁকি, পাঁজর, বিছাহার, মটরমালা ও কাণের মটরমালা প্রভৃতি প্রায় তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকার গহনা রঙ্গিয়া প্রভু কাহাকে দিয়া দিয়াছেন। বেশ আনন্দে আছেন। তোমাদের প্রভুর রঙ্গ তোমরাই বোঝ। ইতি

তোমাদের দিদি"

পাঠকগণ! ভাষা দেখিয়া প্রাণের ভাব অনুভব করুন। ললিতাদিদি কি জাতীয় ভাব লইয়া মঠে অবস্থান করিতেন এবং নিজেকে সেবক-সেবিকাগণের মধ্যে কোথায় বসাইয়া কার্য্য করিতেন সে বিষয় বিশেষ চিন্তা করিবার আছে। যদি সুযোগ ও সৌভাগ্য হয় তাহা হইলে স্থানবিশেষে এ বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

না চাইতে অনেক পাই

ললিতাদিদির ঝাঁঝপিটা মঠে অবস্থান সময়ের দৈনন্দিন কার্য্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করা আমার সাধ্যাতীত। তখনকার সঙ্গী যাঁহারা সর্ব্বদা দিদির নিকট থাকিতেন তাঁহারা অনেকেই এখন অপ্রকট। যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন তাঁহাদের নিকট সকাতর প্রার্থনা জানাইয়াও বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কেহ বলেন, স্মরণ নাই। কেহ বলেন, ও সব কি হবে, ইত্যাদি। নবদ্বীপ রামচন্দ্রপুরের চড়ায় পূজনীয়া বিনোদিনীদিদির নিকট গিয়াছিলাম, পূজনীয় অদ্বৈতদাদাও সঙ্গে ছিলেন। তিনি বিশেষ স্নেহ-কৃপা দেখাইয়া বলিলেন—"তোমাদের ললিতাদিদির আদর্শ শ্রীগুরুসেবা, কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্যনিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা—এইগুলিই বিশেষ লক্ষ্য করবার। কোন্‌দিন কখন কি করেছে না করেছে সে সব গুছিয়ে বলবার মত সামর্থ্য এখন আর আমার নেই। তার উপর সব কথা মনেও নেই। তবে জেনে রাখ ললিতার দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে, তার উপর কর্ত্তা (বড়বাবাজী মহাশয়), নবদ্বীপদাদা ও গোবিন্দদাদা প্রভৃতি যে ভাবে যখন যে আদেশ করেছেন বিনা আপত্তিতে তা পালন ক'রে তাঁদের সুখী করেছে। কোন অবস্থায় কোনদিন কোনরূপ বিরক্তিভাব তার দেখতে পাই নি।"

এই ভাবের টুকিটাকি যেখানে যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা সাজাইয়া আপনাদের নিকট ধরিয়া দিলাম। যাহার যে ভাবে আস্বাদন করিয়া সুখ হয় করুন। দিদির যথালাভে সন্তুষ্টির বহু ঘটনা আছে, আজ একদিনের একটি আপনাদের নিকট উল্লেখ করিতেছি।

একদিন বৈকালবেলা ঝাঁঝপিটা মঠে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া মঠবাসী কয়েক মূর্ত্তির সহিত শ্রদ্ধেয় নগেনদাদার ঠাকুরসেবা, বৈষ্ণবসেবা, আত্মীয়বন্ধু-বান্ধবগণের সেবা প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে। দিদি মুখে

প্রয়োজন মত কথার উত্তর দিতেছেন, কিন্তু হাত দুইটি সেবার কাজে নিযুক্ত। অনেকক্ষণ আলোচনার পর সদাহাস্যবদন নগেনদাদা দিদিকে বলিলেন—

"আচ্ছা দিদি! তুমি তো সব সময়ই একটা না একটা সেবার কাজ নিয়ে আছ, তোমার নিজের কখন কি দরকার হয় না হয়—কিসে সুবিধা বা অসুবিধা হচ্ছে না হচ্ছে তা তো কখনও আমাদের বল না?"

দিদি তুলা দিয়া সন্ধ্যারতির প্রদীপ সাজাইতেছিলেন, তাহা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া বলিলেন—"দাদা, না চাইতেই যখন প্রচুর পাচ্ছি তখন চেয়ে ঠকব কেন?"

নগেনদাদা।—না চাইতে প্রচুর পাচ্ছ কি রকম?

দিদি। তা নয়, আপনারাই বলেন কত জন্ম জন্ম তপস্যার ফলে শ্রীগুরুগোবিন্দসেবার অধিকার মেলে। আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে, এমন দুর্লভ সেবাসুখ আমার ভাগ্যে হবে। তারপর পদে পদে অপরাধ ক'রে প্রতিক্ষণেই নিজ অযোগ্যতা দেখাচ্ছি তবু তো তিনি আমাকে বঞ্চিত না ক'রে সেবাসুখদানে কৃতার্থ করছেন। এর চেয়ে আর পাবার বা চাইবার কি আছে? দাদা! আপনিই একদিন কান্তকবির সেই অতুলনীয় গানটি শুনিয়েছিলেন না?

নগেনদাদা।—কোন্ গানটা দিদি?

দিদি।—সেই—

আমি, আকৃতি অধম ব'লেও ত তুমি
কম ক'রে মোরে দাও নি।
আবার, যা দিয়েছ তার অযোগ্য ভাবিয়া
কেড়েও ত কিছু নাও নি॥

নগেনদাদা। সত্যিই দিদি! রজনীকান্ত বড় দামী কথা বলেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাদা ও কুসুমদিদি একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"দাদা! দয়া ক'রে গানটা গেয়ে ফেলুন না?"

দিদি।—বেশ তো দাদা! হোক না।

নগেনদাদা গাহিলেন—

আমি, আকৃতি অধম বলেও ত তুমি
কম ক'রে মোরে দাও নি।
আবার, যা দিয়েছ তার অযোগ্য ভাবিয়া
কেড়েও ত কিছু নাও নি॥
তব আশিস্‌কুসুম ধরি নাই শিরে
পায়ে দলে গেছি চাহি নাই ফিরে
তবু দয়া ক'রে সকলি দিয়েছ
প্রতিদান কিছু চাও নি॥
আমি, ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে
সুধাপান ক'রে মরি গো পিয়াসে
তবু, যাঁহা চাই সকলি পেয়েছি
তুমি ত কিছুই পাও নি॥
মোরে, রাখিতে চাও বাঁধনে আঁটিয়া
শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া
ভাবি ছেড়ে গেছ পিছু চেয়ে দেখি
এক পাও ছেড়ে যাও নি॥

দিদি।—বলুন তো দাদা! এ কি না চাইতে প্রচুর পাওয়া নয়?

নগেনদাদা।—(ছলছল নেত্রে ও গদগদ কণ্ঠে) দিদি! তোমার তুলনা নাই, তোমার তুলনা তুমিই।

মহান্ত বৃন্দাবনদাস প্রসঙ্গ

একবার রথযাত্রা উপলক্ষে অন্যান্য ভক্তগণের সহিত শ্রীধাম নবদ্বীপের ছোট আখড়ার মহান্ত সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া সুকণ্ঠ বৃন্দাবনদাস মহান্ত মহাশয় পুরীতে গিয়াছিলেন। হোড়াপঞ্চমীর দিন অপরাহ্নে মহান্ত মহারাজ ললিতাদিদির সহিত দেখা করিতে ঝাঁঝপিটায় গিয়াছিলেন। দিদি তাঁহাকে দেখিয়া যথাযথ দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া বসাইয়া কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর কথায় কথায় বলিলেন—"ধামেশ্বর আপনাকে দয়া ক'রে পাঠিয়েছেন দাসীকে দর্শনদানে কৃতার্থ করতে, আপনারা তাঁর অন্তরঙ্গ প্রিয়জন, তাঁর কৃপা পাবার আশা করতে পারি না, আপনি একটু কৃপা করবেন।"

মহান্ত।—দিদি! তুমি তো ধামেশ্বরের পরিপূর্ণ ভোগস্থলে আশ্রয় পেয়েছ এবং সেই ভোগসুখ স্মরণ-মননে দিনরাত বুঁদ হ'য়ে আছ. আমি তোমাকে কৃপা করব, না তুমি আমাকে কৃপা ক'রে ছিটেফোঁটা দিয়ে কৃতার্থ করবে?

দিদি।—সে কি? 'প্রেমসিন্ধু গোরারায়' আপনি তো সেই সিন্ধুতে ডুবে কত শত অমূল্য রত্ন তুলে নিজেও ভোগ করছেন, অপরকেও ভোগ করাচ্ছেন।

মহান্ত।—(হাসিতে হাসিতে) দিদি! তোমার কথায় আমার কিশোরদাস মহান্ত মহারাজের একখানা গান মনে প'ড়ে গেল।

দিদি।—মনে যখন প'ড়েই গেল তখন একটু সুর ক'রে গেয়ে রাধাকান্তকে শুনিয়ে দিলে ক্ষতি কি?

মহান্ত মহাশয় কোন আপত্তি না ক'রে আনন্দের সঙ্গেই কণ্ঠ ছাড়িয়া গাহিলেন—

"শুধু ডুব দিলে কি রত্ন মিলে।
সে ভাগ্য যার নাই কপালে।

(সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের দয়া)

সারা জনমভরি ডুব দিছে কেউ কাণাকড়িও নাহি মিলে।
ডুবের মত ডুব দিয়ে কেউ একই ডুবে কাজ সামালে॥
কেউবা ডুবে সাগরজলে রতন মাণিক পাব ব'লে।
কারু ভাগ্যে শামুক গুগ্‌লি কেউ যায় কুম্ভীরের গালে॥
ধনের আশায় প্রাণের আশা কেউ বিসর্জ্জন দেয় সাগরজলে।
কারু ভাগ্যে পরেশ মেলে পথে ব'সে ধূলা খেলে॥
যেমন কর্ম্ম তেমন ফল এ তো ত্রিজগতে সবাই বলে।
'কিশোর' কয় ঠিক ডুবুরী হ'লে সে কর্ম্মকে বামপদে ঠেলে॥"

মহান্ত মহারাজের বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠ, তাতে সময় ও ভাবোপযোগী গান, অনেকেই আসিয়া সেখানে বসিয়াছেন। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতাদের মধ্যে মৃদুগুঞ্জনধ্বনি শুনা গেল। একজন শ্রোতা তো বলিয়াই ফেলিলেন যে, "পরেশ' পেলে আর ভাবনা কি? নিতাই বলে ডঙ্কা মেরে চ'লে যাব।"

মহান্ত মহারাজ একটু কাণে কম শুনিতেন। তিনি দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি বললেন?" দিদি বক্তব্যটি বুঝাইয়া বলিলে মহান্তজী হাসিতে হাসিতে পূর্ব্ববৎ স্বর করিয়া বলিলেন—

"পতিত পাবন নাম শুনেছ মন!
তাতে তোমার ভরসা কিসে!
তুমি যে মন অভিমানের
(উচ্চ) মঞ্চোপরি আছ বসে॥
মুখে পতিত সবাই বলে
কুরঙ্গে মাতঙ্গে চলে
মুখের কথায় জগৎ ভোলে
তিনি করুণা করেন না কপটবেশে॥

মুখে কৃষ্ণ তোমার হলাম
স্ব-সুখে বিষয়ের গোলাম
সাধু সেজে লোক ঠকালাম
সবার মজুরি তার নজরে ভাসে ॥
'কিশোর' কয় ছাড় কপটতা
পতিত বলা তোমার মিথ্যা কথা
সাধুগুরুপদে বিকিয়ে মাথা
প'ড়ে থাক যদি তরবি শেষে ॥"

গান শেষ হইলে দিদি মহান্ত মহারাজের চরণে পড়িয়া বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করুন, সাধুগুরুপদে মাথা বিকিয়ে যেন প'ড়ে থাকতে পারি।" মহান্ত মহারাজ 'কর কি দিদি, কর কি' বলিতে বলিতে দিদির হাত ধরিয়া উঠাইয়া দিলেন।

অনেকদিন পূর্ব্বে সাধক ভুলুয়াবাবার মুখে তাঁহার নিজের লেখা একখানি গানের পদে শুনিয়াছিলাম—

"কাল রঙয়ের চশমা এক চোখে পরেছ
সবুজ সাদা সকলি এক কালোই দেখিছ
কত, তারার মত হীরা ধরি
বল্‌তেছ তামাকের গুল।"

আমাদের অবস্থাও এইমত হইয়াছে। নিজে তো কিছু করিবই না, অপর সাধক মহাত্মাদের আদর্শচরিত্র অনুসরণ করিয়া চলা দূরে থাকুক, খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া নিরয়গামী হইতেছি। কিছু বুঝাইলে বুঝিব না, হিতোপদেশ দিলে তাহার মধ্য হইতেও নানা প্রকার কূটতর্ক বাছিয়া বাহির করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিব। ঐ ভুলুয়াবাবাই এক স্থানে লিখিয়াছেন—

'ভুলুয়া' কয় হাঁড়িমারা কুকুর আমার মন
প্রহারে প্রাণান্ত তবু যেমন সে তেমন

ছাটলে কাটলে লাভ কিছু নাই
স্বভাব আমার কেশের মূল ॥"

মহান্ত মহারাজ উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন দেখিয়া সমবেত ভক্তগণের মধ্য হইতে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২২শ পরিচ্ছেদে আছে—

"জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ ॥"

এ কথার অর্থ কি?

মহান্ত।—এক কথায় এর উত্তর দেওয়া কঠিন; প্রত্যেক কথাটির অর্থ পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা ক'রে দেখলে বুঝা যায়, কেন অঙ্গ নয় বা কেন ভক্তসঙ্গ চায়।

ভক্ত।—যদি অসুবিধা না হয় তা হ'লে একটু আলোচনা করুন।

মহান্ত।—দিদি! তোমাদের সামনে তত্ত্ববিচার করতে ভয় হয়, তোমরা ভিতরের রসাস্বাদনে মগ্ন, আমরা বাইরের শব্দের কচকচি নিয়ে মত্ত।

দিদি।—দৈন্য তো আপনাদের অঙ্গের ভূষণ। প্রসঙ্গ যখন উঠেছে একটু আলোচনা ক'রে প্রশ্নকর্ত্তার প্রাণে শান্তি দিন না?

মহান্ত।—প্রথম জ্ঞান। নানা প্রকার বাদনিরাসপূর্ব্বক তত্ত্ববিচারের নাম জ্ঞান। দ্বিতীয় বৈরাগ্য। নানা প্রকারের দুঃখসহনাভ্যাসপূর্ব্বক বিষয়াভিলাষ ত্যাগের নাম বৈরাগ্য। তৃতীয় ভক্তি। শ্রীভগবানের মধুরাদপি মধুর রূপ, গুণ ও লীলাদি ভাবনাময়ী যে স্বভাব তার নাম ভক্তি। এই ভক্তি স্বভাবতঃই অতিশয় কোমলস্বভাবা। জ্ঞান ও বৈরাগ্য চিত্তকে রসময়ের চিন্তায় আবিষ্ট করে না, কাজেই কঠিন। এখন সহজেই বুঝা যায় যে, কঠিনস্বভাব জ্ঞান ও বৈরাগ্য, কোমলস্বভাবা ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। আচার্য্যপাদগণ বলেছেন—বলবতী শ্রদ্ধা যেখানে, সেখানে নানা বাদ উপস্থিত হয়ে কোন বিক্রমই প্রকাশ করতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানাভ্যাসের অপেক্ষা নেই। আর

শ্রীভগবানের মধুর রূপগুণলীলাদি যাহার মনকে মাতিয়ে রেখেছে তার আর বৈরাগ্যাভ্যাসের কি প্রয়োজন? তাই বলেছেন 'কভু নহে অঙ্গ'। অঙ্গ বলতে এখানে বুঝতে হবে সর্ব্বাবস্থায় বিদ্যমান থাকা।

ভক্ত।—ভক্তিপথের পথিককে কি জ্ঞানবৈরাগ্য কোন সময় কোনরূপ সাহায্যই করতে পারে না?

মহান্ত।—একেবারে যে কোন সাহায্য করে না তা বলা যায় না। ভক্তিপথে প্রবেশের সময় অন্য আবেশ পরিত্যাগের নিমিত্ত ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু কিছু উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ভক্তিতে চিত্ত নিবিষ্ট হ'লে আর জ্ঞান বা বৈরাগ্যের প্রয়োজন আচার্য্যগণ স্বীকার করেন না।

ভক্ত।—আচ্ছা, তার পরের চরণ—'যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ।'

মহান্ত।—যম বলতে—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে বুঝায়। নিয়ম বলতে—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচটিকে বুঝায়। এখন আবার এই দশটির ব্যাখ্যা ধরা যাক।

১। অহিংসা—হিংসার বিপরীত। প্রাণনাশানুকূল ব্যাপার হিংসা, আর তার বিপরীত ব্যাপারই অহিংসা।

২। সত্য—অপীড়াদায়ক যথার্থ ভাষণ।

৩। অস্তেয়—অন্যায়পূর্ব্বক পরবস্তুর অপহরণের নাম স্তেয়, তদ্বিপরীতকেই অস্তেয় বলে।

৪। ব্রহ্মচর্য্য—ভোগগর্ভ স্ত্রীর শ্রবণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিবৃত্তি এই অষ্টবিধ মৈথুন ত্যাগকে ব্রহ্মচর্য্য বলে।

৫। অপরিগ্রহ—বিষয়-স্পৃহা ত্যাগকে এক কথায় অপরিগ্রহ বলে।

৬। শৌচ—বাহ্যশৌচ ও আভ্যন্তরশৌচভেদে শৌচ দ্বিবিধ। মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা যে শৌচ তাকে বাহ্যশৌচ বলে, আর চিত্তের বাসনা ত্যাগকে আভ্যন্তরশৌচ বলে।

৭। সন্তোষ—সকল বিষয়ে চিত্তের পূর্ণতার নাম সন্তোষ।

৮। তপঃ—স্বাধিকারপ্রাপ্ত স্বধর্ম্মকে তপঃ বলে।

৯। স্বাধ্যায়—বেদাদি পাঠকে স্বাধ্যায় বলে।

১০। ঈশ্বর-প্রণিধান—পরমেশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ করাকে ঈশ্বর-প্রণিধান বলে। আদিশব্দ দ্বারা শান্তি বিবেকাদি বুঝায়। বুলে কি না ভ্রমণ করে। এখন এক কথায় অর্থ হ'ল এই যে, যম নিয়ম শান্তি বিবেকাদি গুণসকল দাসের ন্যায় কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে। অর্থাৎ যমনিয়মাদির জন্য কৃষ্ণভক্তের আগ্রহ না থাকলেও তারা বিশেষ আগ্রহসহকারে কৃষ্ণভক্তের নিকট উপস্থিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হ'লে এই সকল গুণ ভক্তে স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায়, তার জন্য তাকে আর পৃথক কোন সাধন বা চেষ্টা করতে হয় না।

বেলা অবসান দেখিয়া মহান্ত মহারাজ বিদায় লইলেন, শ্রোতাগণের মধ্যে কেদারনাথ রায় নামক এক ভক্ত দিদিকে বলিলেন—"ইনি তো চমৎকার ব্যাখ্যা করলেন ?"

দিদি।—উনি যে শ্রীচরিতামৃত-পাঠক। কীর্ত্তনেও যেমন, পাঠেও তেমনি পারদর্শী। আজ সময় হ'ল না, ভবিষ্যতে সুযোগ হ'লে অনেক কথা শুনতে পাবে

দিদির কথা শুনিয়া আশ্রমবাসীগণ একে একে যে যাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে গমন করিলেন। আমরাও গৌরহরিবোল ধ্বনি দিয়া উঠিয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভে পাঠ শুনিতে রওনা হইলাম।

বন্ধুসুন্দর ও হরিসভার কথা

নবদ্বীপ বাগানবাড়ীর মধ্যে নিমতলার ঘরে শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় বসিয়া আছেন। রাত্র অনুমান আটটা। মাঘের শেষ, তবুও শীতের প্রকোপ মন্দ নয়। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। আমরা আট-দশ জন ঘরের

মধ্যে বসিয়া বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখে প্রভু জগদ্বন্ধুর কথা শুনিতেছি। খুব ছোট একটি আলো দেওয়ালের গায়ে জলিতেছে। কথাপ্রসঙ্গে বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"এই নবদ্বীপে হরিসভায় এবং তার পাশে এক ভক্তের বাগানে তাঁর (জগদ্বন্ধুর) কত অলৌকিক লীলাই যে কতভাবে প্রকাশ হয়েছিল তার অন্ত নেই।"

আমাদের কাহাকেও কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বরদাদা বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, গত বছর পুরীতে গিয়ে বন্ধুসুন্দরের কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁরা আমাদের বড় নিতাইদাদার সঙ্গে দেখা করতে হরিদাস ঠাকুরের মঠে এসেছিলেন। সেখানে শ্যামদাদা, মধুদাদা, নিতাইদাদা তিনজনেই ছিলেন, আমিও ভাগ্যক্রমে তথায় উপস্থিত ছিলাম। নিতাইদাদা সেদিন হরিসভার অনেক কাহিনীই তাঁদের শুনিয়েছিলেন।

বাবাজী।—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, নিতাইয়ের কাছেই বন্ধুর অনেক কিছু আছে। হাতের লেখা পদের খাতা, মন্ত্রের কাগজ, প্রসাদী কাপড়, ফুলের মালা তো আছেই, তা ছাড়া এমন একটি জিনিস আছে যা অমূল্য সম্পদজ্ঞানে নিতাই এখনও বুকে আঁকড়ে ব'সে আছে।

আমরা সকলেই "কি জিনিস" বলিয়া উঠিলে বাবাজী মহাশয় খুব মৃদুস্বরে ভাবপ্রেমগদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"একটি ছোট আতরের শিশির গায়ে বন্ধুর বুড়ো আঙ্গুলের সুস্পষ্ট ছাপ।"

সকলে 'গৌর হরিবোল' ধ্বনি করিয়া উঠিল। বাবাজী মহাশয় মাথা নীচু করিয়া আছেন, কিছু সময় টস্ টস্ করিয়া কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়িল, দুই-একবার 'হায় হায় হায়' ধ্বনির সঙ্গে দেহে কম্প ও পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হইয়া স্থির হইলেন।

আমার সঙ্গে ভবানীপুরের প্রবীণ ভক্ত বিপিনবিহারী নাথ ছিলেন, তিনি আমাকে বলিলেন—"কাকা! আপনি বাবাজী মহাশয়কে জগদ্বন্ধু প্রভুর সম্বন্ধে কিছু বলতে বলুন।" আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—"যজ্ঞেশ্বরদাদা তো

পুরী থেকে সব শুনে এসেছেন, আপনি কৃপা ক'রে সে মধুর প্রসঙ্গ আমাদের একটু শোনান না ?"

বাবাজী।—কত শুনবে দীনেশ! সে অনন্ত অপার লীলার আমিই বা কতটুকু জানি? আচ্ছা, তোমাদের যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন হরিসভায় তাঁর প্রথম প্রকাশের বিষয় একটু আলোচনা করি।

একদিন হরিসভায় ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় একজন কে হনহন ক'রে এসে শ্রীমন্দিরের পাশের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। সেখানে যারা উপস্থিত ছিল সকলেই দেখল, কিন্তু কেউ কিছু বুঝতেও পারল না বা কিছু বলতেও পারল না।

কিছু সময় পরে শিতিকণ্ঠ ঠাকুর ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে খুব ডাকাডাকি আরম্ভ করলেন। কিন্তু কেউ কোন সাড়াও দিল না বা দরজাও খুলল না। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর ভিতর থেকে খুব মৃদুকণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল—"কণ্ঠ! আমি তোর বন্ধু।"

"বন্ধুই হও, আর যে-ই হও দরজা খোল, নইলে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখব তুমি কোন্ বন্ধু!" এই বলে শিতিকণ্ঠ যেমন কপাটে ধাক্কা দিল অমনি দরজা খুলে গেল। ভিতরে মুখ বাড়িয়ে না জানি কি দেখে 'বাপ রে' ব'লে চীৎকার ক'রে সেইখানেই প'ড়ে গেল। পিতা মথুরানাথের কাণে শব্দটা গেল কিন্তু তিনি ঠিক করতে পারলেন না যে কোন্ দিক থেকে শব্দটা এল। ইতস্ততঃ দেখতে লাগলেন। দু-একবার 'কে' 'কে' ব'লে ডাকলেনও।

এদিকে শিতিকণ্ঠ প'ড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যের সেই পুরুষটি ধীরে ধীরে তাঁকে উঠিয়ে হাত ধ'রে ভিতরে নিয়ে শান্ত ক'রে বললেন—"তুই কি আমাকে ভুলে গিয়েছিস কণ্ঠ? আমি যে তোর চিরদিনের বন্ধু রে। একটু চিন্তা ক'রে দেখ্‌, দেখি আমার কথা কিছু মনে হয় কি-না ?"

একটু পরেই শিতিকণ্ঠ ছুটে বাইরে এসে মহাপ্রভুর মন্দিরে ঢুকে শ্রীমূর্ত্তির দিকে চেয়ে কি যেন দেখল। চোখের জলে তার বুক ভেসে যেতে

লাগল। পাগলের মত আবার ছুটে গিয়ে সেই ঘরে ঢুকে পুরুষটিকে বললে—"আপনি যে সব কথা বললেন আমার তো এখন তা কিছুই স্মরণ হচ্ছে না; তবে নিজগুণে দয়া ক'রে যখন উপস্থিত হয়েছেন এবং বন্ধু ব'লে পরিচয় দিচ্ছেন তখন কিছুদিন এখানে থাকতে হবে।"

যাঁকে লক্ষ্য ক'রে শিতিকণ্ঠ এ কথা বললে, তিনি একটু মৃদু হেসে বললেন—"ওরে কণ্ঠ! আমি তো অনেকদিন হ'তেই এখানে আছি, আর এখন থাকবও।"

শিতিকণ্ঠ শুনে একটু বিস্মিতভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে যেন কিছু বলতে যাচ্ছে কিন্তু বলতে পাচ্ছে না; তার এই ভাব দেখে উনি বললেন—"আমার পরিচয় জানতে চাচ্ছ? আমার নাম শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য।"

শিতিকণ্ঠ চম্‌কে উঠ্‌ল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই নেহাল ক্ষ্যাপার কথা যা বাবার কাছে শুনেছিল তাই মনে প'ড়ে গেল। ক্ষ্যাপা তো একদিন বাবাকে বলেছিল—'যিনি এখানে এসে প্রকট হ'য়ে কীর্ত্তনলীলা প্রকাশ করবেন তাঁর নাম জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য।' শিতিকণ্ঠ মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁকে প্রণাম ক'রে, সেই ঘরেই তাঁর থাকবার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

পিতা মথুরানাথ জিজ্ঞাসা করলেও শিতিকণ্ঠ রাত্রে আর তাঁকে কিছু বললেন না। পরদিন সমস্ত ব'লে এখন কি ভাবে কি করা যায় তাই চিন্তা করতে লাগলেন। মথুরানাথ পুত্রের কথা শুনে ধীরে ধীরে সেই ঘরের দিকে গেলেন, কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে দু-একবার ডেকেই চ'লে এলেন। ভাবলেন, আছেন যখন তখন পরে দেখা করব।

সমস্ত দিন গেল। সন্ধ্যারতির পর জগদ্বন্ধু ঘর থেকে বের হ'য়ে মহাপ্রভুর মন্দিরের সামনের বারান্দায় জানলায় দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছিলেন। শিতিকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বাবাকে ডেকে দেখালেন। মথুরানাথও খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে ঢাকা—কেবল মুখখানি খোলা। মুখের দিকে চাইতেই চোখে চোখ পড়ল, অমনি একটু মৃদু হেসে মধুর স্বরে বললেন—"পদরত্ন! এই দেখ আমি এসেছি।"

আর কোন কথা নেই, পদরত্নও কেমন যেন বিহ্বলভাবে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরেই মৃদু হেসে বন্ধু নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

এই ঘটনার পাঁচ-সাত দিন পরেই ছ-সাতটি ভক্ত এসে বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হলেন, আমিও সেই সঙ্গে ছিলাম। আমরা হরিসভাতেই থাকি, সেইখানেই প্রসাদ পাই এবং সকলে মিলে বন্ধুসুন্দরের সুন্দর সুন্দর গান ও পদাবলী কীর্ত্তন করি। শিতিকণ্ঠ পণ্ডিতের আনন্দ আর ধরে না—নিজেকে কীর্ত্তনানন্দের স্রোতে একেবারে ভাসিয়ে দিলেন।

এখন শিতিকণ্ঠের এমন অবস্থা যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা পূজা এবং আগন্তুক ভক্তবৃন্দের দেখাশুনা ছাড়া সংসারের কোন কাজেই তার কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না। পদরত্ন মহাশয় বৃদ্ধ হয়েছেন তাতে আবার শ্বাসরোগগ্রস্ত; তবু তিনি একাই সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্মের সামঞ্জস্য ক'রে নেন, পুত্রের আনন্দে কোনরূপ বাধা পড়ে এই জন্য তাকে কিছু বলেন না।

বহুদিন পূর্ব্বে নেহাল ক্ষ্যাপা পদরত্নকে যা যা বলে গিয়েছিলেন একে একে সবই হ'য়ে যাচ্ছে। নিজে প্রত্যক্ষও করছেন, তবু পুত্র শিতিকণ্ঠের সংসার-ঔদাসীন্য দেখে কেমন যেন চঞ্চল হ'য়ে পড়লেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথা-প্রসঙ্গে এক এক সময় দুঃখ ক'রে বলেনও যে, তিনটি পুত্রের দুটি তো বাল্যকালেই বিদায় নিয়েছে, এখন শিবরাত্রের সলতে সবেধন নীলমণি এই শিতিকণ্ঠ, এরও যেরূপ ভাবগতিক দেখছি তাতে এও কখন কি ক'রে বসবে কে জানে!

অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ারাণীর যে কি প্রভাব তা সহজে বোঝা যায় না। পদরত্ন নিজ গুরুদেব নেহাল ক্ষ্যাপার কথাও যেন দিন দিন ভুলতে বসেছেন। নিজের আঙিনায় প্রভুর প্রকট লীলা প্রত্যক্ষ করছেন, তবুও মায়ারাণী কোথায় যেন কোন্ সূত্রে বোধশক্তি লোপ করিয়ে দিয়ে লীলাসুখ ভোগ করতে দিচ্ছে না। ধন্য মা মায়া তোমার খেলা!

জগদ্বন্ধু স্বগণ-সঙ্গে কয়েকদিন হরিসভায় থেকে একদিন হঠাৎ কাকেও কিছু

না ব'লে কলিকাতায় চ'লে গেলেন। আমি তার পরও কয়েকদিন ছিলাম, কিন্তু সে সুখময়-সঙ্গলাভে বঞ্চিত হ'য়ে শিতিকণ্ঠ ঠাকুর বিশেষ কাতর হ'য়ে পড়লেন। কোন কিছুতেই মন বসছে না, সব সময়ই কেমন যেন একটা বিমর্ষ ভাব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার কার্য্যেও পূর্ব্বের মত আগ্রহ নেই। কর্ত্তব্যের খাতিরে করতে হয় তাই করেন।

পিতা মথুরানাথ চঞ্চল হলেন, শিতিকণ্ঠের বাল্যবন্ধুদের একদিন ডেকে এনে সব কথা তাদের খুলে বললেন। তারা একদিন সময়মত শিতিকণ্ঠকে বসিয়ে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিয়ে শেষে বললেন—"তুমি তো ভাই! তাঁর কাছে যাও নি, তিনিই নিজের ইচ্ছায় এসে তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন; তা ছাড়া তুমিই বলছ যে, তিনি বলেছেন—'আমি এইখানেই আছি এবং থাকবও।' তবে আর এর জন্য চিন্তা করছ কেন? দু-চারদিন প্রত্যক্ষভাবে তাকে পাচ্ছ না এই যা দুঃখ। তা ভাই মহাপ্রভুর ইচ্ছায় আবার পাবে।" বন্ধুদের মধ্যে একজন বললেন—"তিনি তোমাকে কিছু দিয়ে গেছেন কি?"

বন্ধুদের কথায় শিতিকণ্ঠ একটু মনটাকে স্থির করবার চেষ্টায় ছিলেন, এমন সময় এই কথা শুনে তিনি জগদ্বন্ধুসুন্দরের শ্রীহস্তলিখিত কয়েকটি পদ দেখিয়ে বললেন—"যাবার কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি নিজ হাতে এগুলো লিখে আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—'এইগুলি নিজে কীর্ত্তন করবে এবং ভক্তগণকে দিয়ে কীর্ত্তন করাবে।' এই ব'লে খাতাখানি বন্ধুদের হাতে দিলেন। বন্ধুরা সমস্বরে ব'লে উঠলেন—"তবে আর কি, ঐ সব পদ-পদাবলীর মধ্যেই তো তাঁর মধুময় সঙ্গ পাবে, তুমি স্থির হও ভাই।"

সেইদিন থেকে শিতিকণ্ঠের অন্যমনস্ক ভাব অনেকটা ক'মে গেল। পূর্ব্বের ন্যায় মহাপ্রভুর সেবা-পূজায় মন দিলেন এবং সঙ্গীদের নিয়ে রোজ সকাল সন্ধ্যায় বন্ধুর পদ-পদাবলী কীর্ত্তন করতে আরম্ভ করলেন। এই সব দেখেশুনে বৃদ্ধ পদরত্ন মহাশয়ের হতাশ প্রাণে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হ'ল। তিনিও পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যেক কার্য্যে পুত্র শিতিকণ্ঠের সহযোগিতা করতে লাগলেন।

এর অল্প কিছুদিন পরেই পদরত্ন মহাশয় নিত্যধাম গমন করেন। কাজেই পিতার অবর্ত্তমানে দেবসেবা, শিষ্যবর্গের দেখাশুনা এবং সংসারের যাবতীয় ভারই শিতিকণ্ঠের উপর পড়ল। তিনিও ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সব দেখাশুনা করতে লাগলেন।

বন্ধুসুন্দর এর পরও সঙ্গীদের নিয়ে কয়েকবার হরিসভায় এসেছেন এবং শিতিকণ্ঠকে মহাপ্রভুর সেবায় ও নামকীর্ত্তনে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। বন্ধুসুন্দরের কৃপালাভ ক'রে শিতিকণ্ঠের দেহে এমন সব সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ হ'ত যে, লোকে দেখে স্তম্ভিত হ'ত। আমরাও দেখেছি কীর্ত্তনে ভাবাবেশে তার প্রতি লোমকূপ দিয়ে রক্তোদ্‌গম হয়েছে।

এই সব দেখেশুনে নানা দেশবিদেশ থেকে বহু লোক এসে শিতিকণ্ঠের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়। হরিসভা এই সময় সর্ব্বদাই পাঠ ও কীর্ত্তনরোলে মুখরিত থাকত। 'স্মৃতিরত্ন' শিতিকণ্ঠ এই সময় হ'তেই 'হরিসভার গোস্বামী' নামে জনসমাজে পরিচিত হন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাবাজী মহাশয় চুপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বদিকের কপাটটি খুলিয়া গেল। আমরা সকলেই বিস্মিতভাবে সেদিকে চাহিয়া দেখি, একখানি ধূসর রংয়ের গায়ের কাপড় আপাদমস্তক চাপা দিয়া আমাদের পূজনীয়া ললিতাদিদি সশরীরে সেখানে উপস্থিত। অকস্মাৎ দিদির আগমনে ভক্তবৃন্দের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই-চারজন উঠিলেন। পূজনীয় বাবাজী মহাশয় দিদির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এ কি, এত ঠাণ্ডায় এমন সময় এখানে ?"

দিদি।—আমি অনেকক্ষণই এসেছি। ঐ জানলার ধারে ব'সে তোমাদের কথা শুনছিলাম। কথা শেষ হ'তে একটা কথা তোমাকে বলতে এসেছি।

বাবাজী।—এমন কি কথা দিদি! যে, এখনই না বললে নয় ?

দিদি।—হরিসভার প্রসঙ্গ হচ্ছিল কিনা, তাই হরিসভার সঙ্গে তোমাদের

শ্রীগুরুদেবেরও যে খুব একটা সম্বন্ধ ছিল; হরিসভার গোঁসাইকে নিয়ে যে সব লীলাখেলা তিনি করেছেন, প্রভুর সেবার সুব্যবস্থা করতে তাঁকে যে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল সে সবগুলিও তোমার ভক্তদের একটু শুনিয়ে দিও। অবশ্য এখনই বলছি না, সময়মত শুনিয়ে দিও।

বাবাজী।—সে সব প্রসঙ্গ তো আমার চেয়ে দিদি তোমার ভালমত জানা আছে। বল তো এক সময় সকলে মিলে আমরা তোমার কাছে গিয়ে ব'সে ব'সে শুনব।

দিদি।—আমি আর কতটুকু জানি! আমাকে তো ভাঁড়ার ছেড়ে দিয়ে তোমরা এই মঠের মধ্যেই আটকে রেখে দিয়েছ। আচ্ছা, যদি তাই-ই তোমাদের ইচ্ছে হয় তবে সুযোগমত আদেশ করবে, আমি সব সময়ই প্রস্তুত।

বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বরদাদা ও হাওড়ার নরসিংদাদা দুইজনেই বলিলেন—"আবার কখন হবে, আমরাও কে কোথায় থাকব তার ঠিক নেই; যদি অসুবিধা না হয় তা হ'লে এখনই বলুন না দিদি?"

বাবাজী।—বেশ তো দিদি! এখনও তো অভিসার-কীর্ত্তনের সময় হয় নি, এখনই কিছু বল না?

দিদিকে একটা স্বতন্ত্র আসন দেওয়া হইলে তিনি দণ্ডবৎ করিয়া আসনে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—

"শ্রীগুরুদেব বলতেন—'আমি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান করতে বসলে হরিসভার শ্রীমূর্ত্তি এসে আমার সম্মুখবর্ত্তী হন। ঐ নবনটবরবপু গৌরকিশোরই আমার নয়ন, মন, প্রাণ চুরি করেছে। শত চেষ্টা ক'রেও আমি আর অন্য ভাবের মূর্ত্তির কাছে বিক্রি হ'তে পারলাম না।'

শিতিকণ্ঠ গোস্বামী প্রভুরও শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপর অগাধ বিশ্বাস। প্রভুর সঙ্গে তাঁর ব্যবহার দেখলে তাঁকে মহাপ্রভুর একজন অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত বা নিত্যপরিকর ব'লে মনে হ'ত। নিত্য সেবায় বা নৈমিত্তিক কোন উৎসবপর্ব্ব উপলক্ষে কোন বিষয়ের অসুবিধা বা অসংস্থান হ'লে তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখীন

হ'য়ে বলতেন—'যদি এই কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন না হয় তবে তোমার ঐ ঊর্দ্ধে-তোলা ডান হাতখানি টেনে নামিয়ে দেব। যদি ভাল চাও তবে সকল বিষয় দেখেশুনে সুব্যবস্থা কর। তোমার জন্যই হরিসভা, আর তাতে ক'রেই আমাদের যা কিছু; নইলে আমাদের কে জানত?' ইত্যাদি

ভক্তের বিশুদ্ধ ভাবের আবদার প্রভু রক্ষা না ক'রে পারতেন না; সকল কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হ'ত। এই সময়ই হরিসভায় চাঁদের হাট বসেছিল। জগদ্বন্ধু প্রভু, বিজয়কৃষ্ণ প্রভু, তোমাদের বড়বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি সকলেই না জানি কিসের আকর্ষণে এসে হরিসভায় জুটতেন। তোমাদের বড়বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে শিতিকণ্ঠ গোস্বামী প্রভুর ভ্রাতৃভাব ছিল। গোঁসাইজী এঁকে 'দাদা' ব'লে ডাকতেন আর ইনি গোঁসাইজীকে ঠিক ছোট ভাইটির মতই স্নেহ করতেন।

এক সময় মহাপ্রভুর সেবা এবং অন্যান্য কয়েকটি বৈষয়িক কারণে বিশেষ অর্থাভাব হওয়ায় গোঁসাইজী বড়বাবাজী মহাশয়ের কাছে এসে বললেন—'দাদা! আর আমি সেবা চালাতে পাচ্ছি না, আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন।' বড়বাবাজী মহাশয় অভয় দিয়ে বললেন—'ভাই! যাঁর সেবা তিনিই চালাচ্ছেন আর চালাবেনও, তুমি আমি তো নিমিত্তমাত্র। আচ্ছা, কি ভাবের ব্যবস্থা হ'লে তুমি সন্তুষ্টচিত্তে পরমানন্দ মনে সেবা করতে পার অকপটে আমায় বল—নিতাইচাঁদের ইচ্ছা হ'লে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

গোঁসাই।—আমার সব ভার অর্থাৎ মহাপ্রভুর সেবা এবং তাঁর সংসারের যাবতীয় ভার আপনি গ্রহণ করুন, আমি যেমন আপনার ছোট ভাই সেইভাবে আপনার আদেশ পালন ক'রে যাব।

বাবাজী।—বেশ ভাই! নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় আজ থেকে তোমার সম্পূর্ণ ভার আমি নিলাম, তুমি নিশ্চিন্তমনে মহাপ্রভুর সেবা কর।

বলা বাহুল্য, সেইদিন থেকে বড়বাবাজী মহাশয় হরিসভার জন্য দৈনিক পনেরো-ষোল টাকা খরচ করতে লাগলেন। তা ছাড়া যখন যেমন প্রয়োজন হ'ত জানতে পারলেই তা দিয়ে দিতেন।

গোঁসাইজীর মাতাঠাকুরাণীকে বড়বাবাজী মহাশয় বলেছিলেন—'মা! আমি আপনার সন্তান, আজ থেকে মহাপ্রভুর সংসারের যাবতীয় ভার আমার উপর দিন। শিতুকে কিছু বলবেন না, সন্তানজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে সব আমার কাছে বলবেন।'

বাৎসল্যময়ী মা বড়বাবাজী মহাশয়ের মাথায় হাত দিয়া বললেন—'বাবা! তুমি দীর্ঘজীবী হও। শিতু আমার নিরাশ্রয় ছিল, তুমি ওর আশ্রয়স্থল হ'লে। দুই ভাই মিলে পরমানন্দে গৌরের সেবা কর। বলব কি বাবা! গৌর আমার বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। আদরের ধন অমূল্য রতন তোমাদের দু ভাইয়ের সেবা গ্রহণ ক'রে তোমাদের ধন্য করুন। শিতু গৌরের ভার তোমার উপর দিয়ে ভালই করেছে।'

মায়ের কথা শুনে তোমাদের বড় বাবাজী মহাশয় বলেছিলেন—'মা! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমাদের গৌরে প্রীতি থাকে। বেশী আর কি বলব! যতদিন তিনি কৃপা ক'রে রাখবেন ততদিন সেবার জন্যে শিতুকে কোন ভাবনা করতে হবে না।' এইভাবে মাকে বহু কথা ব'লে বিশেষভাবে নিজে দেখেশুনে সেবার সুব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন।

সেবা গ্রহণের পরদিন থেকে ভেট তুলে দিয়ে বলেছিলেন—'নবদ্বীপে যে যে ঠাকুরবাড়ীতে ভেট আছে তোমরা তাদের বার্ষিক ভেট বাবদে জমার হিসাব আন, আমি ঝোলা কাঁধে ক'রে ভিক্ষা ক'রে তোমাদের সে অভাব মোচন করব। তবু তোমরা ঠাকুরদর্শনে কাকেও বঞ্চিত ক'রো না, সকলকে আশ মিটিয়ে দর্শন করতে দাও।'

কিছুদিন এই নির্দ্দেশমত চলে। না জানি কোন্ দুর্দ্দৈবে আবার গোঁসাইজী ভেট প্রবর্ত্তন করলেন। বাবাজী মহাশয় জানতে পেরে 'এও নিতাইচাঁদের এক ইঙ্গিত' এই ব'লে কিছুদিন নবদ্বীপের বাইরে বাইরে নাম প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

নবদ্বীপে ফিরে এসে পথেই গোঁসাইজীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি—'দাদা! এতদিন কোথায় ছিলেন?' ব'লে কাছে আসতেই হাসিমুখে কুশলাদি জিজ্ঞাসা ক'রে তাঁর নির্দ্দেশিত পন্থা ত্যাগ ক'রে লোভবশতঃ পুনরায় ভেট প্রবর্ত্তন করায় যে দুঃখ হয়েছে তা স্পষ্ট প্রকাশ না ক'রে নিজে দৈন্যসূচক উপদেশবাক্যে বললেন—"ভাই—

"অর্থলাভ এই আশে কপট বৈষ্ণব বেশে
ভ্রমিয়া বেড়াই স্থানে স্থানে।
লব্ধ পদ প্রতিষ্ঠায় আশা করি অনিবার
ভজনের করি মাত্র ভানে॥"

ভাই! মনে করেছিলাম মহাপ্রভু দাসকে অঙ্গীকার করেছেন এখন দেখছি তিনি রাখতে চাইলেও আমি আত্মসুখ, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠার আশা হৃদয় থেকে দূর করতে পারি নি। এভাবে কপটতা নিয়ে সেবা করব কি ক'রে? তুমি ভাই যা ভাল বুঝেছ তাই করেছ আর এখন তাই করবেও, তাই-ই কর। আমি যখন বলেছি তখন হরিসভায় বাঁধাই রইলাম।

অতঃপর মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি সেবার কি ভাবে কি হবে জিজ্ঞাসা করায় মাকে বলেছিলেন—'চিন্তা কি মা; তোমার শিতু দ্বারাই সব হবে। কত লক্ষপতি তোমার শিতুর পায়ে এসে লোটাবে। আমি তো রইলামই। আমার যে হবে সেও কখন হরিসভাকে ত্যাগ করতে পারবে না। শিতুর জন্য তুমি ভেবো না মা।'

এই ভাবের বহু প্রসঙ্গ শিতিকণ্ঠ গোঁসাইর সঙ্গে বাবাজী মহাশয় করেছিলেন। সবগুলি সব সময় স্মরণও হয় না আবার স্মরণ হ'লে গুছিয়ে বলবার মত শক্তিও আমার নেই। আজ যতটুকু কৃপা ক'রে বলালেন তাই তোমাদের শোনালুম, আবার যদি কোনদিন সুযোগ সুবিধা হয় আলোচনা করব। এ সব লীলাকথা আলোচনা করা তো আত্মশোধনের জন্যে। তবে অযোগ্যতা বশতঃ আলোচনা করতে গিয়ে ক্রমভঙ্গ, ঘটনার অসংলগ্নতা বা অপ্রাসঙ্গিক যে সব বর্ণন

হয় সে জন্য শ্রোতাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা চাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। জয় গুরু! জয় গুরু!"

দিদি দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়া গেলেন। ভক্তগণও রাত্রি অধিক হইয়াছে বাবাজী মহাশয়ের কষ্ট হইবে বলিয়া বিদায় লইলেন। যজ্ঞেশ্বরদাদা দুটি হাত তুলিয়া "শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল" বলিয়া উঠিলেন, উপস্থিত আমারও সকলে দাদার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া একে একে বিদায় লইলাম।

সেবায় বঞ্চিত ক'রো না

পূর্ব্বে বলিয়াছি এখনও বলি, ললিতাদিদির অবিচলা ভক্তিনিষ্ঠার সহিত শ্রীগুরুসেবার কথা সম্যক বর্ণনা তো দূরের কথা, কণামাত্র বর্ণনের ভাষাও আমার জানা নাই। তবু কেন বলিবার বাসনা প্রাণে জাগে তাহা তিনিই জানেন। 'চরিতসুধা' পাঠ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিলাম দিদি লিখিয়াছেন—

"জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি মুঞি কি পারি বর্ণিতে।
এক কণা স্পর্শ করি আপনা শোধিতে॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষীগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
তৈছে আত্ম পবিত্রিতে যে কিছু লিখিনু।
সাগরের মাঝে যেন এক কণা ছুঁইনু॥"

শ্রীসনাতন দাস শ্রীগুরুবন্দনায় বলিয়াছেন—

"গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি কভু না করিবে।"

এই মহাজনবাক্য ললিতাদিদির জীবনে কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে প্রাতপালিত হইয়াছে তাহা যাঁহারা দিদির নবদ্বীপ সমাজবাড়ীর বড়বাবাজী

মহাশয়ের সমাজসেবা দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারিবেন।

"গুরুরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া।" অবিচারে গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিবে। এই শাস্ত্রবাক্য কি ভাবে দিদি পালন করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু বর্ণনা পূর্ব্বে করিয়াছি। আদেশ পালন করিতে যাইয়া কত অসহনীয় ক্লেশ তাঁহাকে হাসিমুখে সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষদর্শী অনেকে এখনও বর্ত্তমান আছেন। দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় গিয়াছে, তবু সেবাকার্য্যে কেহ দিদিকে বিরত হইতে দেখে নাই। বিরক্তি তো আসেই নাই বরং সেবানন্দে উৎসাহ আতিশয্যে নাম স্মরণ করিতে করিতে হাসিমুখে একটার পর একটা সেবা, নিপুণ—নিখুঁতভাবে করিয়া চলিয়াছেন। কেহ তাঁহার করণীয় কোন সেবার কার্য্য করিয়া আনুকূল্য করিতে আসিলে করযোড়ে কাতরভাবে বলিতেন—"বহুজন্ম সাধনায়ও যে সেবা পাওয়া যায় না যদি কৃপাময় কৃপা ক'রে তা দাসীকে দিয়েছেন আপনারা আমায় তা থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

কষ্ট হইতেছে বলিলে দিদি হাসিমুখে বলিতেন—

"কি আর কষ্ট আমার হচ্ছে ভাই! একটু সেবা পাবার জন্যে যাঁরা কঠোর ত্যাগ, অসহনীয় ক্লেশ, অভাবনীয় সাধনা ক'রে গেছেন তাঁদের কথা একবার চিন্তা ক'রে দেখ দেখি? সে তুলনায় তো আমার পরম সুখই হচ্ছে।" ইত্যাদি

মোটকথা দিদি নিজেকে সেবাকার্য্য হইতে এক মুহূর্ত্তও বিচ্ছিন্ন রাখিতে চাহিতেন না। পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে আমরা দেখিয়াছি—নিজেদের পালার সময় তো ঠাকুরের সেবা করিতেনই, অপর প্রতিবেশীর পালাতেও নিজে উপযাচক হইয়া সেবা চাহিয়া লইতেন এবং করিতেন। আমরা করি না, তাই জানি না এতে কত সুখ। একদিন এক সাধু বলিয়াছিলেন—

"করতাল বাজিয়ে বৃন্দাদেবীর সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায়—'রাধাকৃষ্ণসেবা পাব এই অভিলাষী। কুঞ্জসেবা দিয়ে মোরে কর রাধাদাসী।' ইত্যাদি পদ

গান কর, আর ভাগ্যে যদি একটু সেবা জোটে তাতে পিছিয়ে যাও কেন ?"

এ 'কেন'র উত্তর নাই। বলিতে হইলে এইমাত্র বলা যায় যে, দুর্দ্দৈব।

ভিখারী ও ব্রহ্মচারী

ঝাঁঝপিটা মঠে আজ বড়বাবাজী মহাশয় উপস্থিত নাই। বৈকালে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের আঙ্গিনায় সকলে বসিয়া সেবার চাউল ডাইল পরিষ্কার করিতেছেন। মুখে অন্য কথা নাই—হয় শ্রীবৃন্দাবনলীলা নয়তো শ্রীজগন্নাথদেবের লীলাকথা আলোচনা হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ললিতাদিদি বড়বাবাজী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। একবার বলিয়াই ফেলিলেন—"আজ ছ-দিন, কোথায় কি ভাবে কি করছেন কে জানে ?"

দয়ালদাদা।—ভাবছ কেন দিদি! গোবিন্দদাদা সঙ্গে আছেন। তিনি সব ঠিক ক'রে দেবেন। তাঁর সেবার কাছে আমরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

কুসুমদিদি।—তা তো আছেন, কিন্তু আমাদের যে মন মানছে না।

ললিতাদিদি।—হুঁ, মুখে তো অনেক কিছুই বলি কিন্তু কাজে করতে পারি কই ?

এই সময় একটি অল্পবয়স্ক বঙ্গদেশী ভিখারী মঠের দরজায় দাঁড়াইয়া একতারা বাজাইয়া গান ধরিল—

আমি, সকলার চেয়ে বেশী চাই মনে
মুখে বলি শুধু চাই না চাই না।
তোমারে ঢেকেছি আমির আড়ালে
তাই ত তোমারে পাই না॥
যশের কাঙ্গালী পরি চীরবাস
সম্মান লালসে বলি তব দাস

এ কি অহমিকা এ কি পরিহাস
কেন, সরল সুপথে যাই না ॥
নিজের উপর নাহি অধিকার
আমারে চালায় প্রভুত্ব আমার
ভেঙে দাও প্রভু গর্ব্ব অহঙ্কার
যেন, তোমা ছাড়া কিছু চাই না ॥

ভিখারীর কণ্ঠস্বরটি অতি মিষ্ট; সকলেই উৎকর্ণ হইয়া গানটি শুনিতেছিলেন। শেষ হইতেই দিদি ভিখারীকে ডাকিয়া ভিতরে বসাইলেন এবং বলিলেন—"বাবা! আর একখানি গাও তো?" ভিখারী তাহার একতারাটি ঠিক করিয়া লইয়া গান ধরিল—

যদি ডুব দিয়েছ আর ভেসো না জান না কত যাতনা।
ভাসলে পরে আছাড় মারে তরঙ্গের কত তাড়না ॥
ডুবেছ তো ডুবতে থাক ঘুচিয়ে ফেলে লেনাদেনা।
ভুলো না ডুবুরীর মানা মনে রেখো ঠিক নিশানা ॥
কপট-কলসী ত্যজে বুকে শ্রদ্ধা-শিলা বেঁধে নে না।
অনায়াসে তল পাবি মন! ঘুচে যাবে আনাগোনা ॥
'কিশোর' কয় যদি ডুব দিলি মন! ডুবুরীরে সঙ্গে নে না।
সে, ময়লা মাটি বেছে দিবে পরিপাটি খাঁটি সোনা ॥

দিদি নিজ হাতে চাউল ও কিছু তরকারী দিয়া "আবার এস" বলিয়া ভিখারীকে বিদায় দিলেন। ভিখারী তো চলিয়া গেল। ইঁহাদের আলোচনার ধারাও ফিরিয়া গেল।

দিদি বলিতেছেন—"সকলের চেয়ে বেশী চাই মনে, মুখে বলি শুধু—চাই না চাই না।" দিদির সঙ্গীরাও বলিতেছেন—"সত্যিই দিদি! মুখে বলি শুধু চাই না চাই না।" কিছু সময় এই ভাবের আলোচনা করিয়া যে যাঁহার নির্দ্দিষ্ট সেবার কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার পাঁচ-সাত দিন পরে একজন ব্রহ্মচারীর আগমনে মঠে খুব হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। সে দিন বড়বাবাজী মহাশয় মঠে উপস্থিত ছিলেন। বহু সময় তাঁহার সহিত ইঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মচারীজী কিছুতেই নিজের কোন পরিচয় দিলেন না, কেবল শ্রীগুরু মহারাজের আদেশে আসিয়াছেন এই কথাটি বলিলেন। পরে পুরীবাসী জনৈক বাঙালী ভদ্রলোকের নিকট হইতে জানা গিয়াছিল যে, ইনি দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের শিষ্য এবং ইঁহার পূর্ব্বাশ্রম হাওড়া জেলার জনাই নামক গ্রামের সন্নিকটে ছিল।

এই ব্রহ্মচারী মহাশয় দিদির বেশভূষা দেখিয়া বৈষ্ণব বাবাজীর মঠে স্ত্রীলোক থাকে কেন ভাবিয়া প্রথমে একটু চমকিত হইয়াছিলেন। শেষে পরিচয় পাইয়া যে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার দিদির প্রতি উপদেশাত্মক বাক্যগুলি হইতেই বুঝা যায়।

বড়বাবাজী মহাশয়ের আদেশে দিদি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে প্রণাম করিলে তিনি দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সখীজী! কিছু করতে হবে, শুধু ফাঁকা ফাঁকা ডাকে সাড়া পাওয়া যায় না। একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে নিয়ে সেই সম্বন্ধের ধারা ধ'রে ভজন করতে হবে। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে প্রেম। মীরাবাঈ বলেছেন না—'বিনা প্রেমসে নঁহি মিলে নন্দলালা?'

গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন না—'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।' জিনিসের ভিতর কিছু নেই। ভক্তি ক'রে দিলে তিনি ফল, জল, গাছের ফুল পাতা পর্য্যন্ত গ্রহণ ক'রে থাকেন। শুধু গ্রহণ করা নয় এর পরের চরণেই বলেছেন—'তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মন। অশ্নামি—আমি আহার ক'রে থাকি। আর ভক্তি না থাকলে বিবিধ মূল্যবান উপচারের দিকেও তিনি ফিরে চান না। দুর্য্যোধনের রাজোপচার ফেলে বিদুরের ঘরে খুদ খাওয়া যার স্বভাব, তাকে প্রেম না দিলে বশ করবে কি প্রকারে? তাই তো মীরাবাঈ বলেছেন—

"সাধন করনা চাহিয়ে মনবাঁ ভজন করনা চাই।
প্রেম লাগান চাহিয়ে মনবাঁ প্রীত করনা চাই ॥"

ইনি একখানি ছাপা কাগজ দিদিকে দিয়াছিলেন। আমি যে সময় উপাসনা সঙ্গীত ও স্তোত্রপদ্ধতি লইয়া মেজদাদার সহিত পুরীতে গিয়াছিলাম তখন দিদির নিকট হইতে তাহা লিখিয়া লইয়াছিলাম। আজ প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রদত্ত উপদেশ কয়টি পাঠকগণকে উপহার দিলাম। কাগজখানিতে লেখা ছিল—

"মিত্রের মিত্রতা জানি বিপদ সময়।
বীরের বীরত্ব দেখি যুদ্ধে যবে জয় ॥
জগতের অনিত্যতা করিয়া স্মরণ।
পুণ্যের সঞ্চয়ে দাও দিবানিশি মন ॥
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি যে কার্য্য করিবে।
অবশ্যই সেই কার্য্যে সুফল পাইবে ॥
খালি হাতে আসিয়াছ খালি হাতে যাবে।
তবে কেন এত মায়া বিষয়-বৈভবে ॥
বিশ্ব যদি যায় চলি কাঁদিতে কাঁদিতে।
আমি শুধু রব একা কর্ত্তব্য সাধিতে ॥
ধন জন মান যশ কত কি যে চাই।
একবারও ভাবি না যে সব মাটি ছাই ॥
মনে যদি ইচ্ছা থাকে করিতে ভজন।
করেন গোবিন্দ তাহা অবশ্য পূরণ ॥
ভোগসুখতরে শুধু নহে এ জীবন।
কঠোর কর্ত্তব্য আছে করিতে পালন ॥
যতদিন আছ ভবে কর তাঁর কাজ।
তাতে যদি না হয় সিদ্ধি আছে কিবা লাজ ॥

কায়মনোবাক্য দ্বারা দুঃখ যদি না দাও পরে।
এক বাক্যে যশ তোমার গাইবে সবে এ সংসারে॥
গুণ পরাক্রম হীনরূপে কিবা ফল।
বিপদে বিমুখ মিত্রে কিবা লাভ বল॥
আত্মসিদ্ধি বাঞ্ছা যদি কর অহরহঃ।
তবে সদা কর বাস সাধুজন সহ॥
ক্ষান্ত হও পাপকর্ম্ম করি পরিত্যাগ।
দেব দ্বিজ গুরু প্রতি রাখ অনুরাগ॥
আলাপ পণ্ডিত সহ অলুব্ধে মিত্রতা।
উত্তমের সহবাস করিবে সর্ব্বথা॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ বশে রয় যার।
গৃহে থাকি সাধনায় সিদ্ধি হয় তার॥
বিষয়ানুরাগী যদি বনে করে বাস।
ত্যজিতে না পারে তবু বিভোগের আশ॥
সদা হিতকর্ম্মী যেই বান্ধব সে জন।
পিতা তিনি সদা যিনি করেন পোষণ॥
মিত্র তিনি যিনি হন বিশ্বাসভাজন।
স্বদেশ সে দেশ যথা জীবিকা অর্জ্জন॥
গুণবান ধার্ম্মিকের জনম সফল।
গুণ-কর্ম্মে হীন তার জীবন বিফল॥"

সেদিন ব্রহ্মচারী মহাশয় চলিয়া গেলেন। বড়বাবাজী মহাশয় দিদিকে এবং অন্যান্য মঠবাসীকে বলিলেন—"বয়েস বেশী না হ'লেও কৃপা পেয়েছে, নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে গুরু-উপদেশমত কাজ করছে। তাই দেখ কেমন সাত্ত্বিক তেজ চোখে মুখে ফুটে বেরুচ্ছে। উনি যে কটা কথা ললিতাকে বললেন বড় খাঁটি কথা, সকলে মনে রাখবে।"

অপরাধীকে কৃপা

পুরীধামনিবাসী নিত্যধামগত কমলাকান্ত রায় মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা শরৎকুমারী দেবীর নিকট শুনিয়াছি—ললিতাদিদি যখন সখীবেশে ঝাঁঝপেটা মঠে অবস্থান করিতেন তখন মধ্যে মধ্যে বড়বাবাজী মহাশয় ইঁহাদের বাড়ীতে আসিতেন। কখনও কীর্ত্তনসম্প্রদায়-সহ, কখনও বা ললিতাদিদি, কুসুমদিদি প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া। আশ্চর্য্য ব্যাপার, যখনই ইঁহারা ওখানে যাইতেন তখনই একটি লাল ও একটি কালো রংয়ের কুকুর ইঁহাদের সঙ্গে যাইত এবং যেখানে উঁহারা বসিতেন তাহার দুই পাশে স্থির ধীরভাবে বসিয়া থাকিত। পুনরায় মঠে ফিরিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আসিত।

ঐ শরৎকুমারী কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন—"ললিতা-মা এক-একদিন কীর্ত্তনে আবেশভরে নৃত্য করতেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। শ্রীশ্রীরাসলীলা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রাচীন পদকর্ত্তাগণ বলেছেন—"না নড়িবে গণ্ডমুণ্ড না নড়িবে কেশ।" ললিতা মায়ের নৃত্যতেও যেন সেই দৃশ্যটি প্রকট হ'ত; ললিতা মা নৃত্য করতেন, যখন যে অঙ্গ কাঁপাতেন সেই অঙ্গ ছাড়া অন্য অঙ্গ যেন জানতেই পারত না।" আক্ষেপ করিয়া শরৎকুমারী আমাকে বলিলেন—"দাদা! যা দেখেছি তা বর্ণনা করবার ভাষা নেই। আর যে তেমনটি জীবনে দেখতে পাব সে আশাও করি না। প্রাতঃস্মরণীয় আমার শ্বশুর মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে বড়বাবাজী মহাশয় এবং ললিতা-মার অনেক অলৌকিক লীলাখেলাই আমাদের বাড়ীতে দেখেছি। তখন আমি বারো-তেরো বৎসর বয়সের কুলবধূ। সকল কথা এখন মনেও পড়ে না, তবে আলোচনা-প্রসঙ্গে এক এক সময় সে অপূর্ব্ব চিত্র হৃদয়ে উদয় হয়ে ব্যাকুল করে।" ইত্যাদি।

এই শরৎকুমারীর শ্বশুর শাশুড়ী বড়বাবাজী মহাশয়ের এত প্রিয় ছিলেন যে, কখনও কোন কিছুর প্রয়োজন হইলে ইঁহারা যে কোন রকমেই হউক তাহা পূরণ

করিতেন। শুনিয়াছি—কমলাকান্তবাবুর অনুপস্থিতিতে একবার তাঁহার স্ত্রী গোপনে পুত্রবধূর গহনা একজনের নিকট রাখিয়া টাকা আনিয়া তখনকার মত বড়বাবাজী মহাশয়কে দিয়া তাঁহার প্রয়োজন মিটাইয়াছিলেন। কমলাকান্তবাবু বাড়ী আসিয়া শুনিয়া স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—"তুমি যে আমার অপেক্ষায় না থেকে এই ভাবে বাবাজী মহাশয়ের সেবার আনুকূল্য করেছ তাতে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। যদি শুনতাম আমি উপস্থিত নেই ব'লে তুমি প্রয়োজন-মত কোন ব্যবস্থা কর নি, তা হ'লে সত্য সত্যই আমি মর্ম্মাহত হতাম।" পাঠকগণ! একটু ভাবিয়া দেখুন কতদূর নিষ্ঠা, কতদূর স্বার্থশূন্য মনোভাব, কতদূর নির্ভরতা হৃদয়ে থাকিলে এইরূপ কার্য্যের সমর্থন করিতে পারা যায়।

গৌরাঙ্গ সাউ নামে এক ভক্তের বাড়ীতে বড়বাবাজী মহাশয় যাইতেন। অনেক সময় অনেক অলৌকিক ঘটনা সেখানে ঘটিয়াছে। সকলগুলি প্রকাশ-যোগ্য নয়, তথাপি পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য একদিনের একটা ঘটনা এখানে বলি।—

ললিতাদিদি ও কুসুমদিদি প্রভৃতি মঠের কয়েকজন এবং বাহিরের গৃহস্থ ভক্ত কয়েকজনকে সঙ্গে করিয়া একদিন অপরাহ্নে বড়বাবাজী মহাশয় গৌরাঙ্গ-বাবুর বাড়ী গিয়াছেন। অন্যান্য বহু ভক্তের মধ্যে শরৎকুমারী ও তাঁহার শাশুড়ী অর্থাৎ কমলাকান্তবাবুর স্ত্রীও ছিলেন। সেদিন সকলে মিলিত হইয়া বড়বাবাজী মহাশয়কে নানাবিধ ফুলের সাজে সাজাইয়া চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল, পুলিস বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং গৌরাঙ্গবাবুর সহিত কি সব কথা বলিতেছে, বোধ হয় বাড়ী খানাতল্লাসি করিবে। বাবাজী মহাশয় সকলকে স্থির থাকিতে বলিয়া বলিলেন—"তোমরা মনে মনে শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণপূজা ও আয়ানের কালীমূর্ত্তি দর্শন-লীলা চিন্তা কর এবং মুখে নাম করিতে থাক। আর অন্ততঃ পাঁচ মিনিট কাল সকলে চোখ বুজে থাক, কোন ভয় বা কোন চিন্তা নেই।"

বড়বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত সকলে চোখ বুজিয়া নাম করিতে থাকিলে কিছু সময় পরেই গৌরাঙ্গবাবু ঘরে ঢুকিয়া বাবাজী মহাশয়কে সেখানে না দেখিতে পাইয়া সদর দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। পুলিসের লোক চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিয়া কোথাও বাবাজী মহাশয়কে না পাইয়া চলিয়া গেল। শেষে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, ঠিক ঐ সময় বড়বাবাজী মহাশয় ঝাঁঝপেটা মঠে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সন্ধ্যারতি দর্শন করিতেছিলেন। যখন গৌরাঙ্গবাবুর বাড়ী হইতে লোক ঝাঁঝপেটায় গিয়াছিল তখন বাবাজী মহাশয় ভক্তগণ-সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেছেন।

পরে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, কোন দুষ্টপ্রকৃতি লোকের পরামর্শে বাবাজী মহাশয়কে লাঞ্ছনা করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। যাহা হউক, যাঁহার পরামর্শে এই ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, দুই-তিন দিন পরেই তিনি সপরিবারে বাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজ কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এই সব ঘটনা বর্ণনা করিয়া আমরা ইঁহাদের কোন অলৌকিকত্ব প্রমাণ করিতেছি না। ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং কায়মনোবাক্যে একান্ত নির্ভরশীল ভক্তকে শ্রীভগবান কি ভাবে রক্ষা করেন তাহারই একটু আভাস দিতেছি মাত্র।

দিদির চৈতন্যদাসের কৃপালাভ

বড়বাবাজী মহাশয়ের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং আদিসঙ্গী শ্রীচৈতন্যদাস সম্বন্ধে আমরা দিদির পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে বিশেষ কিছু বলিবার সুযোগ পাই নাই। বিস্তৃত বিবরণ 'চরিতসুধা' গ্রন্থে দেখিবেন। আমরা এখানে 'চরিতসুধা'র পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংক্ষেপে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

যখন বড়বাবাজী মহাশয় গুরপ গ্রামে নাম-প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় চৈতন্যদাস অসুস্থ হইয়া বাবাজী মহাশয়ের আদেশে তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া

পুরীতে যান। সেখানে নবদ্বীপদাদা, বড় হরিশবাবুর পুরাতন ডাকঘরের পিছনের একটি কুঠরিতে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া দিদিকে রোগীর যাবতীয় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। দিদি তখনও সখীবেশ ধারণ করেন নাই, জয়গোপাল নামেই সকলের নিকট পরিচিত। যাহা হউক, সেবাগতপ্রাণ জয়গোপাল নবদ্বীপদাদার আদেশে প্রাণপণে চৈতন্যদাসের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

চৈতন্যদাসের ভজন ছিল, নিজেকে সর্ব্বক্ষণের জন্য দাসী মনে করিয়া গোপীভাবে উপাসনা করা। গুরুগতপ্রাণ চৈতন্যদাস গুরুসেবাকেই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া লইয়াছিলেন। আমরা প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রতি রামচন্দ্র কবিরাজের যেরূপ নিষ্ঠা ও সেবাভাবাদির বর্ণন দেখিতে পাই, চৈতন্যদাসের ভিতরেও ঠিক সেইরূপ ভাব ও গুরুনিষ্ঠা লক্ষ্য হইত। শয়নে, স্বপনে, আহারে, ব্যবহারে, আলাপে, আলোচনায় চৈতন্যদাসের মুখে শ্রীগুরুতত্ত্বমহিমা ছাড়া অন্য কিছু কেহ শুনিতে পাইত না। এ হেন গুরুগতপ্রাণ চৈতন্যদাসের সেবা করিয়া দিদি যে অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী কালে তাহাই নানাভাবে পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হইয়া বৈষ্ণব-জগতে এক মহান্ মহীরুহরূপে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছে। বলিতে কি—চৈতন্যদাসের ভাব হইতেই বড়বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গীগণ-মধ্যে গোপীভাবের উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা।

অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় একদিন চৈতন্যদাস দিদির পূর্ব্বাশ্রমের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন—"জয়গোপাল! আমার তো শেষ সময় উপস্থিত, আমি প্রভুর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা জানাই যে, অচিরেই তুমি প্রভুর কৃপায় স্বপ্নেরও অগোচর এক অপ্রাকৃত বস্তু লাভ ক'রে ধন্য হও। শ্রীগুরুদেবের করুণায় সে বস্তুর কিছু কিছু অনুভব আমি পেয়েছি ব'লে মনে হয়। আর অযাচিত কৃপাকারী পরমদয়াল করুণাসিন্ধু শ্রীগুরুদেব নিজগুণে কৃপা ক'রে আমাকে যে-জাতীয় ভাবরত্নটুকু দিয়েছেন আমি আজ অকপটে তা তোমাকে দান

করলাম। তুমি এই মধুরাদপি মধুর ভাবধনে ধনী হ'য়ে কিছুকাল প্রাকৃত জগতে প্রকট থেকে অপ্রাকৃত চিন্ময় রাজ্যের পরম সুখময় বস্তু আস্বাদনে ধন্য হও।"

চৈতন্যদাস এইভাবে দিদিকে কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়া একবার শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন প্রার্থনা করিলেন। নবদ্বীপদাদা বড়বাবাজী মহাশয়কে চৈতন্যদাসের অবস্থা এবং আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন; কিন্তু তিনি কোন উত্তর করিলেন না। শেষে দিদি নবদ্বীপদাদার আদেশে যাইয়া কৌশল করিয়া বাবাজী মহাশয়কে চৈতন্যদাসের নিকট উপস্থিত করাইলে নবদ্বীপদাদা চৈতন্যদাসকে বলিলেন—"চৈতন্য! চেয়ে দেখ দাদা এসেছেন।" চৈতন্যদাস কোন কথা না বলিয়া চোখের ভঙ্গীতে বাবাজী মহাশয়কে নিজের সম্মুখে অর্থাৎ পায়ের দিকে দাঁড়াইতে বলিলেন। আজ ভক্তের কাছে বাবাজী মহাশয়ের কোনরূপ স্বতন্ত্রতা খাটিল না। তিনি বিনা আপত্তিতে চৈতন্যদাসের পায়ের দিকে গিয়া দাঁড়াইলেন। এবার চৈতন্যদাস বিস্ফারিত নয়নে বাবাজী মহাশয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া এক দৃষ্টে শ্রীমুখকমলপানে তাকাইয়া রহিলেন।

এদিকে নবদ্বীপদাদা বাবাজী মহাশয়ের দক্ষিণ চরণখানি চৈতন্যদাসের বুকের উপর তুলিয়া দিতে গিয়া দেখেন, চাদরের নীচে কয়েকখানা কাগজ রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি উহা সরাইয়া বুকের উপর শ্রীচরণখানি ধরিয়া দিয়া কাগজগুলি খুলিয়া দেখেন, উহার একখানিতে শ্রীগুরুবন্দনা ও গুরুপ্রণাম লেখা আর কয়েকখানিতে লক্ষ গুরু নাম লেখা। চৈতন্যদাস এতক্ষণে তাহার চির অভিলষিত মহামূল্য নিধি শ্রীগুরুচরণ বুকে ধরিয়া সজলনয়নে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া চির বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

বাবাজী মহাশয় এতক্ষণ নিশ্চল নিস্পন্দ স্থির ধীরভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন; চৈতন্যদাসের বিদায়-প্রার্থনা শুনিয়া ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যেন প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। দুইটি চোখের জলে মুখ বুক ভাসাইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন—

"চৈতন্য রে! আমাকে ত্যাগ ক'রে তুই চির-শান্তিময় রাজ্যে গমন করছিস, এতে আমি আর কি বলব? তোর জন্মজন্মার্জ্জিত যত কিছু পাপ তাপ অপরাধ আছে সমস্তই আমি গ্রহণ করলাম, তুই নির্ম্মল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে পরম দয়াল নিতাইচাঁদের গণে গণ্য হ'য়ে তোর অভিলষিতভাবে প্রার্থিত বস্তু আস্বাদন কর্।"

এ সময়কার দৃশ্য বর্ণনাতীত—অপূর্ব্ব। 'চরিতসুধা'র ভাষায় বলি, "চৈতন্যদাসের আকর্ণবিস্তৃত নয়নভৃঙ্গযুগল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখকমল-মধুপানে বিভোর। নিজ হৃদ্‌পদ্মে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণপদ্ম রাখিয়া প্রেমানন্দ-সাগরে যেন হাবুডুবু খাইতেছে। মুখখানি মৃদু মধুর হাসিমাখা এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ। এক একবার চমকিয়া চমকিয়া যেন মনুষ্যজীবনের শেষ প্রার্থিত বস্তুলাভ—সাধনের চরম অবস্থা প্রাপ্তি—পরমকরুণ শ্রীগুরুদেবের করুণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সর্ব্বসাধারণকে অবগত করাইতেছে।"

দিদি চৈতন্যদাসের কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীগুরুদেবের নাম শুনাইতেছেন। বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ভক্তগণ সঙ্গে রামদাদা কীর্ত্তন লইয়া পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন। কি অপরূপ দৃশ্য! একবার চৈতন্যদাসের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল, মুখের মৃদু হাসি অধিকতর উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইল। দৃষ্টি স্থির। আর শ্বাস নাই—দেহে কোনরূপ স্পন্দন নাই—সব স্থির। পাঠকগণ একবার দৃশ্যটি সম্মুখে ধরিয়া বলুন, আমরা ইহাকে কি বলিব? 'চরিতসুধা'য় বর্ণিত হইয়াছে—"ইহা মৃত্যু না নবজীবন প্রাপ্তি? দেহত্যাগ না দেহধারণ? অভাব না ভাবে প্রবেশ? অপ্রকট না নির্ব্বিকল্প সমাধি? অশান্তি না চিরশান্তি? নিরানন্দ না পরমানন্দ? উপেক্ষণীয় না বাঞ্ছনীয়? অন্তিম কাল না প্রথমকাল? অশুচি না পরমপবিত্র?" ইত্যাদি

এই চৈতন্যদাসের অকপট কৃপাই যে দিদির ভবিষ্যৎজীবনের উন্নততর স্তরপ্রাপ্তির প্রধানতম অবলম্বন তাহা ললিতাদিদির সেবাপরিপাটি দেখিয়া

বড়বাবাজী মহাশয়ও প্রসঙ্গক্রমে বহুবার বহুভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"মহতের কৃপাশীর্ব্বাদ কি ব্যর্থ হইতে পারে? আমরা লইতেও জানি না, পাইলেও রাখিতে পারি না, তাহাতে কি দাতার কিছু হয়? আমাদেরই দুর্দ্দৈব বুঝিতে হইবে।"

বড়বাবাজী মহাশয় চৈতন্যদাসের বিরহে সাশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"কৃপাময় নিতাইচাঁদ আমাকে এমন নিষ্ঠাবান অনুভবী ভক্তের সঙ্গ দিয়ে আবার কেন যে একে অঙ্গীকার করতঃ আমাকে সে আনন্দময় সঙ্গ হ'তে বঞ্চিত করলেন তিনিই জানেন।"

চৈতন্যদাসের অপ্রকটে দিদিও অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে একখানি পদ রচিত হইয়াছিল, পাঠকগণের অবগতির জন্য 'চরিত-সুধা' হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"শ্রীচৈতন্যদাস গৌরভক্ত শিরোমণি।
গোপীভাবাবেশে মগ্ন দিবস রজনী॥
কি মোহিনী মূর্ত্তিখানি কিবা ভাবাবেশ।
হৃদয়ে ছিল না যাঁর কভু হিংসাদ্বেষ॥
গুরুনিষ্ঠা গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস।
গুরু সর্ব্বেশ্বর জগৎগুরুর প্রকাশ॥
গুরু সেবাগত প্রাণ বৈষ্ণবেতে রতি।
গুরুধ্যান গুরুজ্ঞান গুরুগতি মুক্তি॥
অকপট সরলতা আছিল যাঁহার।
জগজনে ছিল যাঁর মিষ্ট ব্যবহার॥
অন্তরে বাহিরে যাঁর ছিল গোপীভাব।
সেবাপ্রীতি প্রেমোল্লাস উদার স্বভাব॥
একমুখে তাঁর গুণ কে বর্ণিতে পারে।
শ্রীগুরু করুণা যাঁরে সে জানিবে তাঁরে॥

কৃপা করি নিতাইচাঁদ দিয়াছিলে সঙ্গ।
আকর্ষিয়া তারে মোদের কৈলে সঙ্গ ভঙ্গ॥
আশীর্ব্বাদ কর ভাই! চরণে প্রণতি।
তোমার প্রভুর পদে থাকে যেন মতি॥"

শাসনছলে দিদিকে পরীক্ষা

একবার মঠে কোনও ভাগ্যবান ভক্তের আগ্রহে বিশেষভাবে ভোগরাগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গোবিন্দদাদা সেবারে দিদির সহিত ভোগ প্রস্তুতের কার্য্যে বিশেষভাবে যোগ দিয়াছিলেন। বেলা একটা হইতে ভক্তগণের পঙ্গৎ আরম্ভ হয়। প্রায় সাড়ে তিন শত ভক্তের প্রসাদ পাওয়া হইয়া গিয়াছে। মঠের সেবক-সেবিকারাও একে একে সকলে প্রসাদ পাইয়াছেন, একমাত্র ললিতাদিদিই প্রসাদ পাইতে বাকী আছেন। এদিকে দেখা গেল, কোন প্রসাদই অবশিষ্ট নাই। বাবাজী মহাশয় বিশ্রাম করিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই মঠের প্রসাদী স্থান পরিষ্কার করা প্রয়োজন, তাই সকলে একে একে সেই কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

সমস্ত দিন অনাহার, তাহার উপর পরিশ্রমও যথেষ্ট হইয়াছে, দিদি যেন একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষুধাও পাইয়াছে। বাবাজী মহাশয় বিশ্রামে আছেন, কাজেই এই সময় কিছু গ্রহণ করিবার জন্য দিদি মঠের পার্শ্ববর্ত্তী উড়িয়া মাতার নিকট হইতে কিছু মুড়ি আনিয়া উহাতে একটু তেল দিতে গিয়া দেখিলেন ভাণ্ডার একেবারে শূন্য। এক ফোঁটা তেল বা এক টুকরা কাঁচালঙ্কাও নাই, তখন দিদি পোলাং তেল একটু লইয়া তাহা দিয়া মুড়ি মাখিয়া উহাতে তুলসী দিয়া একগাল মুখে দিলেন আর একগাল হাতে লইয়া মুখে দিতে যাইবেন, এমন সময় দিদির বৌমী আরম্ভ হইল। মনে হইল অন্নপ্রাশনের অন্নও বুঝি

উঠিয়া যায়। পোলাং তেল জগন্নাথদেবের মশালে বা প্রদীপেই জলে, উহা যে খাওয়া যায় না দিদি তখন পর্য্যন্ত তাহা জানিতেন না।

এদিকে বাবাজী মহাশয় বিশ্রামান্তে উঠিয়া বহির্দ্দেশে গিয়াছিলেন, আসিয়া হাতে মাটি মাখিতে মাখিতে সেবকের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন—"একটু ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, দুটি মুড়ি খেলে হয়, কিছু নেই, শেষে একটু পোলাং তেল মেখে খেলেও হয়।"

যে সেবক ভক্ত হাতে জল দিতেছিলেন, বাবাজী মহাশয়ের কথা তিনি শুনিলেন; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এবং কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ ভাবে বলিতেছেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দিদি বৌমী করিতে করিতে বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহার কাণে যেমন ঐ কথা গেল, অমনি ছুটিয়া আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণপ্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। বড়বাবাজী মহাশয় একটু শ্লেষভরেই দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"পবিত্র গোরসে পাত্র পূর্ণ ক'রে এক ফোঁটা চোনা দিয়ে সব নষ্ট ক'রে দিলি? বিনা অনুমতিতে পোড়া পেটের জন্যে আজ এরূপ স্বতন্ত্রতা দেখালি কেন? সেদিন সারা দিনরাত অনুমতি পাস নি ব'লে অধরামৃতও তুলে রেখে দিয়েছিলি, সে কথা কি মনে নেই? যা, ঐ সব বৈষ্ণবসেবার পাত্র হ'তে কণিকা কণিকা তুলে যা হবে তাই খেয়ে জল খা গিয়ে।"

দিদির প্রতি এইভাবের শাসন যখন তখন চলিত। দিদিও বিনা প্রতিবাদে শাসনকে কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের অবস্থা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিব, আমরা কোথায়। শ্রীগুরুদেব আমাদের অন্যায় দেখিলে অন্য শাসন তো দূরের কথা, দুইটা কড়া কথা বলিলেও আমরা গুরুসেবা ছাড়িয়া স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে কুণ্ঠিত হই না, আবার বড় গলা করিয়া বলিয়া থাকি 'গুরুদেবের এটা ভুল হইয়াছে, ঠিক বুঝিতে পারেন নাই।' হায়, হায়, কি দুর্দ্দৈব!

দিদির নবজীবন প্রাপ্তি

আজ ঝাঁঝপিটা মঠে সকলেই ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিয়া কার্য্য করিতেছে। কিন্তু কাহারও মুখে হাসি নাই বা কোন কথা নাই। যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় যে যার কাজ করিয়া যাইতেছে মাত্র। বাহিরের ভক্তবৃন্দ যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহারাও যেন নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। মলিন মুখে বসিয়া বসিয়া মধ্যে মধ্যে 'হা নিতাই, কি করিলে' 'হা প্রভু' 'হা জগন্নাথ' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। নগেনদাদা, গোবিন্দদাদার কোলের উপর পড়িয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া "দাদা, কি হ'ল! হায় হায়, দাদা কি হ'ল" বলিয়া শিশুর ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছেন। ধৈর্য্য-শৈল গোবিন্দদাদারও আজ চোখের কোণে জল দেখা দিয়াছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে বলি—

এক সময় ঝাঁজপিটা মঠে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মূর্ত্তি বৈষ্ণব-সঙ্গে বড়বাবাজী মহাশয় অবস্থান করিতেছিলেন। নিতাইচাঁদের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন, একই সময় আশ্রমবাসী প্রায় সকলেই জ্বরে পড়িলেন। দয়ালদাদা, কুঞ্জদাদা ও মধুদাদা প্রভৃতি চার-পাঁচ মূর্ত্তি ছাড়া সকলেই বিশেষ অসুস্থ। ইহারা চার-পাঁচ জনে অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন বলিয়া ইহাদেরই উপর কোন রকমে ঠাকুরসেবা ও রোগীদের শুশ্রূষার ভার দেওয়া হইয়াছে। বড়বাবাজী মহাশয়ের শরীরও বিশেষ ভাল নয়। তবে ললিতাদিদির অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। দশ-বারো দিনের মধ্যে অন্যান্য অনেকেই সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু ললিতাদিদির অবস্থা দিন দিনই খারাপের দিকে চলিয়াছে। উত্থানশক্তিরহিত, কেহ ধরিয়া উঠাইলেও অমনি দাঁতি লাগিয়া অজ্ঞান হইয়া যান, এত দুর্ব্বল।

মঠের পিছন দিকের দোতলা ঘরের নীচের তলায় দিদিকে রাখা হইয়াছে। সেবা-শুশ্রূষার জন্য মধুদাদাই অধিকাংশ সময় দিদির নিকট থাকেন। এক দিকে

রোগের উৎপীড়ন, অন্যদিকে দিদির মনে সর্ব্বদাই হা-হুতাশ ভাব। এ হা-হুতাশ রোগযন্ত্রণার জন্য নয়; সেবাগতপ্রাণ ললিতাদিদি সেবায় বঞ্চিত হইয়া আছেন, তাহাতে আবার বড়বাবাজী মহাশয়ের অসুস্থ শরীর, তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজন ঠিক ঠিক পাইতেছেন কি না, এবং নিজের জন্য বৈষ্ণবগণ নানা প্রকারে কষ্ট পাইতেছেন—এই সকল কারণেই দিদির সর্ব্বদা হা-হুতাশ।

দিন দিন দিদির স্বাস্থ্যের অবস্থা অবনতির দিকেই যাইতেছে দেখিয়া কয়েক জন আশ্রমবাসী একদিন বাবাজী মহাশয়কে গিয়া বলিলেন—"ললিতাদিদির অবস্থা ক্রমে ক্রমে যেরূপ দাঁড়াচ্ছে তাতে মনে হয় এ যাত্রা তিনি রক্ষা পান কি না। আপনি যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।"

বাবাজী মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন—"দেখ, যাদের সেবাগত প্রাণ, তারা সেবাসুখে বঞ্চিত হ'য়ে এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে চায় না, কাজেই সে অবস্থায় তাঁদের বাঁচা অপেক্ষা ম'রে যাওয়াই সুখকর। আমার মতে তোমরা সকলে ওঁকে আশীর্ব্বাদ কর, যাতে ওর এই কষ্টের জীবন পরিত্যাগ হয়ে যায়।"

ভক্ত।—আপনি একটু কৃপা করুন, তা হ'লেই দিদি ভাল হয়ে যাবেন। আর একটা কথা—সেবা করবার এমন প্রবল বাসনা দিদির প্রাণে রয়েছে যদি সে আশা অপূর্ণ থাকে তবে যে চিরদিন পদে পদে আমাদের সে কথা স্মরণ হ'য়ে কষ্ট হবে। আপনি একটু কৃপা করুন।

এইভাবে অন্যান্য ভক্তগণও নিজ নিজ ধারণানুযায়ী ভাবে দিদির আরোগ্য-কামনায় বাবাজী মহাশয়কে প্রার্থনা জানাইলেন। এদিকে দিদি ঘন ঘন অজ্ঞান হইয়া যাইতেছেন। এক-একবার এমন হয় যে, মনে হয় আর বুঝি জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু লীলাময়ের কি ইচ্ছা জানি না, আবার দিদি চৈতন্যলাভ করিয়া "জয় গুরু" বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বাবাজী মহাশয় মধ্যে মধ্যে দূর হইতে এক-একবার দর্শন দিয়া যান মাত্র।

এইভাবে দিনের পর দিন যাইতেছে। একদিন সকাল হইতে দিদি

কাঁদিতেছেন। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কিছু না বলিয়া কেবল ডান হাতটি কপালে ঠেকাইয়া চোখের জলে মুখ বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে থাকেন। মধুদাদা দিদির মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদি! আজ অমনভাবে কাঁদছ কেন? শরীর কি খুব খারাপ বোধ হচ্ছে?" দিদি মধুদাদার হাতখানি তুইটি হাতে ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"ভাই! কি আর বলব? আমি এই সেবার অযোগ্য দেহটাকে ছাড়তে যত চেষ্টা করছি, আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে ছাড়া অনুকূলে কেউই সাড়া দিচ্ছে না। মনে করেছিলাম নবদ্বীপদাদা বোধহয় কৃপা ক'রে দাসীকে তাঁর কাছে টেনে নিবেন; কিন্তু অভাগীর ভাগ্যে তাও হ'ল না। এখন এই সেবায় বঞ্চিত ভাঙা দেহভার আর কতদিন বইতে হবে কে জানে? এই কাঠের পুতুলটার জন্যে তোমরাই বা ভাই আর কত কষ্ট ভোগ করবে?"

মধুদাদা।—কেন দিদি, তুমি তুঃখ করছ? তোমার সেবা ক'রে সত্যি-সত্যিই আমরা কোন কষ্ট অনুভব করি না। তবে আমাদের সুখ শান্তি তখনই হবে, যখন তুমি সুস্থ হ'য়ে উঠবে। আচ্ছা দিদি! নবদ্বীপদাদার কথা কি বলছিলে?

দিদি।—ভাই! গত রাত্রে তোমরা চ'লে যাবার পর মনে মনে চিন্তা করছি যে, নবদ্বীপদাদা প্রকটকালে একটু কিছু হ'লে ছুটে এসে কত সান্ত্বনা দিতেন আর এখন এ অবস্থায় একবার ফিরেও চাইছেন না? আমি তো শত সহস্র অপরাধে অপরাধিনী, কিন্তু তিনি কি স্বপ্নেও একবার এসে আমায় দেখা দিতে পারেন না? এইরূপ চিন্তা করতে করতে একটু তন্দ্রার মত এসেছে আর দেখি নবদ্বীপদাদা আমার মাথার কাছে বসে বুকের উপর হাত দিয়ে আমার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলছেন—"কি রে, তোর হ'ল কি?"

আমি তখন ঠিক প্রত্যক্ষের মত আবদার ক'রে বললাম—"দাদা! তুমি তো বেশ চ'লে গেলে, আমার যে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চল।"

দাদা সেই মত হাসতে হাসতেই বললেন—"সে কি রে, তোর যে এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। তোকে এখন কিছুদিন এই জগতে থেকে সেগুলো সেরে নিতে হবে। তারপর তোকে এখন নিয়ে গেলে দাদার (বড়বাবাজী মহাশয়ের) যে খুব কষ্ট হবে! তুই এখন কিছুদিন দাদার সেবা কর্, তারপর যা হয় হবে।"

আমি পূর্ব্বের মতই আবদার ক'রে বললাম—"হ্যাঁ, আমি তো তোমার দাদার সেবা ক'রে উলটে দিচ্ছি; আমি এখন নিজেই সকলকার কাছে সেবা গ্রহণ করছি। আমার দ্বারা তাঁর সুখ হওয়া দূরের কথা, বরং প্রতিনিয়ত দুঃখই হচ্ছে। তুমি আমায় কৃপা কর। আর এভাবে সকলের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে ইচ্ছে নেই। আমায় তোমার কাছে নিয়ে চল।

এইভাবে অনেক কিছু বললাম, কিন্তু কিছুতেই দাদা রাজী হলেন না। শেষে বললেন—'আচ্ছা, এখন তোর যা ইচ্ছে কর্, পরে দেখা যাবে।' এই ভাবের কথা হ'তে হ'তেই আমার তন্দ্রা ভেঙে গেল।

এখন ভাই, তোমাদের সকলের কাছেই আমি বিদায় চাই। তোমরা আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যা কিছু অপরাধ করেছি সব ক্ষমা ক'রে আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মান্তরে যোগ্য দেহ লাভ ক'রে তোমাদের প্রভুর সেবা করবার সৌভাগ্য পাই। আজ আমার শেষ দিন, তোমরা শেষ সময় আমাকে একটু নাম শুনাও। আর একটি প্রার্থনা— কৃপাময় প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন পাবার জন্য প্রাণ যেন কেমন ব্যাকুল হচ্ছে। তিনি কি শেষ সময় এই অদৃশ্যা অস্পৃশ্যা চণ্ডালিনীকে একবার দর্শন দিয়ে বাসনা পূর্ণ করবেন?"

মধুদাদার কাছে দিদি এইভাবে সকল কথা বলিতেছেন আর অঝোরে কাঁদিতেছেন; মধুদাদাও কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবগদগদকণ্ঠে গাহিতেছেন— "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই দিদির অবস্থা খারাপের দিকে যাইতেছে। শরীর যেন ক্রমেই অবশ হইয়া আসিতেছে। এদিকে বাবাজী মহাশয়

শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া গলি-রাস্তায় একেবারে দিদি যে ঘরে আছেন সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মধুদাদা বাবাজী মহাশয়কে দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। দিদির উঠিবার বা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিবার শক্তি নাই। মনে মনে কি বলিলেন, তিনিই জানেন। বাহির হইতে দেখা গেল, দিদির দুইটি চক্ষু দিয়া অবিরত ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। বাবাজী মহাশয় কিছু সময় দিদির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া "আচ্ছা, নিতাইচাঁদের ইচ্ছা" শুধু এই কয়টি কথা বলিয়া বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অপরের অলক্ষিত-ভাবে দিদির দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করিয়া ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

বাবাজী মহাশয়ের কৃপাস্পর্শে দিদি অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন, তাই মধুদাদাকে নিজ প্রার্থনানুযায়ী আশাপূর্ণজনিত আনন্দে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—"ভাই! প্রার্থনা করেছিলাম শেষ সময় একবার দর্শন পাবার, কিন্তু দয়াময় প্রভু আমাকে দর্শন ও স্পর্শন দুই-ই দিলেন। আশার অতীত দান, এর চেয়ে দয়ার পরিচয় আর কি হ'তে পারে?" মধুদাদা "জয় নিতাই গৌর হরিবোল" বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নাম করিতে লাগিলেন।

এদিকে বাবাজী মহাশয় ঠাকুরবাড়ীতে যাইয়া বলরামবাবু, নগেনবাবু ও কুঞ্জদাদা প্রভৃতি চার-পাঁচজনকে ডাকিয়া বলিলেন—"ললিতার তো অন্তিম সময় উপস্থিত, এ অবস্থায় আর ঘরের মধ্যে কেন? ওকে ধরাধরি ক'রে নাম করতে করতে ঠাকুরবাড়ীতে নিয়ে এস না?"

তখন বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত সকলে নাম করিতে করিতে অতি সন্তর্পণে দিদিকে উঠাইয়া দশ-পনের হাত যাইতেই দেখিলেন, দিদির দুইটি চক্ষুই নিস্পন্দ, শ্বাসপ্রশ্বাসহীন দেহ অসাড়। দ্রুতপদে ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"ঠাকুরের সম্মুখে শুইয়ে দাও।"

আদেশানুসারে শয়ন করাইয়া দিয়া দিদির তখনকার অবস্থা দর্শনে সকলেই নানাপ্রকার শোকব্যঞ্জক আক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহবা

দিদির গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া মৃদুস্বরে রোদন করিতে লাগিল। আশ্রমের সেবাপূজার কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দূরের মৃদু ক্রন্দনধ্বনি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাবাজী মহাশয়ের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি মধ্যে মধ্যে "জয় নিতাই জয় নিতাই" ধ্বনি করিতেছেন।

শ্রীবৃন্দাবনের কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব সেই সময় মঠে উপস্থিত ছিলেন। বড়-বাবাজী মহাশয়ের বড় গুরুভাই মাধবদাস বাবাজী মহাশয়ও সেই সময় কিছুদিন যাবৎ ঝাঁঝপিটায় অবস্থান করিতেছিলেন। বাবাজী মহাশয় সকলের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়া করযোড়ে বলিলেন—"আপনারা সকলেই অদোষদর্শী ভুবনপাবন বৈষ্ণব, ললিতার সর্ব্ববিধ অপরাধ ক্ষমা ক'রে ওকে আশীর্ব্বাদ করুন ও যোগ্যদেহ লাভ করে অভীষ্ট-সেবা প্রাপ্ত হোক। আর কৃপা ক'রে আপনারা ওর মাথায় আপনাদের শ্রীচরণরজ প্রদান করুন।" এই সময় হঠাৎ দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ তিন মূর্ত্তি বৈষ্ণব সেখানে উপস্থিত হওয়ায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া উঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দিদিকে দেখাইয়া করযোড়ে বলিলেন—"এ বড়ই সেবানিপুণা ছিল, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা এর প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ছিল, না জানি কোন্ দুর্দ্দৈববশতঃ আজ এইভাবে ও জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসেছে, আপনারা ওর পরকালের সম্বলের জন্য ওর মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণ করুন।" মহাত্মা তিনজন প্রথমে একটু আপত্তি করিলেও বাবাজী মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে প্রসন্নচিত্তেই দিদির মস্তকে শ্রীচরণরজ প্রদান করিলেন।

মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বড়বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"যাদব! সকলেই চরণধূলি দিলেন, কই, তুমি তো দিলে না? আমার মনে হচ্ছে তোমার চরণস্পর্শ পেলেই ললিতা আরোগ্যলাভ করবে।" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "ওর বিশ্বাস হোক আর না হোক আপনাদের তো বিশ্বাস হয়েছে?" তাহাতে মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"ওর এখন কি

আছে ? ও তো এখন মরা মানুষ। এখন আমাদের বিশ্বাসেই কাজ হবে। তুমি ওর মাথায় চরণ দাও।"

বাবাজী মহাশয় উঠিয়া দিদির শয্যার নিকটে গিয়া মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছু সময় চাহিয়া থাকিয়া ছলছল নেত্রে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"এই শুকনো কাঠখানাকে বাঁচিয়ে নিতাইচাঁদের যে কি উদ্দেশ্য সাধন হবে তিনিই জানেন।" এই বলিয়াই "জয় নিতাই জয় নিতাই" বলিতে বলিতে দক্ষিণ চরণখানি ললিতা-দিদির মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্পর্শ করইয়া একটি সেবককে বলিলেন—"শ্রীমন্দির হ'তে ঠাকুরের স্নানজল এনে ওর মুখে দিয়ে দাও।"

ভক্তটি বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত ঠাকুরের স্নানজল আনিয়া মুখে দিতেই দিদি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। সম্মুখে দৃষ্টি পড়িতেই বাবাজী মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া স্খলিত বসন সামলাইয়া মাথায় ঘোমটা দিতে ব্যস্ত হইলেন তখন চতুর্দ্দিকে "নিতাই গৌর হরিবোল" ধ্বনি উত্থিত হইল। বাবাজী মহাশয় তখন দিদির কাছে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—

"ললিতা, তোমার ভাগ্যের সীমা নেই। শ্রীবৃন্দাবনবাসী মহাত্মাগণের শ্রীচরণরজ পেয়ে তাঁদের কৃপায় এ যাত্রা পুনর্জ্জীবন পেলে। বেশ ভক্তি ক'রে এঁদের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম কর। যেন আজীবন মনে থাকে যে, বৈষ্ণবকৃপায় এ জীবন লাভ হয়েছে। যতদিন বৈষ্ণবে প্রীতি রাখতে পারবে ততদিন কোনই ভয় নেই। করুণাময় বৈষ্ণবগণ সকল বিপদ হ'তেই তোমাকে রক্ষা করবেন।"

আগন্তুক বৈষ্ণব তিনমূর্ত্তি বিস্মিতভাবে একবার বাবাজী মহাশয়ের দিকে আবার ললিতাদিদির দিকে চাহিয়া তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে সকলেই লক্ষ্য করিল যেন দিদি কি বলিতেছেন। যদিও স্বর অস্পষ্ট, কিন্তু ওষ্ঠাধরকম্পন বেশ লক্ষ্য হইতেছে। ভক্তমণ্ডলীর মৃদুগুঞ্জন-ধ্বনি আবার নিস্তব্ধ হইল।

বড়বাবাজী মহাশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"তোমরা গোলমাল না ক'রে সকলে মিলে নাম কর।" সঙ্গে সঙ্গে "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম"

নামের ধ্বনি উঠিল। খোল করতাল সহযোগে ভক্তগণ কিছু সময় কীর্ত্তন করিবার পর বাবাজী মহাশয় ধীরে ধীরে দিদিকে বলিতে লাগিলেন—"দেখ ললিতা! ঠাকুরের কাছে তোমার অপরাধ হয়েছে। তুমি বুঝতে পার আর নাই পার, ঠাকুর কৃপাময়, তিনি কৃপা ক'রে এইভাবে আজ তোমাকে রক্ষা করলেন। তাঁর কাছে নিজকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর ভবিষ্যতে যাতে ওরূপ অপরাধ না হয় তার জন্যও শক্তি প্রার্থনা কর।"

দিদি অতি ক্ষীণস্বরে কি বলিলেন, ভাল শোনা গেল না। কথা বলিতে যে দিদির কষ্ট হইতেছে তাহাও উপস্থিত সকলে লক্ষ্য করিলেন। মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বড়বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"আমার মনে হয়, এখন আর ওকে এভাবে প্রশ্নাদি করে ব্যস্ত করা উচিত নয়। একটু সুস্থ হ'লে ধীরে ধীরে যা কিছু বলবার থাকে বললে ভাল হয়।"

বাবাজী মহাশয় তখন ভক্তবৃন্দও শুনিতে পায় এইভাবে দিদিকে বলিলেন—"ললিতা! শুনে রাখ যে, ঠাকুরের ভোগের দ্রব্য অপ্রসাদী অবস্থাতে আমাদের দিয়েই এইভাবে রোগে ভুগছিলে। সাবধান, আর যেন কখনও এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি না হয়।" সেবকগণকে বলিলেন—"আজ থেকে ললিতার অন্য ঔষধপথ্য বন্ধ, ওকে কেবল চরণামৃত ও প্রসাদ সেবা করতে দেবে। কোনরূপ অপ্রসাদী জিনিস যেন ওকে দেওয়া না হয়।"

বাবাজী মহাশয়ের নির্দ্দেশমত থাকিয়া চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই দিদি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তবে দেহের দুর্ব্বলতা ছিল। কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের যে কি মনোভাব বোঝা যায় না। প্রথম যেদিন দিদি সেবার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন সেই দিনই পঞ্চাশ-যাট মূর্ত্তি বৈষ্ণবের সেবার মত রন্ধন দিদিকে দিয়া করাইলেন। গোবিন্দদাদা, নগেনদাদা, মধুদাদা প্রভৃতি দিদির কষ্ট হইবে বলিয়া আপত্তি করিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"আজ্ঞে, ও যে মরা মানুষ, এখনও ওর ভাল ক'রে চলবার শক্তি হয় নি ও কিভাবে এত লোকের রান্না করবে?"

১৪

বাবাজী মহাশয় আপত্তি শুনিলেন না। তিনি উঁহাদিগকে বলিলেন—"অপরাধ যেমন গুরুতর হয় তার খণ্ডনও তেমনি গুরুতরভাবেই হওয়া দরকার। আর যে শক্তির কথা তোমরা বলছ,—শক্তি কি গাছের ফল যে কেউ এনে দেবে, বা বৃষ্টির জল যে আকাশ থেকে পড়বে? সেবা না করলে শক্তি আসবে কোত্থেকে? সেবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'লেই যাঁর সেবা তিনি ক্রমে ক্রমে শক্তিসঞ্চার করবেন। যাও, তাকে আদেশমত কাজ করতে বল।"

আর কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। বলা বাহুল্য, বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত দিদি সমস্ত কার্য্যই অতি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এইভাবে পরদিবস রাত্রেও প্রায় এক মণ দুগ্ধের সুজির পায়স ও অন্যান্য বহু প্রকার ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া জগন্নাথদেবের ভোগ দিয়া প্রায় আড়াই শত মূর্ত্তি বৈষ্ণব ও দুঃখী কাঙ্গালীর সেবা করাইলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এদিনও রন্ধন এবং পরিবেশনের কার্য্য ললিতাদিদিকে দিয়াই করাইয়াছিলেন। বাবাজী মহাশয়ের এই সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়া দর্শন করিয়া সকলেই একবাক্যে তাঁহার কৃপাশক্তির জয় দিতে লাগিলেন।

বড়বাবাজী মহাশয়ের গুরু-তত্ত্ব উপদেশ

এই ঘটনার দুই-তিন দিন পরে মঠের নির্দ্দিষ্ট সেবার কার্য্য সমাধা করিয়া ললিতাদিদি নগেনদাদাকে সঙ্গে করিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট গিয়া দেখেন, মধুদাদা বাবাজী মহাশয়কে বাতাস করিতেছেন। আর কুঞ্জদাদা কি প্রশ্ন করিয়াছেন বাবাজী মহাশয় তাহার উত্তরে কি বলিতেছেন। কথা-প্রসঙ্গে দিদি বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"সেদিন ঠাকুরের নিকট আমার অপরাধ হয়েছে বললেন, কিন্তু আমি তো কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি না যে, কখন, কোথায়, কি অপরাধ করেছি। দয়া ক'রে আপনি আমাকে ব'লে দিন।"

বাবাজী।—আমি আর কি বলব, ঠাকুরের নিয়মিত ভোগ ছাড়া আমাদের উপলক্ষ্য ক'রে মঠে অনেক কিছু প্রস্তুত হয়, কিন্তু তুমি সে সব ঠাকুরকে নিবেদন না ক'রেই অপ্রসাদী আমাদের দাও। ঠিক কি না বল দেখি?

ললিতা।—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা কখন কখন হয় বটে। তবে তাতে তো ঠাকুরের কাছে অপরাধ হ'ল না, অপরাধ হ'ল আপনার কাছে।

বাবাজী।—না, তা হয় না ললিতা, ঠাকুরের নিকটই অপরাধ হয়। কারণ এ সংসার ঠাকুরের সংসার, কতবার তোমাদের বলেছি। ঠাকুরকে উপলক্ষ্য ক'রেই এখানে যা কিছু আসে, তোমরা যদি সে সব তাঁকে অর্পণ না ক'রে নিজেরা গ্রহণ কর তা হ'লে চুরি করা হয় না কি? এই চৌর্য্যজনিত অপরাধের দণ্ড কে নেবে?

ললিতা।—আচ্ছা, যাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে যে দ্রব্য আসে, তাঁকে সেই দ্রব্য দিলেও কি চুরিজনিত অপরাধ হয়?

বাবাজী।—হয় বই কি! ভগবৎসংসারবাসী যে কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য ক'রেই যা কিছু আসুক না কেন, সবই ভগবানের আনিত এবং অধিকৃত ব'লে বুঝতে হবে। আমরা যে তাঁর দাস।

ললিতা।—এ কথায় আমার মনে গোটা কয়েক সন্দেহ জাগছে, দয়া ক'রে সন্দেহভঞ্জন ক'রে দিন।

বাবাজী।—বেশ তো, অকপটে বল, কি সন্দেহ!

ললিতা।—শাস্ত্রে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল বচন দেখা যায় তাতে গুরু-কৃষ্ণ এক বস্তু এই কথাই প্রমাণ হয়। গুরু গীতায় বলেছেন—"নগুরোরধিকং তত্ত্বং নগুরোরধিকং তপঃ।" এই সব বাক্যে গুরুসেবাই যদি সর্ব্বোপরি হ'ল তবে গুরুকে অপ্রসাদী দিতে আপত্তি কি? সর্ব্বাগ্রে যখন গুরুপূজা ও প্রণাম-বন্দনাদির ব্যবস্থা রয়েছে তখন আমার মনে হয়, গুরুকে অপ্রসাদী দেওয়াই উচিত বরং প্রসাদী দিলে অপরাধ হবে।

বাবাজী।—এ কথাটি একটি বড় কথা ললিতা। প্রসঙ্গ তুলে ভালই করেছ। একটু আলোচনা করা যাক। উপাসনার মধ্যে যত কিছু গোলমাল, যত কিছু মতদ্বৈধ, যত ভিন্ন ভিন্ন মতে ভিন্ন ভিন্ন পথে ধর্ম্মজগতে সম্প্রদায়বিভেদ হয়েছে বা হচ্ছে তার মূল অনুসন্ধান করলে দেখবে, একমাত্র এই গুরুতত্ত্বই তার মূল। ঠিকঠিক ভাবে গুরুতত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম হ'লে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বেশ নিবিষ্ট চিত্তে শোন।

তত্ত্ব এবং লীলা দুইটি পৃথক। তত্ত্বতঃ গুরু কৃষ্ণ এক হ'লেও লীলাগত পার্থক্য আছে। তোমাদেরই শাস্ত্রে বলে—"আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ" নিজে স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ব'লেই স্ত্রীর একটি নাম জায়া। এই তত্ত্বগত পিতাপুত্র এক হ'লেও লীলাগত পার্থক্য না রাখলে ঘোর অপরাধ হয়। "যশোদা নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই।" ইত্যাদি প্রমাণে কৃষ্ণ এবং গৌর তত্ত্বতঃ এক, কিন্তু লীলাগত বা স্বরূপগত পার্থক্য না থাকলে পৃথক পৃথক পূজা বা পৃথক্ পৃথক ধ্যান-প্রণামাদির অপলাপ হয়ে পড়ে। এই তত্ত্ব এবং লীলাকে এক ক'রে নিয়েই একশ্রেণীর লোক মহাপ্রভুর পৃথক ধ্যান-মন্ত্রাদি স্বীকার করেন না। এইরূপ দ্বারকানাথ, মথুরানাথ এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ এক, কিন্তু লীলাগত পার্থক্য থাকার বিষয় বিশেষভাবেই সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হয়েছে।

অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেও এইরূপ তত্ত্বতঃ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করেছেন। কারণ জীব অণু আর ব্রহ্ম পূর্ণ। জীব অংশ, তিনি অংশী। তারপর যদি তুমি লীলাগত পার্থক্য মানতে না চাও, তা হ'লে তো কৃষ্ণসেবা করলেই গুরুসেবা করা হ'ল, কৃষ্ণকে ভোগ দিলেই গুরুর ভোগ হ'ল, আর পৃথকভাবে গুরুসেবার আবশ্যক কি? শাস্ত্রসমূহ তত্ত্বগত যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করেছেন সেই সমস্ত বাক্য লীলাগত ধ'রে নিয়েই তো এই সমস্ত মতবিভ্রাট ঘটেছে।

তারপর শাস্ত্র ছেড়ে যদি শুধুমাত্র যুক্তির দিকে ধর, তা হ'লেও তোমার

মত টেকে না। কেন না সেবা শব্দে সেব্যকে সুখী করা বুঝায়। গুরুদেব যাতে সুখী হন, সেইরূপ আচরণ করাই কি শিষ্যের সর্ব্বতোভাবে উচিত নয় ? "আজ্ঞা গুরুণাংহ্যবিচারণীয়া।" গুরুদেব যেটি আদেশ করবেন শিষ্যের সেইটিই অবশ্যপালনীয়। গুরুর আজ্ঞায় কোনরূপ বিচার চলে না। তুমি হয়তো তোমার নিজের জেদ বজায় রাখতে শাস্ত্রবাক্যের একাংশ গ্রহণ ক'রে অথবা নিজ সুখের জন্য গুরুকে অপ্রসাদী বস্তু প্রদান করলে, তিনিও হয়তো শাস্ত্রযুক্তিতে তোমার কাছে পরাস্ত হ'য়ে অগত্যা সেই বস্তু গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন ; কিন্তু যে সুখের জন্য তাঁকে দেওয়া সে সুখ তো তাঁর হ'ল না ! আচ্ছা, বল দেখি এভাবের সেবায় সেবকের কি লাভ হ'ল ?"

এইভাবের বহু আলোচনা দ্বারা ললিতাদিদির প্রতিটি প্রশ্ন বাবাজী মহাশয় খণ্ডন করিয়া দিলেন। দিদি তখন কৃতাঞ্জলিপুটে গললগ্নীকৃতবাসে গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমি জানি না যে, কি ভাবে, কার কাছে, কখন কোন্ অপরাধ করেছি।° সকলের কাছেই আমার এই প্রার্থনা আমার দ্বারা যেন কখনও কারও কোনরূপ অপ্রীতিকর কার্য্য সাধন না হয়। সকলে আমাকে এই ভিক্ষা দিন। আর আমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কৃত সকল প্রকার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

এই প্রসঙ্গটি 'চরিত-সুধা' গ্রন্থে "ললিতাদাসীর পুনর্জ্জন্ম" নামে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ হইয়াছে। আমি উহার অংশবিশেষ পাঠকগণকে উপহার দিলাম মাত্র। তবে পূজনীয় মধুদাদার নিকট যেভাবে শুনিয়াছি তাহাতে স্থানে স্থানে কথাবার্ত্তার একটু ভিন্নরূপ হইয়াছে ; অবশ্য মূল ঘটনার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

প্রিয়জনবিয়োগে দিদির পত্র

সখীবেশ ধারণের পূর্ব্বে পিতৃদেবের সংকার সময় ৺কালীঘাট শ্মশানে বসিয়া দুই ভাইয়ের আলোচনা পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে আলোচিত হইয়াছে। আজ দিদির নিজহস্তলিখিত একখানি পত্রে তাঁহার কোন প্রিয়জনবিয়োগে তাঁহার আত্মীয়ের নিকট যে সান্ত্বনাবাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। অন্যান্য কথার পর দিদি লিখিয়াছেন—

"...আশা করি মঙ্গলময় প্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদে প্রাণে প্রবোধ পাইয়াছ।... আমি যখনই কলম ধরিতে যাইব মনে করি তখনই সেই দেবপ্রতিম, সত্যবাদী, জীতেন্দ্রিয় পুরুষটির মুখখানি মনে পড়িয়া হৃদয়টাকে কেমন যেন উদ্বেলিত করিয়া তোলে।...এখন এই অবস্থায় একমাত্র জ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে। গোপালকে এবং অভাগিনী ইন্দুকে কাছে বসাইয়া বুঝাইবে, 'এ কর্ম্মভূমি, যতদিন যে অবস্থায় যাহাকে যেখানে থাকার নিয়ম বিধাতা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই।'

যদি বল দেহের সহিত সম্বন্ধ ছিল, তবে দেহ তো তোমাদের কাছেই ছিল, তোমরা ফেলিয়া দিলে কেন? আর যদি বল ঐ দেহের মধ্যে যিনি ছিলেন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ; তবে তো তিনি নিত্যই রহিয়াছেন। তাঁহার তো মৃত্যু নাই, তবে দুঃখ কেন? এ দুঃখ আমি বলিব স্বার্থের জন্য। তিনি এই দেহে তোমাদের কাছে থাকিয়া তোমাদের অনেক কাজকর্ম্ম করিতেন এবং তাহাদ্বারা তোমাদের অনেক স্বার্থসিদ্ধি হইত। আজ সেই স্বার্থসুখের অভাবেই তোমরা কাঁদিতেছ।

এ কান্না মায়ার কান্না, প্রকৃত ভালবাসার কান্না নহে। যদি প্রকৃত তাঁহাকে ভালবাস তবে এই কর্ম্মভূমি হইতে তাঁহার নিজ কর্ম্মফলে যে স্থানে তাঁহার সূক্ষ্মদেহ বাস করি:তছে ঐ দেহে অবস্থিত তাঁহার অভিমানী জীবাত্মার

উর্দ্ধতমলোক এবং সুখময় অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদা প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর। নিজ নিজ ইষ্টনাম করিয়া কাতর প্রাণে তাঁহার জন্য কাঁদ, শান্তি পাইবে।

ভাবিয়া দেখ, তোমাদের সংসারে থাকিয়া তোমাদের সঙ্গ বা প্রসঙ্গে তিনি কত না তাপ, কত না অশান্তি, কত না ব্যথা—উদ্বেগ পাইতেন! কত না বিরলে চোখের জল ফেলিতেন! আজ সেই ত্রিতাপজ্বালার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া কেমন আনন্দময় রাজ্যে পরমানন্দে বাস করিতেছেন। কেমন সুখময় অবস্থা ভোগ করিতে করিতে পরম শান্তি লাভ করিতেছেন। কিন্তু তোমরা তাঁহার ঐ সুখ-শান্তির কথা মনে আনিয়া কোথায় আনন্দ করিবে, তোমাদের সেই নিঃস্বার্থ প্রেমের ছায়া তাঁহার মনে পড়িয়া আরও আনন্দ হইবে, আরও আশীর্ব্বাদপূর্ণ কৃপা তোমাদের উপর আসিবে। তাহা না করিয়া তোমরা যতই স্বার্থসুখের জন্য দুঃখ করিবে, কান্না করিবে, সেই ছায়া যেমন তাঁহার চোখে পড়িবে, বল দেখি তিনি কত দুঃখ পাইবেন? তাঁহার সেই বিমল শান্তির কত ব্যাঘাত করা হইবে? তাই আমাদের শাস্ত্রে মৃতব্যক্তির জন্য চোখের জল ফেলা নিষেধ।

পত্রে আর কি লিখিব, সকলকে সান্ত্বনা দিও—

"মোরে যদি দিলে দুঃখ তার হয় মহা সুখ
সেই দুঃখ মোর সুখ বর্জ্য।"

কথাটি ইন্দুকে ও গোপালকে বুঝাইয়া দিও। মায়ের কথা আর কি বলিব?…মাকে বলিও, প্রভুর ইচ্ছা, কি করিবেন, ভোগ করিতেই হইবে। দুঃখ করিয়া চিন্তা করিয়া মাথা খারাপ করিয়া লাভ নাই। ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া গোপালের পরিণামের দিকে লক্ষ্য করুন, উহাকে সান্ত্বনা দিয়া যাহাতে পিতার পারলৌকিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারে সেইভাবে যেন উপদেশ দেন।…

অবকাশমত "মনোশিক্ষা" "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" পাঠ করিয়া উহাদিগকে শুনাইও। ইতি—

২১শে বৈশাখ
১৩৪৬

শ্রীশ্রীগুরুপদাশ্রিতা
তোমার দিদি

পত্রে উপদেশ

একবার একজন ভক্ত দিদির নিকট পত্রে অন্যান্য কথা লিখিয়া শেষে লিখিয়াছিলেন—"আমরা বড়ই অশান্তিতে আছি, নিয়মিতভাবে নাম করিতেও পারিতেছি না। মধ্যে মধ্যে অবিশ্বাস আসিয়া নামসাধনে বাধা দিতেছে। কিসে এর শান্তি হয় লিখিবেন।" ইত্যাদি।

দিদি তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন—..."তোমাদের শারীরিক ও মানসিক অশান্তির কথা শুনিলাম। কি করিবে? প্রভুকে জানাও তিনি মঙ্গলময় শান্তিদাতা, মঙ্গল বিধান করিবেন। মনুষ্যের কোনই হাত নাই, আপন কর্ম্মফল অনুসারে যদিও জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে সত্য, কিন্তু ইচ্ছাময় ইচ্ছা করিলে উহার মধ্য দিয়াই পরমশান্তি দান করিয়া জীবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারেন।

সর্ব্বদা নাম কর। বিপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে শান্তির আধার প্রভুর শ্রীচরণ চিন্তা করিও। ভাল না লাগিলেও ঔষধ খাইবার ন্যায় জোর করিয়া তাঁহাকে ডাক, সকল বাধা বিপত্তি কাটিয়া গিয়া প্রাণে আনন্দ আসিবে সন্দেহ নাই।

প্রহ্লাদের মাতা কয়াধু, ধ্রুবের জননী সুনীতি, দ্রৌপদী, সীতা প্রভৃতির ধৈর্য্যের কথা মনে মনে স্মরণ করিও। তাঁহাদের ন্যায় শক্তিশালিনী হইতে না পারিলেও অনেকটা শান্তি আসিবে। শ্রীশ্রীরাধারাণী কত না লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে থাকিয়াও কৃষ্ণচিন্তা করিয়া পরম আনন্দে কালযাপন করিয়াছেন। ভয় কি? প্রভুকে ডাক, তাঁহার কৃপায় সব মঙ্গল হইবে।...সকলকে আমার 'জয় গুরু' জানাইবে। ইতি

শ্রীশ্রীগুরুপদাশ্রিতা
তোমাদের দিদি"

দিদির মৌখিক উপদেশ অপেক্ষা পত্রাদিতে যে সকল উপদেশ দিতেন তাহার মধ্যে ভজন-তত্ত্ব যেন একটু বেশী বেশী প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট হইতে এ-জাতীয় বহু পত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, প্রসঙ্গক্রমে আলোচনার চেষ্টা করিব। অত্যন্ত অন্তরঙ্গগণ-সঙ্গে লীলাতত্ত্বাদি আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সকল অমূল্য বাক্যাবলী প্রকাশ পাইয়াছে তাহার কথা স্বতন্ত্র। অনেক সময় সে সকল কথা সাধারণে প্রকাশ করিতে নিষেধও করিয়াছেন। সঙ্গীদের বলিতেন—"ঠিক সমপথযাত্রী না হ'লে অনেক সময় এক কথারই ভিন্নার্থ গ্রহণ ক'রে বিভ্রাট ঘটায়। ইষ্টগোষ্ঠী আর ধর্ম্ম উপদেশ বা আলোচনা এক কথা নয়।" ইত্যাদি।

দিদির নিকট কোন প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে কেহ কিছু লিখিতেছেন দেখিলে তিনি বলিতেন—"ও সব আবার পল্লবিত হ'য়ে যেন বাজারে প্রচার না হয়।" নিজেকে গোপন রাখার স্বভাব যে দিদির বাল্যকাল হইতেই ছিল, তাহার কিছু কিছু পরিচয় পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে পাঠকগণ পাইয়াছেন। সখীবেশ ধারণের পরও অবিচ্ছিন্ন ধারায় কঠোর ভজন করিয়াছেন, কিন্তু কোনদিন কোনভাবে কাহাকেও জানিতে দিতেন না যে কোথায় কি ভাবে কি করিয়াছেন বা কি করিতেছেন।

স্মরণমননকালে কোনদিন কোন লীলানুভব হইয়া কিছু স্ফূর্ত্তি পাইলে পদের আকারে তাহা লিখিয়া অন্তরঙ্গদের নিকট বলিতেন—"দেখ দেখ, তোমাদের রঙ্গিয়া ঠাকুরটির রঙ্গ দেখ, কি ভাবে কেমন রঙ্গভরে লীলা করছেন।" অনেক চেষ্টায় আমরা এ-জাতীয় কয়েকটি পদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। গ্রন্থশেষে পরিশিষ্টাকারে উহা প্রকাশের ইচ্ছা ছিল কিন্তু এ খণ্ডে হইল না।

ফণীদাদার সংশয়ভঞ্জন

শ্রীধাম নবদ্বীপে বাগানবাড়ীর সন্নিকটেই গোবিন্দদাদা থাকেন। তাঁহার একটি সেবক বিকলাঙ্গ হেতু তাহাকে দেখিলেই ছেলেরা নানা প্রকার উক্তি করে। যখনকার কথা আমি বলিতেছি তখন সেবকটির বয়স বেশী নয়। কাজেই দু'চার বার তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া কিছু বলিলেই সে ক্রুদ্ধ হয়। শ্রীগুরুদেবের আদেশে কাহাকেও কিছু বলে না সত্য, কিন্তু মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয় অন্তরে বেশ ক্রোধ হইয়াছে।

একদিন ফণীদাদা বাগানবাড়ীর সম্মুখের গেটে বসিয়া আছেন। আমি ও আমার এক বন্ধু তাঁহার কাছেই আছি। এমন সময় সেই সেবকটি একটি ফুলের সাজী হাতে করিয়া মঠে আসিতেছে। ফণীদাদা খুবই রসিকতা করিতে ভালবাসিতেন, তখন তাঁহারও বয়েস বেশী নয়। সেবকটিকে দেখিয়াই ফণীদাদা বলিলেন—"দীনেশ, বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনে শুনেছি 'চলায় নাচন কথায় গান' আজ সাক্ষাৎদর্শন করলাম। আহা হা, কি চলনভঙ্গী !"

সেবকটি একবার ফণীদাদার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমি ফণীদাদাকে বলিলাম—"দাদা! বৈষ্ণবকে অমন ক'রে বললে নিন্দা হয় না? পণ্ডিত মশাইদের মুখে শুনেছি—'মনুষ্যানাং স্বরূপ কথনং নিন্দা দেবানাং স্বরূপ কথনং স্তুতি।'" ফণীদাদা কেবল হুঁ-হুঁ করিয়া আমার কথার কোন উত্তর না দিয়াই চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই বৈকালে দিদি রান্নাবাড়ীর রকে বসিয়া আছেন, এমন সময় ফণীদাদা গিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"দিদি! বৈষ্ণব অপরাধে অপরাধী হ'লে, কি ভাবে তা থেকে উদ্ধার হওয়া যায়? আর অপরাধই বা কি কি ভাবে হয়?"

দিদি।—তোমার দিদি কি টোলের পণ্ডিত যে তোমার কথার উত্তর দেবে? কেন, কি হয়েছে?

ফণীদাদা।—কি জানি কেন, সময় সময় রসিকতা করতে গিয়েও অনেক রূঢ় কথা অনেককে ব'লে ফেলি, তাতে কি আমার অপরাধ হয় না ?

দিদি।—তা বলা যায় না, কিসে কি হয়। তবে যার কাছে অপরাধ হয়েছে মনে হবে, অকপটে কাতর প্রাণে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই শান্তি হবে। পরমদয়াল, অদোষদরশী, ভুবনপাবন, উদারচেতা বৈষ্ণবগণ অপরাধ গ্রহণ না করলেও তাঁদের ক্রিয়ামুদ্রা নিয়ে সমালোচনা বা তাতে দোষ দৃষ্টি করলেই অনর্থের চরম হয়, জীব তাতে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। অকপট দীন ব্যবহারে কোনরূপে তাঁদের কৃপালাভ করতে পারলেই সকল দুর্দ্দৈব দূর হয়ে অফুরন্ত শান্তিলাভে ধন্য হওয়া যায়।

ফণী।—কৃপালাভ করতে হ'লে যে জাতীয় সাধন দরকার, আমার যে তার কিছুই নেই দিদি। আমার কি হবে ?

দিদি।—আরে পাগলা, কৃপা কি সাধন ক'রে পাওয়া যায়! কৃপা যে অহৈতুকী। এমন কোঁন সাধন নেই, যা কৃপালাভের প্রতিকারণ হতে পারে।

ফণী।—তা হ'লে তো সকলকার উপরই কৃপালাভ হতে পারে ?

দিদি।—হয়ও তো তাই। তবে আধারবিশেষে থাকে বা ক্রিয়ার তারতম্য দৃষ্ট হয়। একটা সাধারণ উদাহরণ দিচ্ছি। মেঘ সর্ব্বত্রই বর্ষণ করে, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে জল দাঁড়ায় না বা বালুকাময় ভূমিতে জলের কোন ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না, তা ব'লে কি বলতে চাও সেখানে বর্ষণ হয় নি ?

ফণী।—আচ্ছা, কৃপাস্রোত চলবার কি কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ আছে ?

দিদি।—না, তাও বলতে পার না। কেন না কৃপা—কৃপাই। ও একেবারে স্বতন্ত্র। কখনও কোন কারণে কারও অধীন নয়। কৃপার প্রতিকারণ কৃপা ছাড়া আর কিছুই বলতে পার না। তবে এ কথাটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখবে যে, স্রোত সর্ব্বদাই নিম্নগামী। অভিমানমঞ্চ থেকে একটু না নেমে দাঁড়ালে, একটু না নীচু হ'লে কৃপা-শক্তির ক্রিয়া উপলব্ধি হবে না।

ফণীদাদা বোধহয় আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু সেই সময়

গোবিন্দদাদা আসিয়া ফণীদাদাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। দিদি সেখানে উপস্থিত অন্যান্য ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"একেবারে বালক-স্বভাব, ওর যে আজ এ সব প্রশ্ন কেন মনে জাগল বুঝতে পাচ্ছি না।"

মদন।—আজ দুপুরবেলা নাটমন্দিরে ব'সে কলকাতার একটি বাবুর সঙ্গে ফণীকাকার খুব তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল। শেষে ফণীকাকা বললেন—"আচ্ছা, আমি এ কথা দিদিকে জিজ্ঞেস ক'রে তোমাকে বলব।" বোধহয় সেই জন্যই আজ এ সব কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

দিদি একটু হাসিয়া বলিলেন—"জয় গুরু, জয় গুরু! দিদিকে কি তোরা টোলের অধ্যাপক পেয়েছিস নাকি যে, তোদের তর্কের মীমাংসা ক'রে দেবে?"

এই ভাবের আলোচনা যখন তখন যার তার সঙ্গে দিদি করিতেন, কিন্তু ভবিষ্যতে যে এগুলির এত প্রয়োজন হইবে আমরাও ভাবিতে পারি নাই, তিনিও সংগ্রহ করিয়া রাখাকে বিশেষ পছন্দ করিতেন না বলিয়া সকল সময় সকল কথা লিখিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। হতভাগ্য দীন লেখকের বাল্যকাল হইতেই একটা অভ্যাস ছিল, কোথাও কোন ভাল কথা বা কোনও দৃষ্টান্তসূচক গল্পাদি শুনিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহা নোট করিয়া রাখা। সেই স্বভাবের বশে যদি কখনও কিছু লিখিতে গিয়াছি, অমনি দিদি বাধা দিয়া বলিতেন, "ও আবার কি করছেন! আপনাদের কৃপায় অনেক সময় এক কথা দশ কথা হ'য়ে প্রচার হয়। এ অভাগিনীকে আর তার ভেতর ফেলবেন না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজ তাঁহার মতবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া নিশ্চয়ই অপরাধী হইতেছি, কিন্তু এই সকল অমূল্য উপদেশ অপ্রকাশিত রাখিতে কিছুতেই মন চাহিতেছে না, তাই শেষ সময় যেখানে যাহা কিছু সংগ্রহ করা ছিল, কোন রকমে পাঠকগণের সম্মুখে ধরিয়া দিলাম, সুশৃঙ্খলভাবে সাজাইবারও অবসর হইল না। এখন পাঠকগণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃপা করুন।

জীবনী লেখা কেন

"কলি ঘোর তিমিরে গরাসল জগজন
ধরম করম রহু দূর।"

বৈষ্ণব কবির এই দুইটি ছত্রে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব সময়ের চিত্রটি বেশ পরিস্ফুট হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধন করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করা আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বল বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে কতটা সম্ভব তাহা বিজ্ঞজন-বিবেচ্য। কবি উপরোক্ত পয়ারের পরেই বলিয়াছেন—

"অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥"

বিধি অনুকূল না হইলে ত্রিতাপতাপিত মাদৃশ পাষণ্ড পতিতগণের গতি যে কি হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ভাবসিদ্ধ মহাপুরুষগণের সঙ্গলাভ ও তাঁহাদের আদর্শে নিজ নিজ জীবন চালিত করিবার সুযোগ-সুবিধা দানের জন্যই মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহারা আবির্ভূত হয়েন এবং আচারে ব্যবহারে উপদেশামৃতদানে জীবকে কৃতার্থ করেন। মানবের চিরতৃষিত শুষ্ককণ্ঠে দুর্লভ প্রেমামৃতধারা ঢালিয়া দিয়া অনাদিকালের অশান্ত প্রাণে শান্তিদান করাই হয় তাঁহাদের জীবনের ব্রত।

জাতীয় জীবনের কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি কর্ত্তব্য; কি অকর্ত্তব্য সমস্তই তাঁহারা নিজ নিজ চিন্তা-তরঙ্গের সহিত মিশাইয়া মোহান্ধ জীবসমূহের জন্য অকুণ্ঠচিত্তে বিতরণ করিয়া থাকেন। এই সকল রসিক ভাবসিদ্ধ মহাত্মাগণকে লাভ করিয়াই ভারত চিরকাল গর্ব্বানুভব করিয়া আসিতেছে। আমরাও এই জাতীয় একজন ভাবসিদ্ধ সাধকের দর্শন স্পর্শন লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। ইনি আর কেহ নন, ইনিই আমাদের ললিতাদিদি। এই ললিতাদিদিকে পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক কিছু সন্ধান জানিতে পারিয়া, অনেক

ভাগ্যবান কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। জীবনের সমগ্র ঘটনা প্রকাশের সৌভাগ্য না হইলেও যতটুকু গ্রন্থমধ্যে দিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতেই আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি।

শ্রীভগবানের লীলাগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা জীব অনায়াসেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে, এইটি সাধারণ নির্দ্দেশ। প্রেমলাভ, ভক্তিলাভ ইহার পরের কথা। যাহা হউক, শাস্ত্রের এই নির্দ্দেশ শ্রবণ করিয়া জীব অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু পথিমধ্যে নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন পাইয়া অনেক সময় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থার অবসান ঘটাইতেই যেন বিধি ললিতাদিদিকে পাঠাইয়া তাঁহার দ্বারা আচরণ করাইয়া, মৌখিক উপদেশ দেওয়াইয়া, কখন কখন প্রত্যক্ষ করাইয়া কত শত শত পথহারা পথিককে যে সুপথের সন্ধান দিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

যাঁহারা তাঁহার মধুময় সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন তাঁহারা তো জানেনই; যাঁহারা যে কোন কারণেই হউক সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের অবগতির জন্যই মহামহীয়ান এই চরিত-গাথা বর্ণনের সামান্যমাত্র চেষ্টা করিয়াছি। ধারাবাহিক জীবনী লেখা আমার উদ্দেশ্যও নয়, আর তাদৃশ মহান্ কার্য্য মাদৃশ অযোগ্যের দ্বারা সম্পন্ন হওয়াও সম্ভব নয়।

সখীবেশ ধারণ কি অশাস্ত্রীয় ?

দিদির সখীবেশ ধারণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার আলোচনা করেন। আমি ও-সম্বন্ধে কিছু জানি না বা বুঝি না, তবুও অনেকে এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি করযোড়ে নিজ অযোগ্যতা জানাইয়া তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়াছি। কিন্তু মধ্যে মধ্যে নিজের মনের মধ্যেও যে এ-জাতীয় প্রশ্ন একেবারে উদয় হয় নাই, এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। একদিনের একটি ঘটনা শুনুন।

একদিন বৈকালে নবদ্বীপ বগানবাড়ীর স্কুলঘরের পশ্চিমদিগের ঘরে বসিয়া স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বরূপ গোস্বামী একটা স্বরচিত পদ লইয়া আলোচনা করিতেছেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বিশ্বরূপ গোস্বামীর সম্মুখে হারমনিয়ম। মধ্যে মধ্যে গানের সুরটি বাজাইয়া স্বামিজীকে শোনান হইতেছে। আমি কাগজ পেন্সিল লইয়া উঁহাদের নির্দ্দেশমত লিখিতেছি। হঠাৎ ঘরের বন্ধ দরজা খুলিয়া গেল। স্বামিজী ও বিশ্বরূপ ধূমপান করিতেছিলেন, দরজার দিকে চাহিয়া সংযত হইয়া বসিলেন। আমিও সচকিতে চাহিয়া দেখি, দরজার সম্মুখে ললিতাদিদি।

অপ্রত্যাশিত ভাবে দিদির আগমনে আমরা সকলেই একটু স্তম্ভিত হইয়া ছিলাম। কিন্তু বিশ্বরূপ সে ভাব ভঙ্গ করিয়া দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ কি! বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ আমাদের গুপ্ত-মন্ত্রণাগারে আবির্ভাব কেন?"

এখানে পাঠকগণকে একটু বলিয়া রাখি যে, বিশ্বরূপ দিদির সঙ্গে এইভাবের রহস্যালাপ প্রায়ই করিতেন। দিদি তাহাতে কোনরূপ বাধা না দিয়া যথাযথ উত্তরদানে বরং তাঁহার রসপুষ্টির আনুকূল্যই করিতেন।

দিদি।—নিভৃতে, নির্জ্জনে, নিবিষ্টচিত্তে তিন প্রভু একঠাঁই ব'সে ব'সে কিসের পরামর্শ হচ্ছে জানতে ইচ্ছা হয় না কি? তাই একবার এলাম। জীবের মঙ্গলের অনুকূল বিষয় যদি হয় হউক কোন আপত্তি নেই, কিন্তু প্রতিকূল হ'লে দাসীর ঘোর আপত্তি আছে।

বিশ্বরূপ।—(রহস্য করিয়া) বর্ত্তমানে বাগানবাড়ীর কর্ত্তৃত্ব হস্তান্তরিত করার পরামর্শই চলছে, জেনে রাখ দিদি। তোমার কর্ত্তৃত্ব আর চলবে না।

দিদি।—(হাসিতে হাসিতে) আমার উপর কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হ'ল কবে যে, এখন কেড়ে নেওয়া হবে?

বিশ্বরূপ।—তুমি স্বেচ্ছায় সখীবেশ ধারণ ক'রে এখানে ব'সে ব'সে ইচ্ছামত কাজ করবে, আর আমরা—বিশেষতঃ নবদ্বীপবাসী, তা কোন মতেই বরদাস্ত

করব না। আজ বলতে হবে তোমার এভাবে থাকার শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণ কি আছে ?

স্বামিজী।—(বিশ্বরূপকে বাধা দিয়া) আঃ, কি হচ্ছে গোঁসাইজী! (দিদির দিকে চাহিয়া) যাও দিদি, তুমি তোমার কাজে যাও, এ ক্ষ্যাপা গোঁসাই আজ গান ঠিক করতে না পেরে ক্ষেপে গেছে।

দিদি।—কি জানি প্রভুদের লীলা-খেলা। আচ্ছা এখন আমি যাই, আপনাদের কাজ আপনারা করুন, সময়ান্তরে দাসীর বিচার হবে।

দিদি একটা দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া গেলেন। স্বামিজী বিশ্বরূপের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখ দেখি কাণ্ড! না জানি কি জরুরী কথা বলতে দিদি এসেছিলেন আর তুমি তাকে এমনি ক'রে তাড়িয়ে দিলে ?"

বিশ্বরূপ।—এখন আমাদের যে কাজ হচ্ছে এর কাছে দুনিয়ার কোন কিছুই বেশী জরুরী নয়। নিন, আপনি পদটা ঠিকমত সুরে ফেলুন দেখি, তারপর ও সব শোনা যাবে।

পুনরায় গানের আলোচনা আরম্ভ হইল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে একটু অবসর বুঝিয়া আমি বলিলাম, " 'চরিতসুধা'য় বর্ণিত আছে বড় বাবাজী মহাশয় এই সখীবেশ ধারণ সম্বন্ধে নানা প্রকারের সমালোচনা শ্রবণ করে তাঁর শ্রীগুরুদেবকে নাকি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আমি এদের কাছে রাখব, না তাড়িয়ে দেব ?' উত্তরে তিনি অনেক কিছু ব'লে শেষে বলেছিলেন—'নিতাইচাঁদের সংসারে কাকেও অবজ্ঞা ক'রো না। তুমি সকলকে আদর যত্ন করতে পার, কিন্তু বিদায় করবার অধিকার তোমার নেই।' বেশধারণ সম্বন্ধে বললেন—'গোস্বামী পাদগণের শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম বিশেষ প্রণিধান ক'রে দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে, ভাবকে স্থায়ী করতে হ'লে স্বভাবে পরিণত করা প্রয়োজন, আবার স্বভাবে পরিণত করতে হ'লে দেহে তদ্‌জাতীয় বেশভূষাদি ধারণ করা, বাক্যে তদ্‌জাতীয় আলাপ ব্যবহার ও লীলাগুণাদি কীর্ত্তন করা, মনে তদ্‌ভাবাঢ্য নিত্য পরিকরগণের আনুগত্যে লীলাদি স্মরণ, মনন,

নিদিধ্যাসনাদি আচরণ করা বিশেষ আবশ্যক। যদি সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় কখনও কারও সেরূপ সৌভাগ্য ঘটে, তবে তাঁকে আদর্শস্থানীয় মনে করবে।"

বড়বাবাজী মহাশয়, কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের পুত্র বিমলাপ্রসাদ দত্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ 'চরিতসুধা' ৫ম খণ্ড হইতে পাঠ করিয়া আমি বিশ্বরূপকে শুনাইলাম। স্বামী সচ্চিদানন্দও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 'চরিতসুধা'য় আছে—

"বিমলা।—আচ্ছা, শাস্ত্রানুসারে ঐরূপ বেশের কিছু আবশ্যকতা দেখাইতে পারেন কি ? অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্বমহাজনগণ কেহ ঐরূপ বেশ ধারণ করিয়াছেন, দেখাইতে পারেন কি ?

বাবাজী।—বাবা! আমি শাস্ত্রসিদ্ধান্তাদি কিছুই জানি না, তবে সাধারণ যুক্তি অনুসারে দেখিতেছি যে, সকল শাস্ত্রেই একবাক্যে বেশের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া গিয়াছেন। একে একে দুই-চারিটি আপনাকে দেখাইতেছি।—

যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক বা সাধনের সহায়। এইরূপ সন্ন্যাসীর ত্রিপুণ্ড্র, গৈরিক বসন, দণ্ডীর ত্রিদণ্ড, শৈবের রুদ্রাক্ষ বিভূতি ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বৈষ্ণবগণের তিলক, তুলসীমালা প্রভৃতি ধারণ শাস্ত্রসম্মত নহে কি ? সধবা রমণীর শঙ্খ সিন্দূর স্বামীর স্মারক বা উদ্দীপক অথবা অস্তিত্বের পরিচায়ক নয় কি ? আপনি যে সখীভাবের কথা বলিতেছেন, এ বিষয় আমি আর কি বলিব ? 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যমের অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদটি আলোচনা করিলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

রাধাকৃষ্ণ-লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার॥

সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

অন্যত্র :—

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

স্থানান্তরে :—

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাঙ্‌ি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ ইত্যাদি।

আবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন :—

"সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং॥
আজ্ঞাসেবাপরাংতত্তৎ-রূপালঙ্কারভূষিতাং॥"

সনৎকুমার তন্ত্রে :—

"আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিং॥"

ইত্যাদি বহু বহু স্থানে সখীভাব স্থায়ী করিয়া রাধাকৃষ্ণলীলা ভাবনা করিবার কথা বলিয়াছেন। আবার :—

"সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
তদ্ভাবলিপ্সনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

ইত্যাদি বাক্যে শ্রীজীবগোস্বামীপাদের টীকা :—"সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসেবোপযোগিদেহেন।" বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী :—"সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসাক্ষাৎ সেবোপযোগিদেহেন। তদ্ভাবঃ স্বপ্রেষ্ঠকৃষ্ণ-বিষয়কঃ স্বসমীহিত কৃষ্ণজনাশ্রয়কশ্চ যো ভাব উজ্জ্বলাখ্যস্তং লব্ধমিচ্ছতাসেবামনসৈবোপস্থাপিতৈঃ সাক্ষাদপ্যুপস্থাপিতৈশ্চ সমুচিত দ্রব্যাদিভিঃ পরিচর্য্যা কার্য্যা। অত্র প্রকার মাহ—ব্রজলোকানুসারতঃ সাধক-রূপেণানুগম্যমানা যে ব্রজলোকাঃ শ্রীরূপগোস্বাম্যদয়ঃ যে চ সিদ্ধরূপেণানু-গম্যমানা ব্রজলোকাঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদয়স্তদনুসারতঃ॥" ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের বাক্যের সহিত ইঁহাদের আচরণের কোনওরূপ বৈপরীত্য দেখা যায় কি ?

বিমলা।—বৈপরীত্যের মধ্যে এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ কর্ত্তৃক অননুষ্ঠিত, অন্তশ্চিন্তিত ভাবযোগ্য দেহকে বাহিরে প্রকাশ করা।

বাবাজী।—কেন ? এরূপ যোগ্যদেহ তো অনেকেই ধারণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের আবেশে তো যোগ্য বেশভূষা ধারণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীয় পরিকরগণ প্রায় সকলেই সখ্যভাবাবিষ্ট হইয়া গোপবেশ ধারণ করিতেন। দাসগদাধর রাধিকার ভাবাবেশে গোপীবেশ ধারণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত নানা লীলাদি আচরণ করিয়াছিলেন। অভিরাম ঠাকুর সখ্যভাবাবেশে বংশী প্রভৃতি ধারণ করিতেন। আবার লোচনানন্দদাস ঠাকুর, খণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি কখনও নদীয়ানাগরীবেশে গৌরের সহিত মিলন করিতেন, আবার কখনও বা ব্রজগোপীর বেশে কক্ষে গাগরী লইয়া দধিদুগ্ধবিক্রয়ীর ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। আচ্ছা, আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—শাস্ত্রে কোথাও ভাবযোগ্য বেশভূষা বাহিরে ধারণ করিবার নিষেধ

করিয়াছেন পাওয়া যায় কি? বা ভাবটি স্বভাবে পরিণত করিবার চেষ্টা করাটাকে কেহ অসঙ্গত মনে করিয়াছেন কি?

ইত্যাদি নানারূপ তত্ত্ব আলোচনার পর বিমলাবাবু চলিয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয়ও নিজ নিত্যকৃত্যাদি করিতে গমন করিলেন।"

এই পর্য্যন্ত পাঠের পর স্বামীজী বলিলেন—"খুড়ো! আজ এই পর্য্যন্তই থাকুক, আমরাও এখন নিজ নিজ কার্য্যে যাই চল। গোসাঞিজী কি বলেন?"

বিশ্বরূপ।—হুঁ, সবই তো বড়বাবাজী মশাই ব'লে গেছেন, মাঝখান থেকে সখীজীকে ছুটো কথা ব'লে অপরাধী হলুম আমি।

স্বামীজী।—আচ্ছা, সন্ধ্যের পর দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে ছুখানা গান শুনিয়ে অপরাধ ক্ষালন ক'রে নেওয়া যাবে। জয় গৌরহরি! উঠে পড়।

শুধু মুখের কথায় হয় না, নির্ভরতা চাই

প্রেমিকের স্বভাব বা আচরণ এবং কার্য্যকলাপ সাধারণ বিচারের মাপ-কাঠিতে পরিমাণ করিতে গেলে ভুল করা হইবে। নিজ নিজ গুরুদেবের উপদেশানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া যিনি আপন জীবনকে পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি গৃহস্থই হউন অথবা উদাসীনই হউন সর্ব্বথা জগৎপূজ্য। তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে অতি কলুষিতচিত্ত পাষণ্ডও ধন্য হইয়া যায়।

প্রাণে প্রকৃত ভাবের সঞ্চার হইয়া যে ভাবের প্রকোষ্ঠে সাধককে প্রবেশ করায় অকপটে তাহা স্থায়ী করিবার চেষ্টা করা উচিত। কোনরূপ কপটতা থাকিলে সমধিক অনিষ্ট হয়। অপরের দেখাদেখি কোন আচরণ করা উচিত নয়। মনপ্রাণকে সর্ব্বদা অবরোধের মধ্যে রাখিতে না পারিলে ভাব নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

বড়বাবাজী মহাশয় বলিতেন—"শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপায় যাহার হৃদয়ে

যেরূপ ভাবের বিকাশ হইয়াছে, সর্ব্বদা সেই ভাবকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সঞ্চারী নানারূপ ভাবের বশতাপন্ন হইলে ভাবনিষ্ঠা বা রসনিষ্ঠা থাকে না, সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।"

ভক্তগণের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে দিদি একদিন বলিতেছেন—"শুধু মুখে বললে হবে না ভাই, মুখে বললে হবে না; কাজে দেখানো চাই। অনেকে আছেন অপরের দুঃখে মুখে একটু সহানুভূতি দেখিয়েই মনে করেন যথেষ্ট করলুম। ভাই! তাতে কি দুঃখীর দুঃখ যায়? একজন না খেতে পেয়ে ম'রে যাচ্ছে আর তুমি চর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয় দিয়ে উদর পূর্ত্তি ক'রে আরাম-কেদারায় শুয়ে পান চিবুতে চিবুতে দু-একবার 'আহা' 'উহু' ক'রে মনে করলে, অনশনক্লিষ্টের জন্য কতই না করলাম! এতে কি কিছু করা হ'ল? সত্যি সত্যিই যদি ক্ষুধিতের জন্য তোমার প্রাণ কেঁদে থাকে তা হ'লে কখনই তুমি নিশ্চিন্ত মনে ভাল ভাল ভোজ্যদ্রব্য মুখে তুলতে পারবে না। দুঃখীর দুঃখ অনুভব করতে প্রাণ যখন চাইবে তখনই তুমি কোনদিকে না চেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আত্মহারা ভাবে তাদের মধ্যে।"

"সক্ষম, হৃদয়বান ব্যক্তি নিজে চুপ ক'রে থেকে অপরকে কিছু করবার জন্য প্রথমেই অনুরোধ করেন না। সর্ব্বাগ্রে নিজের যতটুকু সামর্থ্য ততটুকু ক'রে প্রয়োজন হ'লে শেষে অপরের উপর ভার দিয়ে থাকেন। আর একটা কথা; ত্যাগে অভ্যস্ত না হ'লে কৃপার মর্য্যাদা বুঝা যায় না। আজ আমি একটা বিপদে প'ড়ে তাঁর নিকট কাতর প্রার্থনা জানালাম, তিনি বিপদ হ'তে আমাকে উদ্ধার করলেন। এইটাকেই যদি ভগবৎকৃপার পরাকাষ্ঠা মনে করি তা হ'লে মস্ত বড় ভুল করা হবে। এমন সময়ও আসতে পারে যখন প্রার্থনা ক'রেও বিপদ হ'তে পরিত্রাণ পেলাম না, তখন কি আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠবে না? ভাই! রাগ ক'রো না, যথার্থ যে ভক্ত হবে সে সুখে দুঃখে সমানভাবেই তাঁর কৃপা অনুভব ক'রে ধন্য হবে। শ্রীগুরুদেব বলতেন—'তাঁর কৃপা দুই রকমে আসে—এক রকম অনুকূলে, আর এক রকম প্রতিকূলে।"

"এক এক সময় আকস্মিক এমন বিপদ এসে উপস্থিত হয় যে, ধৈর্য্য ধ'রে তা সহ্য করা অসম্ভব মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত নির্ভরশীল ভক্ত ধৈর্য্য হারায় না। সে বলে, এও আমার প্রভুর দান।"

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" গীতার এই বাণী যথার্থ ভক্তেই দেখতে পাওয়া যায়। বিপদের উপর বিপদ; সারা জীবনে একটুও বিপদ-বাত্যার বিরাম হ'ল না, তথাপি ভক্ত অনুমাত্র বিচলিত বা তাঁর করুণায় কোনরূপ সন্দিহান হলেন না।"

ললিতাদিদিকে আমরা দেখিয়াছি, সর্ব্বদাই হাসি মুখে বলিতেন—"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, তাঁর যা ইচ্ছে হবে তিনি করবেন, আমার তাতে বলবার বা আপত্তি করবার কি আছে? আমি তো তাঁর হাতের পুতুল, তিনি যেমন নাচাবেন তেমনি নাচব।"

নিজ ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া জনৈক ভক্ত দিদির নিকট আসিয়া নিজের অবস্থা জানাইয়া দিদিকে বলিলেন—"দিদি! জীবনে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করব এ তো স্বপ্নেও ভাবি নি। জন্মজন্মান্তরের না জানি কত দুষ্কৃতিই আমার আছে! তাঁর নাম নিয়ে প'ড়ে আছি তিনি কি মুখ তুলে চাইবেন না?"

দিদি।—ভাই! তুমি কেন তাঁর উপর দোষ চাপাচ্ছ? সাধুদের মুখে শুনেছি, যার হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের সঞ্চার হয় তার জন্মজন্মান্তরের সকল কর্ম্ম দগ্ধ হ'য়ে যায়। যদি তাইই হয় তবে আর কর্ম্মানুরূপ ফল আসবে কোথা হ'তে! আর ভগবান দুঃখ দিচ্ছেন এ সন্দেহ তোমার মনে হওয়া উচিত নয়। কারণ প্রয়োজন ব্যতীত কেউ কিছু করে না, তোমাকে দুঃখ দেওয়ার মধ্যে ভগবানের কোন প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় কি? তবে যে ভক্তের কাছে দুঃখের প্রকাশ ওটা ভক্তেরই কল্যাণের জন্য জানবে।

আলো এবং অন্ধকার দুটি না থাকলে যেমন দর্শনকার্য্য চলে না সেইরূপ সুখ ও দুঃখ এই দুইটির ভিতর দিয়ে তাঁকে অনুভব করতে না পারলে পরিপূর্ণরূপে তাঁর দর্শন সার্থক হয় না। তিনি যেমন আনন্দস্বরূপ, তেমনিই

তিনি "ভীষণং ভীষণানাং।" কাজেই সুখস্বরূপও যেমন তিনি, দুঃখের মূর্ত্তিটিও যে তাঁর এটি না বুঝলে চলবে কেন?

ভক্তের দুঃখেও বিদ্বেষ নেই, সুখেও অত্যধিক লোলুপতা নেই। ভক্ত প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারে, যে, সুখ দুঃখ দুটি শ্রীভগবানেরই দুটি হাত, তাই কোনটিকেই সে বাদ দিতে পারে না। ভক্ত ভগবানকে ডেকেছে বা এখনও ডাকছে তা ব'লে যারা ডাকে নি বা ডাকছে না তাদের সঙ্গে সুখদুঃখভোগের কোন তফাৎ হবে মনে ক'রো না। তবে অন্যে দুঃখে অধৈর্য্য হ'য়ে পড়ে, আর ভক্ত ধৈর্য্য হারায় না এইটিই ভক্তের বিশেষত্ব।

ভক্ত।—এটি কেমন ক'রে হয় দিদি?

দিদি।—এটি ভক্তের আরাধ্য দেবের শ্রীচরণসেবার ফল জানবে। ভগবান ভক্তকে যে মধুরাদপি মধুর ভক্তিরসের আস্বাদ দিয়েছেন তাতেই সে বিভোর থাকে, অন্য কিছুতেই তার মন যায় না।

ভক্তটি দিদির এই অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"দিদি! আর হাহুতাশ করব না। 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক' এই মহাজন-বাক্য বুকে ধ'রে নাম করতে থাকি।" এই বলিয়া বিদায় লইলেন।

তাঁর সুখই প্রার্থনীয়

দিদি মধ্যে মধ্যে মঠের ছেলেদের শাসন করিয়া বলিতেন—"যাঁর মুখ চেয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেছ তাঁর কিসে সুখ হয় দেখবে না?" বড়বাবাজী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—"উনি হলেন মঠের মালিক, আমরা সকলেই ওঁর সেবক সেবিকা। আমাদের উচিত কিসে মালিকের সুখ হয়, কিসে উনি আনন্দ পান সর্ব্বদা তার চেষ্টা করা।"

ভক্ত ভগবানের কাছে কিছু প্রার্থনা করেন কি না?—এই প্রশ্নের উত্তরে দিদি একদিন বলিয়াছিলেন—"প্রার্থনা করবে না কেন? তবে ভক্ত তোমার

আমার মত টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী, বিষয়ভোগসুখ চায় না। প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন—

নাথ যোনী সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং
তেষু তেম্বচলা ভক্তিরচ্যুতেস্ত সদাত্বয়ি॥"

—আমি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, যেন তোমাতে আমার অচলা বিশ্বাস ভক্তি থাকে। ভক্ত বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করে না। কেউ যদি বলেও তথাপি ভক্ত বলে 'আমার প্রতিটি মুহূর্ত্তের অবস্থিতির জন্য তিনি কত রকমে যত্ন নিচ্ছেন আমি কোন প্রতিদান তার দিতে পারি না— এই কথা স্মরণ হ'লেই আমি লজ্জিত হই, আবার 'এ দাও ও 'দাও' ব'লে প্রার্থনা করব কোন্ মুখে? ভাবুক কবি রজনীকান্ত সেন কি সুন্দর কথা বলেছেন—

আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না ডাকিতে তুমি হৃদয় মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ॥
চির আদরের বিনিময়ে সখা
চির অনাদর পেয়েছ।
আমি দূরে চ'লে যেতে দু'হাত পসারি
ধ'রে কোলে টেনে নিয়েছ॥
'ও-পথে যেও না ফিরে এস' ব'লে
কানে কানে কতই বলেছ।
আমি তবু চ'লে গেছি, ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ॥
এই, চির অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসিমুখে তুমি বয়েছ।

আমার নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে
বুকে ক'রে তুমি রয়েছ ॥"

যখনই দিদির কাছে কেহ কোন প্রশ্ন তুলিয়াছেন তখনই তিনি এই ভাবের সহজ সরল উত্তর দিয়া তাহার সন্দেহভঞ্জন করিয়াছেন। আবার কেহ যদি কোন শাস্ত্রার্থ জানিতে বা ভজনরাজ্যের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তদুপযোগী বাগ্মিতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াছেন। শ্রীমৎ গৌরগোপাল গোস্বামী (গুরুগৌরবানন্দ স্বামী) মহাশয়; হরিবোল কুটীরের শ্রীমৎ হরিদাস বাবাজী প্রভৃতি বহু মনীষী দিদির নিকট হইতে অনেক দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইয়াছেন। এ কথা তাঁহারা অকপটে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। হরিদাস বাবাজী মহাশয় তো অনেক গ্রন্থের টীকা-ব্যাখ্যা দিদির সহিত পরামর্শ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া স্পষ্টই বলিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় খণ্ড শেষে আবেদন

প্রথম খণ্ডের শেষে আবেদনের ন্যায় এই দ্বিতীয় খণ্ডের শেষেও আমি সকলের নিকট বিনীত আবেদন জানাইতেছি যে, ললিতাদিদির সম্বন্ধে যৎসামান্য যাহা এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল ইহা ছাড়াও বহু বিষয় অপ্রকাশিত থাকিল। আমাদের নিকট সংগৃহীত ঘটনাসমূহ যাহা আছে তাহার সহিত আর কিছু যদি কেহ সংগ্রহ করিয়া দেন তাহা হইলে অবিলম্বেই আমরা আর এক খণ্ড প্রকাশ করিতে পারি। তবে সংগ্রাহকের নিকট আমার করযোড়ে বিনীত নিবেদন—যিনি যেটুকু সংগ্রহ করিয়া দিবেন তাহার মূলে যেন এতটুকুও স্বকপোলকল্পিত ঘটনার সংযোজন না হয়। ভাল হউক, মন্দ হউক, সত্য ঘটনাই জানাইবেন। কারণ ললিতাদিদি তাঁহার সুনির্ম্মল জীবনে শ্রীগুরু-কৃপালাভ করিয়া ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত কঠোর সাধনাদ্বারা নিজের

পুরুষাভিমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া, নারীত্বের পূর্ণতম প্রকাশে রূপায়িত করিয়া আরাধ্যদেবের শ্রীচরণকমলে সমর্পণপূর্ব্বক যে অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তির আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে যে কোনরূপ বাক্যালঙ্কার বা নূতন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা আমার মনে হয় না।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে একদিন ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মহোদয় বলিয়াছিলেন—"ললিতা সখী ও রামদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপদারবিন্দে দুটি ফুল্ল চিরপ্রস্ফুট পদ্ম—আপন মাধুর্য্যে, সৌরভে আপনি পূর্ণ ও তাঁদের ফুল্ল বিকাশে জগৎও ধন্য।" ইত্যাদি। এর উপর আমাদের আর বলিবার কি আছে!

দিদির স্বহস্তলিখিত লীলা-তত্ত্বাদিপূর্ণ পত্রের অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব উপদেশাবলী হইতে কিছু কিছু এই দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, যদি কাহারও নিকট এইভাবের বর্ণিত বিষয়যুক্ত কোন কিছু থাকে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইলে আ।ম উহা নকল করিয়া লইয়া মূল কপি প্রেরককে ফেরত পাঠাইতে পারি। ইহা ছাড়া কথা-প্রসঙ্গে দিদির সুযুক্তিপূর্ণ ছোট ছোট উক্তি অনেকের নিকটই সংগ্রহ থাকা সম্ভব। তাঁহারা যাদ সেগুলি আমাদিগকে লিখিয়া পাঠান বা অন্য কোন প্রকারে জানান তাহা হইলে প্রসঙ্গক্রমে সেগুলি প্রকাশেরও সুবিধা হয়।

আলোচনা-প্রসঙ্গে কোন একজন আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন—"দিদির ভজনকথা বাহিরে প্রকাশ না হওয়াই ভাল।" আমি পড়িলাম মহাসমস্যায়। কারণ ঐ-জাতীয় অনেকগুলি নিবন্ধ আমি জীবনীর মধ্যে দিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। শেষে—

"আপন ভজন কথা না কহিবে যথাতথা
আপনারে হবে সাবধান।"

—মহাজনের এই পয়ার স্মরণ করিয়া দিদির ভজনপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা বন্ধ রাখিলাম। ভবিষ্যতে ঐ সকল প্রকাশ করিব কি না এ বিষয়ও পাঠকগণের মতামতের অপেক্ষায় থাকিতে হইল।

ভজন-বিমুখ রিপু-কিঙ্কর উচ্ছৃঙ্খল জীব আমি, আমার এ সকল নিগূঢ় পবিত্র ভজন কথা প্রকাশের বা আলোচনার অধিকার নাই স্বীকার করি; কিন্তু যদি কোন যোগ্য ব্যক্তি এই সকল মধুরাদপি মধুর প্রসঙ্গ আলোচনা করেন, মনে হয় তাহা পাঠে আমার ন্যায় বহু বহির্ম্মুখী জীবনে কোন-না-কোন শুভমুহূর্ত্তে আলোড়ন উঠিতে পারে। জানি না আমার এ ধারণা ঠিক কি না! বিজ্ঞজন-বিবেচ্য বিষয় তাঁহাদের উপরই ছাড়িয়া দিয়া আমি স-সঙ্কোচে অবসর লইলাম।

পরিশেষে পুনরায় করযোড়ে আমার বিনীত নিবেদন—গ্রন্থ-মধ্যে আলোচ্য প্রসঙ্গের কোনরূপ অসামঞ্জস্য বা ভুলত্রুটি প্রকাশ পাইলে আমার উপরই সকল দোষ চাপাইয়া আমারই অযোগ্যতা বলিয়া জানিবেন। মহামহীয়ান সাধকজীবনে যেন কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখিবেন না।

শ্রীরাধারমণচরণ করিয়া স্মরণ।
দিদির সুচরিতকথা করিনু বর্ণন॥
দোষত্রুটি যাহা কিছু গ্রন্থেতে মিলিবে।
মোর শিরে পদদানি সংশোধিয়া লবে॥
নিবেদন করি ধরি সবার চরণ।
দ্বিতীয় খণ্ডের কথা কৈনু সমাপন॥

[দিদির জীবনীর সঙ্গে প্রকাশের জন্য বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপ্রাপ্ত দুইজন ভক্ত (নামপ্রকাশে আপত্তি আছে) দুইটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। আমরা উহা পরেমুদ্রিত করিলাম।]

অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্

চিরানুসৃত নীতির ব্যতিক্রম কদাচিৎ ও কুত্রচিৎ দৃষ্ট এবং সেই ব্যতিক্রমের মধ্যেই অসাধারণত্ব পরিস্ফুট ও তৎপ্রতি সাধারণের বিস্মিতদৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পঙ্কে পদার্পণপূর্ব্বক পদপ্রক্ষালন অপেক্ষা দূরাপসরণই নীতিসম্মত প্রকৃষ্ট পন্থা (প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্)। অতএব দূরাপসরণের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছায় পঙ্কে পদার্পণ জনসাধারণের বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক হওয়া স্বাভাবিক।

তাদৃশ নীতি-ব্যতিক্রম দীন লেখকের ভাগ্যে ইতঃপূর্ব্বে একবারও স্বানুভূতিগম্য হয় নাই। যে শুভক্ষণে সেই ব্যতিক্রম অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত লইল, তাহাই বর্ত্তমান নিবন্ধের মূলসূত্র। মহানুভব পাঠকবর্গের নিকট বিনম্র অনুনয়—তাঁহারা স্বীয় অদোষদর্শিতা গুণে অজ্ঞ লেখকের অযোগ্য লেখনীর দোষত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ অবসান। ভার্সাই সন্ধির আলোচনা চলিতেছে। ইং ১৯১৮ খৃঃ, বৈশাখের এক অপরাহ্ণে ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়স্ক একটি যুবক শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ রাধারমণবাগের (সমাজবাড়ীর) সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান। পশ্চাতে বৃদ্ধা জননী পাগলিনীবেশে দণ্ডায়মানা। যুবকের পরিধানে ছিন্ন-মলিন চীরবসন, রুক্ষকেশ, শীর্ণদেহ। জননীর অবস্থা ততোধিক করুণোদ্দীপক।

কিয়ৎকাল সোপানশ্রেণীর নিম্নে অবস্থানপূর্ব্বক যুবক ভয়বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে বাটীর অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিল। ফটক অতিক্রম করিলেই দক্ষিণে নাটমন্দির ও বামে পুষ্পোদ্যান। প্রথম দৃষ্টিপাতেই যুবকের ভয় ও বিস্ময় ঘনীভূত হইল। নিশ্চয়ই কোন জমিদার বা ধনী লোকের বাড়ী! কিন্তু দারোয়ান বা লোকজন দেখা যায় না কেন? বলা বাহুল্য, ইতঃপূর্ব্বে যুবকের শ্রীধামদর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই। গ্রীষ্মকালে পাঁচটার পূর্ব্বে কোন ঠাকুরবাড়ীতে যে লোক-সমাগম হয় না—এরূপ অভিজ্ঞতা লাভও তাহার ভাগ্যে এই প্রথম।

নাটমন্দিরের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ অলিন্দে উপবিষ্ট জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক যুবকের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতেই বিস্ময়বিহ্বল ভাবে অগ্রসর হইয়া উহার হস্তধারণপূর্ব্বক নিজপার্শ্বে উপবেশন করাইলেন এবং সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়ে তাহার তদবস্থা প্রাপ্তির কারণ অবগত হইলেন। বলা বাহুল্য—চারি বৎসর পূর্ব্বে উভয়ে কলিকাতাস্থ কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

ইং ১৯১৪ সালে আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশের যোগদানের পর অল্পদিনের মধ্যেই জার্ম্মান সাবমেরিন আটলান্টিক তোলপাড় করিয়া ভূমধ্য ও লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া জনরব উঠিল এবং বঙ্গোপসাগরে এমডেনের উৎপাত ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সেই অবস্থায় যুবক "যঃ পলায়তে স জীবতি" এই মহাজনানুমোদিত নীতির অনুসরণ করিল। শিক্ষকতা উপলক্ষে পূর্ণ চারি বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে যাপনপূর্ব্বক যুদ্ধাবসানের পরই প্রত্যাগত, কিন্তু যুদ্ধ-সংক্রান্ত সম্ভাব্য বিপদাশঙ্কা অপগত হইলেও দৈবদুর্ব্বিপাকে বিপর্য্যস্ত। যুবকের দুইটি কনিষ্ঠ সহোদর এক মাসের মধ্যেই ইহলীলা সংবরণ করায় জননী পাগলিনীপ্রায় এবং নিজের অবস্থাও মর্ম্মন্তুদ। গ্রীষ্মাবকাশে হিতৈষী বন্ধু স্বজনগণের পরামর্শে জননীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাদানের জন্য শ্রীধামে আগমন। প্রথমেই শ্রীবাস অঙ্গন ঘাটে অবতরণপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ সমাজবাড়ীর সিংহদ্বারে উপস্থিত।

পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি 'চরিতসুধা'র পাঠকবর্গের সুপরিচিত। নাম—শ্রীযুক্ত (অধুনা নিত্যধামগত) অপরাপ্রসাদ পাল বি. এ.। তাঁহার অমায়িক সহৃদয়তা ও আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ উদার ব্যবহারে কয়েকদিনের মধ্যেই যুবক ও তাহার জননীর দুঃসহ হৃদয়যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে একদিন তিনি কৃপা করিয়া যুবককে সখীমার শ্রীচরণ দর্শন করাইলেন। চরণস্পর্শের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও তিনি স্বীয় অদোষদর্শিতা ও পরমৌদার্য্যগুণে যুবককে সে সৌভাগ্যলাভে কৃতার্থ করিলেন এবং স্বীয় চরণতলে আশ্রয়প্রদানপূর্ব্বক যুবকের ও তাহার জননীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণা কারুণ্যামৃতনিষেকে প্রশমিত করিলেন।

কয়েকদিন পরে একদিন অপরাবাবু যুবকটিকে তাহার দীক্ষা হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক জানাইল যে, যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে একটি ব্রাহ্ম-পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকার্য্যে ও কোন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ব্যারিষ্টার পরিবারে তিনটি বালিকার গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকায় এবং ব্রাহ্মমন্দিরে গমন, উপাসনায় যোগদান, ব্রাহ্মসংসর্গহেতু ব্রাহ্মভাবাপন্ন হওয়ায় এ পর্য্যন্ত সে মন্ত্রদীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নাই। এরূপ আকস্মিক আঘাত না পাইলে গ্রীষ্মাবকাশের পরই তাহার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ভ্রাতৃবিয়োগের পর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন এক গোস্বামী প্রভু অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া সান্ত্বনাপ্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন—

"যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার।
তখনে না হৈল জন্ম, এবে ভেল ভববন্ধ,
মিছামাত্র বহি দেহভার॥"

* * * *

গোস্বামী প্রভুর বচনামৃতপানে যুবকের হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। বিশেষতঃ প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়া তাহার সন্দিগ্ধ হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল।

তং শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্॥

বিষ্ণুশর্ম্মার মতে তথাকথিত নিকৃষ্ট জীবটির ছয়টি গুণের (জ্ঞাতব্যাঃ ষট্‌গুণো গুণাঃ) মধ্যে একটিও সে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। প্রত্যুত প্রভুভক্তিগুণে উক্ত জীবটির শ্রেষ্ঠতাই বহুলাংশে প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং সে স্বীয় উদ্ধার বিষয়ে সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল। এমন সময় শুভাকাঙ্ক্ষী স্বজনগণের সদুপদেশে শ্রীধাম দর্শন।

অপরাবাবু নিবিষ্টচিত্তে যুবকের মর্ম্মবেদনার কাহিনী শ্রবণ করিলেন এবং যথোচিত সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া অষ্টপ্রহর নামসংকীর্ত্তন মহোৎসব উপলক্ষে হুগলীনিবাসী শ্রীযুক্ত নবগোপাল দে মহাশয়ের বাটীতে আসিলেন। সেইখানেই অযাচিতকৃপাকারী অদোষদর্শী শ্রীগুরুদেব তাহাকে নিজগুণে শ্রীচরণের দাসানুদাস করিয়া লইলেন। তিন দিন পরে অপরাবাবু কার্য্যস্থলে গমন করিলেন এবং যুবকটি শ্রীধামে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনরায় সখীমার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর অতীত হইল। চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব্বরাত্রে হতভাগ্য যুবকটি বিষম বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইল। এশিয়াটিক কলেরা—মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা। পরদিন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত যুঝিয়া যুবকের প্রাণবায়ু শূন্যে মিশিয়া গেল। দেহযষ্টি নিস্পন্দ—অসাড়। এ পর্য্যন্ত সখী-মা যুবকের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও লেখকের পঞ্জর নিষ্পেষিত হইয়া যায়। তাহার বর্ণনায় লেখক আত্মসংবরণে অসমর্থ—করুণ আর্ত্তনাদে তাহার মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্নবিচ্ছিন্ন। পাঠক পাঠিকাগণ, ক্ষমা করুন।

মুমূর্ষু অবস্থায় একবার যুবকটি সখীমার চরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজের বুকে হাত বুলাইল। সখীমা কারুণ্যরসপ্লাবনে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারবিমূঢ়-ভাবে 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলিতে বলিতে রাতুল চরণ দুইটি অস্পৃশ্য যুবকটির অশুচি বুকে তুলিয়া দিলেন। কারুণ্যামৃতনিষিক্ত ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যরসের একাধারে আস্বাদন অনুভবী পাঠক-পাঠিকাগণের প্রাণস্পর্শী অনুভূতিসাপেক্ষ। লেখনীমুখে ভাষাদ্বারা তাহার পরিবেশনপ্রয়াস ঔদ্ধত্য বা ধৃষ্টতার নামান্তরমাত্র।

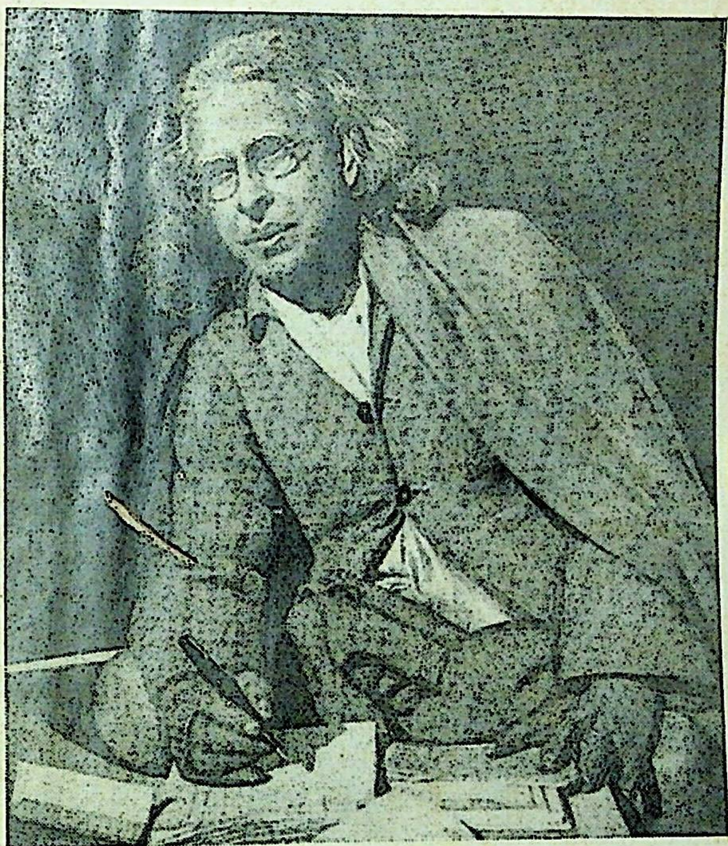
সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই হতভাগ্য যুবকের আয়ুঃসূর্য্য অস্তমিত—দেহযষ্টি নিস্পন্দ। সৎকারের পরিকল্পনা ও সাময়িক আয়োজন যথারীতি ধীরগম্ভীরভাবে চলিতে লাগিল। সখীমা যুবকের শিয়রে নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট। তিনি যেন আজ এ জগতে নাই। হঠাৎ উঠিয়া গ্রহাবিষ্টবৎ ছুটিয়া শ্রীগুরুদেবের সমাধিমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক তর্জ্জনসহকারে আবদার করিতে লাগিলেন—"দেখ, তোমার

ঠাকুরবাড়ী, ঠাকুরসেবা, সবই প'ড়ে থাকবে। আমি তো স্বতন্তরী আছিই—যে দিকে প্রাণ চায় চ'লে যাব। অকালে যমের কবলে ঠেলে দেবার জন্যই কি অপগণ্ডগুলোকে ধ'রে আনা তোমার কাজ? ভাল, তোমার কাজ নিয়ে তুমি থাক। আমি তোমার কে? কেন তুমি আমার কথা শুনবে? আমি তোমার কোন্ কথাটা শুনেছি? তবে তুমিই বা শুনবে কেন?…ইত্যাদি।"

তর্জ্জনমিশ্রিত আবদার! কোন্ রাজ্যের কথা? যাঁহার অনুভূতি আছে, তাঁহারই প্রাণ আন্দোলিত বিচলিত করিবে। নির্ম্মম লেখক কিন্তু অবিচলিত। পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমঃ। সারমেয় কেমন করিয়া অমৃতের স্বাদ বুঝিবে?

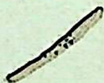
পরমগুরুদেব বড়বাবাজী মহারাজের শুভ জন্মোৎসব দিবস। অনুষ্ঠানের আয়োজন যথারীতি চলিতেছে। কিন্তু এই শুভানুষ্ঠানের প্রত্যেকটি ক্রিয়ায় যাঁহার প্রাণভরা প্রীতির অভিব্যক্তি পরিস্ফুট, শ্রীগুরু-সর্ব্বস্ব সেই সখীমার আজ তীব্র ঔদাসীন্য দর্শনে আশ্রমবাসীগণ ও উৎসব-দর্শনার্থীরা স্তব্ধ, নিরুৎসাহ, নিরানন্দ ও বিস্ময়বিহ্বল। কাহারও মুখে হাসি নাই—প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি কথাও কাহারও মুখে নাই। এ হেন আনন্দের দিনে আশ্রমের রেণু-পরমাণুটি পর্য্যন্ত যেন নিবিড় নিরুৎসাহতার করাল ছায়াপাতে বীভৎসরূপ ধারণ করিয়াছে।

দিবাবসান। সান্ধ্য অন্ধকার আশ্রমের বিষাদান্ধকার নিবিড়তর করিয়া তুলিল। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর হইতে এ পর্য্যন্ত সখীমা এক মুহূর্ত্তের জন্যও সেই নগণ্য যুবকটির সান্নিধ্য ত্যাগ করেন নাই—এমন কি, শরীরযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী ক্রিয়াগুলিও অন্তর্হিত। যুবকের জন্য এ পর্য্যন্ত যাহা তিনি করিয়াছেন, তাহা লিখিতে লেখকের অশুচি করস্পর্শে কলুষিত লেখনী সঙ্কুচিত—কুণ্ঠিত। হায়! জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত অশ্রুধারায়ও লেখকের মর্ম্মবেদনা প্রশমিত হইবে না। দীনাধম লেখক দীনেশের শ্রীচরণ শিরে ও শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে ক্ষমাভিক্ষা চায়। ঔদার্য্য ও অদোষদর্শিতার বহু নিদর্শন ও প্রমাণ আপনারা পাঠ ও শ্রবণ করিয়াছেন, লেখকও সে



লিখন-রত গ্রন্থকার





বিষয়ে অভিজ্ঞ না হইলেও নিতান্ত অজ্ঞ নয়। কিন্তু আজ সে প্রত্যক্ষভাবে যাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিল, প্রাকৃতজগতে তাহার তুলনা নাই—যাহার তুলনা তাহারই ঠাঁই।

মধ্যে মধ্যে এক-একটি সেবক আসিয়া অনুষ্ঠানের বিধিব্যবস্থা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু সথীমা ঔদাসীন্যপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে নিরস্ত করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে 'জয় গুরু', 'জয় গুরু' শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ এ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে শোনা যায় নাই।

ক্ষণকাল পরে সমাধিমন্দির হইতে বাহির হইয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে পুনরায় ছুটিয়া চলিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী জনতার প্রতি দৃক্‌পাত নাই—আনুষ্ঠানিক আয়োজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, ওষ্ঠাধরের ঈষৎ স্পন্দন দ্বারা অনুমেয় অশ্রুত অস্পষ্ট স্বরে যেন কি বলিতেছেন। পুনরায় যথাস্থানে অর্থাৎ যুবকের শিয়রে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার তৎকালীন অনির্ব্বচনীয় ভাবমাধুর্য্য প্রত্যক্ষদর্শী ও অনুভবী ভাবুক প্রাণে প্রাণে উপভোগ করুন। সে মাধুর্য্য পরিবেশনে অধম লেখকের অযোগ্য লেখনী মূক-মৌনী।

নীরব নিথর! প্রকৃতিদেবীও যেন আজ মৌনগাম্ভীর্য্যে আত্মহারা! মধ্যে মধ্যে মৃদুমন্দস্বরে 'জয় গুরু', 'জয় গুরু' শব্দমাত্র সথীমার শ্রীমুখে উচ্চারিত ও শ্রুতিগোচর হইতেছে। অনুমান, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে যুবকের বক্ষে ঈষৎ স্পন্দন ও নাসিকায় শ্বাসবায়ুর সঞ্চার অনুভূত হইল। পাঠকপাঠিকাগণ! দীনাতিদীন লেখক অবনতশিরে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। যাঁহার স্মরণে হৃদ্‌গ্রন্থি শতধাবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অবোধ লেখক কেমন করিয়া সেই কল্পনাতীত, ধারণাতীত, স্বপ্নাতীত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিবে! কি ভাবে মৃতদেহে জীবনসঞ্চার হইল, তাহা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সঞ্চারকই জানেন।

যাঁহার পূতচরণস্পর্শে ধরিত্রীদেবীর বসুন্ধরা নাম অন্বর্থ, তাঁহার সুমধুর মাহাত্ম্যসুধা পরিবেষণস্পর্দ্ধী, ধরিত্রীর সর্ব্বংসহা নামের সার্থকতাসাধক যে নিকৃষ্ট যুবকটির করুণ কাহিনী অপরিহার্য্যরূপে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় "অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্"

নীতির অনুসরণ করিতে হইল, সেই জঘন্য ঘৃণ্য জীবটি আকারে দ্বিপদ, কিন্তু আচারে চতুষ্পদবৎ অদ্যাপিও জীবজগতে বিচরণশীল। স্বতন্ত্রতাদোষে দোর্দ্দণ্ড কলির প্রচণ্ড নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত-মর্ম্মগ্রন্থি, ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট, দুর্দ্দৈবকবলিত সেই জীবটির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট, করুণাময় শ্রীগুরুদেবের 'মাভৈঃ' বাণী স্বর্দুন্দুভি-রবের ন্যায় অদ্যাপিও তাহার হৃদয়ে আশার শিহরণ জাগাইয়া দেয়।

ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও কারুণ্যের সেই মূর্ত্তপ্রতীক আজ প্রাকৃত চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াও শান্তিসুধা বর্ষণে জীবের পাপতাপ হরণ করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত 'জয় গুরু' শব্দটি আমাদের হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলুক। জয় গুরু! জয় গুরু! জয় গুরু!!

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতস্য
কস্যচিৎ

শ্রীগুরুস্বরূপ*

"জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি॥"
"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদ্ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"
"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে "শ্রীগুরুস্বরূপ" নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। তথাপি আমাদের প্রাণে শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে অনন্ত সন্দেহ জাগে। সে সন্দেহ

* যদিও লেখক খোলাখুলি ভাবে ললিতাদিদির নাম লেখার মধ্যে প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু দিদির উপদেশ ও মনোভাব লেখার মধ্যে পরিস্ফুটভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে।

নিরসন মানসে কতজন নিতান্ত বিপন্নের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়াও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। কোথাও শুনিতে পান শ্রীগুরু সাক্ষাৎ শ্রীনন্দনন্দন। শ্রীভগবান আবার নিজ শ্রীমুখে নির্দ্দেশ দিয়াছেন "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"—আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীগুরুরূপে আমাকেই জানিবে। "ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত নাবমন্যেত কর্হিচিৎ"—প্রাকৃত বুদ্ধিতে কখন অবমাননা করিবে না। সন্দেহ তথাপি থাকিয়াই যাইতেছে। কি সে সন্দেহ? সে সন্দেহ এই যে, শ্রীগুরুদেবকে যখনই শ্রীকৃষ্ণসেবার সম্ভার সজ্জিত করিয়া আরাধনা করিতে যাই তখনই তাঁহার প্রসন্নতা লাভের পরিবর্ত্তে, অপ্রসন্নতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে বড়ই দুঃখের উদ্ভব হয়। সেবা অর্থে সুখী করা। ঋষিবাক্যে এবং শ্রীভগবদ্‌মুখের বাণী অনুসারে সেবা করিতে যাইয়া দেখি, সুখী হওয়া তো দূরের কথা, দারুণ দুঃখে তাঁহার হৃদয়খানি ভরিয়া উঠে। দুশ্চিন্তিত হইয়া ভাবি, কি অন্যায় করিতেছি। শাস্ত্রবাক্য তো আমার শ্রীগুরুদেবের অবিদিত নহে। তবে কেন তদুচিত আচরণ করিতে যাইলে আমার প্রতি দুঃখ প্রকাশ করেন? অযাচিত করুণার অভিসিঞ্চনে প্রাণে জাগে—ওঃ, অন্যায় তো বটেই, সমস্ত শাস্ত্রযুক্তিতে তিনি সাক্ষাৎ হরি বটেন—কিন্তু আরও কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা হইতেছে— "প্রভোর্যঃ প্রিয়ঃ" "মুকুন্দ প্রেষ্ঠত্বে স্মর গুরুবরং" "ন তু মুকুন্দত্বে," ইহা দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে নিষেধ হইতেছে। প্রভুর প্রিয়তম শ্রীগুরুমূর্ত্তি। অতএব দেখা যাইতেছে শ্রীগুরুস্বরূপ যদিও শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ, তথাপি শ্রীগুরুস্বরূপে এমন অধিক কিছু আছে, যে কারণে শ্রীকৃষ্ণের নিজস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীগুরুস্বরূপে প্রিয়তা অধিকতর। সেই কারণটি এখন আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

শ্রীগুরু শব্দের স্বাভাবিক অর্থ—কোন সময়ে কখনও তিনি লঘু নহেন। যদি কখন গুরু এবং কখন লঘু হয়েন, তাহা হইলে স্বরূপের নিত্যত্ব বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু তিনি নিত্যবিদ্যমান। অতএব কখনও লঘু নহেন। লঘু নহেন—অর্থে গুরু ভিন্ন অন্য কোন স্বরূপের নিবারক। শ্রীকৃষ্ণনাম যেমন

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ভিন্ন অন্য কোন স্বরূপের নির্দ্দেশক নহেন, শ্রীগুরুনামও তেমনি শ্রীগুরুমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন মূর্ত্তিনির্দ্দেশে আপত্তিকারী। হয়তো আমাদের ধারণা হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণেরই যখন শ্রীগুরুস্বরূপ, তখন ইহাতে এমন কি গোলযোগের আশঙ্কা! কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহা কত বড় একটি মহৎ ভুল তাহা নির্ণয় করা যাইবে।

প্রথমতঃ শ্রীগুরুসেবা করা শ্রীগুরুপদাশ্রিত জনের একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু শাস্ত্রনির্দ্দেশে তাঁহার সেবা করিতে যাইলে প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। দেবতার সন্তোষলাভের জন্য তাঁহার পূজা, সন্তোষলাভ না হইলে সহজেই বুঝা উচিত যে, দেবতার উপযুক্ত পদ্ধতিতে পূজা হইতেছে না। সুতরাং প্রসন্নতা লাভ হইবে কিরূপে? তবে ত্রুটি কোন্‌খানে দেখা প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেবের আচরণ লক্ষ্য করিতে গেলে দেখা যায় যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অসীম রসমাধুরী আস্বাদনে নিরন্তর বিভোর, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার নাম, রূপ, গুণ ও লীলামাধুরী আস্বাদনলোভে যখন লোভী হইয়া উঠেন সেই মহামাধুর্য্যময় স্বরূপই শ্রীগুরুনামে অভিহিত হন। শ্রীগুরুস্বরূপ রসস্বরূপকে অশেষ বিশেষে আস্বাদন করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আস্বাদন করাইতেও সামর্থ্যবান। পরিপূর্ণ আস্বাদনেও আবার অভাব জাগে, সে অভাব পূর্ত্তির আশায় বিতরণ বা আস্বাদন করানো।

"রসরত্নখনি তবু কাঙ্গাল রসের" এই অবস্থারই কথা। একদিন শ্রীবাবাজী মহাশয় শ্রীরূপগোস্বামীপ্রভুর সূচক কীর্ত্তনকালে বলিলেন—"নৈলে ভোগ পূর্ণ হয় না, না বিলালে জনা জনা।"

এখন একটি কথা আসিয়া পড়ে—শ্রীকৃষ্ণ নিজের অখিল-রসামৃতাস্বাদে আহ্লাদিত শ্রীরাধার স্বরূপ দেখিয়া যখন বুঝিলেন যে, বিন্দুমাত্র সুখবাঞ্ছারহিত হইয়াও আমা অপেক্ষা শ্রীরাধা কোটীগুণ সুখী, তখন তাঁহার প্রাণে ক্ষোভের উদয় হইল। ক্ষোভ কেন? সুখভোগ ইচ্ছা কৃষ্ণের যেমন অসীম, ভোগের উপাদানও তেমনি অনন্ত,—ক্ষুধা যত, খাদ্যও তদুপযুক্ত। কিন্তু শ্রীরাধা

যে-জাতীয় ক্ষুধার্ত্ত এবং যে-জাতীয় খাদ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেন—কৃষ্ণের তাহা একান্ত অভাব। যে সুখসম্পদে শ্রীরাধা সমৃদ্ধশালিনী, কৃষ্ণ তাহার একান্ত কাঙ্গাল। শ্রীরাধার সম্পদে লুব্ধ-মানস, শ্রীকৃষ্ণ কত চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে না পারিয়া অবশেষে বেদের প্রতিপাদ্য সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, জগতের একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ন পারয়েঽহং"। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদি কাহাকেও গুরুত্বের আসন প্রদান করেন তাহা হইলে তাঁহার গুরুত্ব অবিচারে সিদ্ধ। কারণ সেই ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতেই সকলের দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারিত ও স্বীকৃত। সকলের বলিতে শুধু জীবগণ কর্ত্তৃক বুঝিলে চলিবে না। ব্রহ্মা, শিবাদি কর্ত্তৃকও নির্দ্ধারিত এবং স্বীকৃত। "শিব বিরিঞ্চি নূতম্।"

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" শ্রেষ্ঠ দেবতা বা পরদেবতা, কৃষ্ণ গুরুত্বের আসন প্রদান করিলেন শ্রীরাধা ঠাকুরাণীকে। তাই তিনি পরাঠাকুরাণী, তাই না তিনি গরবিণী। ইহা অপেক্ষা গৌরবের আর অধিক কি হইতে পারে? শ্রীরাধার নিকট সুখভোগের কৌশল শিক্ষা করিবার অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে গুরু স্বীকার করিয়া বলিলেন—

"রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানানৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥"

তাহা হইলে মূল গুরুতত্ত্ব শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। কিন্তু আমরা যে মহাজনের বাক্যে শ্রবণ করি—শ্রীগুরুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ? অতএব পূর্ব্ববাক্যের সামঞ্জস্য কেমন করিয়া রক্ষা হয়? তদুত্তরে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর সকল সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন—

"নিতাই, রাধার সমান কৃষ্ণে করে মান
সতত থাকয়ে সঙ্গে।
নিশিদিশি নাই ফিরয়ে সদাই
কৃষ্ণকথা রসরঙ্গে॥

বসি বামপাশে মৃদু মৃদু হাসে
প্রাণনাথ বলি ডাকে।
রাধার যেমন মনের বাসনা
তেমতি করিয়া থাকে ॥”

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ এবং শ্রীরাধা ঠাকুরাণী মহাজনের বাক্যে অভিন্ন। অতএব শ্রীনিত্যানন্দরাধা-অভিন্নতায় গুরুতত্ত্বের মূলস্বরূপ। শ্রীগুরুলীলা সকল লীলার (ব্রজ এবং নদীয়া) আশ্রয়। শ্রীগুরুস্বরূপ আস্বাদন-সুখে বিহার না করিলে লীলা রক্ষা হয় কি প্রকারে? আর লীলার নিত্যত্ব অনুযায়ী শ্রীগুরুস্বরূপও ত্রিকালসত্য এবং নিত্য বলিয়া স্বীকৃত।

অতএব শ্রীগুরুস্বরূপ আস্বাদনে বিভোর শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। সর্ব্বেশ্বর প্রভু হইয়াও একান্ত দাস-অভিমানে দীনহীন। সর্ব্বশক্তির আকর হইয়াও কেমন মুখাপেক্ষী। গৌরবের সকল সম্ভার সত্ত্বেও কেমন কাঙ্গাল—“তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত।” তাই দেখা যায় মাধুর্য্যের আস্বাদনশূন্য কিংবা বিন্দুমাত্রও বাধক এবং গৌরবের গন্ধে পূর্ণ কিংবা কিঞ্চিন্মাত্রও স্পৃষ্ট, আরতি, সেবা, শয়ন, ভোজন প্রভৃতি যাহাই কেন হউক না,—তাঁহার প্রীতির কারণ না হইয়া অপ্রীতির কারণই হয়—যাহার যাহা খাদ্য তাহা না পাইলে তৃপ্ত হয় না, আর তৃপ্তি না হইলে সন্তোষের জন্মই হয় না।

আর এক কথা, শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র ঐশ্বর্য্যের এককণা উপভোগ করিবারও সাধ্য জীবের ক্ষমতায় কুলায় না। জীবের আধার এমন নাই যে, কৃষ্ণবিষয়ক কোন সম্পর্কের স্পর্শ সে করিতে পারে। শ্রীমুখে একদিন বাবাজী মহাশয় বলিয়াছিলেন, “বড় বড় কথা ক’স্ নি। আমি যদি বেশ্যার কাঁধে হাত দিয়া চলি কেউ আমাকে গ্রহণ করতে পারে?” বাস্তবিকই দুর্ব্বল জীব আমরা, আমাদের কতটুকুই বা সামর্থ্য! শ্রীগুরুস্বরূপে যদি কৃষ্ণস্বভাবের প্রকাশ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে গুরুনিষ্ঠা রক্ষা হওয়া একান্ত অসম্ভব।

সেই কারণে নিজ ঐশ্বর্য্য সকল আচ্ছাদন করিয়া, জৈবস্বভাবে গ্রহণের অনুরূপ স্বভাব গ্রহণ করিয়া জীবজগতে অতি সাধারণ একজন জীবেরই মত বিচরণ করেন, ইহাই তাঁহার পরম করুণার নিদর্শন অথবা সর্ব্বাধিক ঐশ্বর্য্য। নিজ শক্তিসমূহ আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করা যে মহাশক্তিমত্তার প্রয়োজন, তাহাতেও গুরুতত্ত্বের গৌরব যে কতখানি তাহা অনুভবসাপেক্ষ্য।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মাধুর্য্য নিজ বুদ্ধি এবং বিচারশক্তিতে ব্রহ্মাও অনুভব করিতে পারেন নাই। পরীক্ষা করিতে গিয়া যে বিড়ম্বনায় পড়িয়াছিলেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে গো-বৎস-হরণ-লীলায় সুস্পষ্ট। সেই কৃষ্ণেরও আবার শ্রীগুরুস্বরূপে দীনতামণ্ডিত লালসাযুত বিহার কত যে রহস্যাবৃত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এ সমস্ত বিষয় ভাবিতে হইলে সতত এই কথাই মনে জাগে যে, তাঁহার করুণাই তাঁহাকে বুঝিবার একমাত্র উপায়।

দুর্গত কলিহত জীবসমূহকে নিজ আস্বাদ্য বা ভোগ্য সুখসম্ভারে সমৃদ্ধ করিতে যে শক্তি যাহা কৃষ্ণের নাই—নাই বলিয়াই, যে স্বরূপের দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হয়, সে স্বরূপ এত প্রিয় হইয়াছে। কারণ কৃষ্ণের ইহা একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা যে, তাঁহার ভোগ্য সুখ জীবনিচয় ভোগ করুক। তাহাতে তাঁহার মহাসুখ। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে নিতাইকে বলিলেন, "আমার বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর, নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব ভর।" এত সাধে যে স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন এবং মধুর লীলা করিয়া জীবের সম্মুখে বিহার করিতেছেন, তাঁহাকে তাঁহার যোগ্য পূজোপহার প্রদানই প্রকৃত সেবা। যাহা কামনা করিতেছেন তদনুকূল ব্যবহার করাই কি প্রকৃত সুখ দেওয়া নয়? যদি সে শক্তি আমাদের না থাকে, তাহা হইলে কাতরে তাঁহার শ্রীচরণে কাঁদিয়া প্রার্থনা করিব, অযোগ্যতার দুঃখে; কিন্তু আমি যোগ্য সেবা করিতেছি বলিয়া যদি অভিমানে মত্ত হই কিংবা আমার যোগ্যতার সংবাদ কাহাকেও দিতে যাই, তাহা কি প্রকৃত সেবকের ধর্ম্ম হইবে? যত সহজে আমরা গ্রহণ করিতে পারি তিনি এমনই হইয়া আসিলেন, আর আমি যদি দূরে ঠেলিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষাকে যথার্থ পূজা বলিতে চাই, তাহাতে

কেন তিনি সন্তুষ্ট হইবেন? মধুর দেবতার মধুর উৎসবে বিরুদ্ধ রসের স্পর্শ কেন করাইব?

শ্রীগুরুস্বরূপ স্বমাধুর্য্যে এমন উজ্জ্বল যে, ঐশ্বর্য্যের বা আড়ম্বরের বিন্দুমাত্র স্পর্শও সে স্বরূপকে মলিন করিয়া দেয়। অনাড়ম্বরই যাঁহার অমূল্য ভূষণ, তাহাতে সজ্জিত দেখিয়া সুখী হইতে পারি না, সুখী হইতে চাহি না,—নানা ঐশ্বর্য্যে সাজাইতে সাধ হয় যে কেন, কি জানি! চিরহাস্য মধুরোজ্জ্বল স্বরূপকে বিষাদে মলিন করি, একবার ভাবিয়া দেখি না যে, শ্রীগুরুসুখ এবং আত্মসুখে কত পার্থক্য? আমার সুখ যাহাতে হইবে তাহার নাম গুরুসেবা হইবে কি? শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি দিলেই মনে হয়, আমারই কাম-প্রবৃত্তি যখন স্থূলভাবে প্রকাশ ছিল তখন তাহাকে চেনা যাইতেছিল, এখন চতুরতা করিয়া এমন আত্মগোপন করিয়া মিষ্ট হইয়াছে যে আর ধরা কঠিন। কাহারও নয়নপথে না পড়িলেও, একজন যিনি আমার একমাত্র হিতকারী, আমাকে অধিক দান করিয়া ধনী করিতে সদাই যাঁহার অভিলাষ, সেই পরম করুণার খনি, ব্যথাভরা প্রাণে পূজা গ্রহণ করেন—আমার ব্যথা লাগিবে গ্রহণ না করিলে তাই; কিন্তু রুষ্ট হইয়া জানাইয়াও দেন যে, ইহা তাঁহার পূজা হইতেছে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই অবস্থায়ও তিনি আমাকে পালন করিতেছেন আমার সুখের সহায় হইয়া, কিন্তু আমার সেবায় নিজে সুখী হইয়া নহে।

"আত্মসুখ ইচ্ছা যাতে তারে বলি কাম।"

আর ইহার বিপরীত, অর্থাৎ আত্মসুখরহিত অবস্থা প্রেম। আমার চিত্তকে কলুষিত করে যে কামনা, যাহা জগতে আমাকে কত প্রকারে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা করিতেছে, এমনই করুণাময় শ্রীগুরুদেব সেই কলুষতাও নিজে গ্রহণ করিয়া আমাকে আদরচন্দন ও গৌরবমাল্যে ভূষিত করিতেছেন। লোকে আদর করে আমি গুরুসেবক! হায় কামনা—তোমার এত কুহক, আর হা করুণাময় তোমার এত স্নেহ! শ্রীগুরুসেবার নামে আত্মসেবা করিয়া জগতে কত লাভ পূজা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করি; কিন্তু একবার চাহিয়া দেখিতেছি

না। যাঁহার জন্য আমার আত্মগৌরব তিনি আমার নিকট কিসের প্রত্যাশী।

প্রকৃত পথের সন্ধান না পাইয়া আমরা অন্ধের ন্যায় হইয়া পড়ি। শ্রীগুরুদেবের আচরণ সকল শুদ্ধভক্তিপথে চলিবার পরম সহায় বা অবলম্বন। তাহা গ্রহণ না করিলে ভক্তিপথে চলা যাইবে না—লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার দাস হইয়া দুঃখসাগরে ডুবিতে হইবে।

তিনি তাঁহার আচার্য্যকে যে ভাবে সুখী করিয়াছেন তাহাই একমাত্র নির্ম্মল পথ, তদ্ভিন্ন আর যত কিছুই যুক্তিজাল শাস্ত্রসাহায্যে বিস্তার করিতে যাইব ততই প্রকৃত পথ হইতে দূরে সরিয়া যাইব। শাস্ত্র এমন রহস্যময় যে, তাহা সকল মতের পোষণ করিতে সাহায্য করে, কিন্তু প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া একেবারে সহজ নহে বলিয়া "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" বলা হইয়াছে। যে গুহায় নিহিত, তাহা শ্রীগুরুস্বরূপের আচরণসমূহ। সে আচরণসমূহ স্থিরচিত্তে লক্ষ্য করিতে না পারিলে আলোকের সন্ধান পাওয়া বা প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়না। আমার আত্মগৌরব আমাকে অন্ধ করিয়া দেয়, অভিমানে সব ভুলাইয়া দেয়, প্রকৃত পথ দেখিতে দেয় না। প্রকৃত পথ দেখিতে পাইলে, সে পথে চলিবার আনন্দ এমন লোভনীয় যে, আর অন্য কিছু হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে না। সুবিমল পথের সন্ধান পাইতে না চাহিয়া কেবল যে অন্ধকারে ঘুরিয়া দুঃখ পাইব, ইহাতে সেই করুণাময় ব্যথা পাইতে থাকেন। তাঁহার করুণ স্বরূপের প্রতি আমার যথার্থ আচরণ তাঁহার যত প্রয়োজন আমার প্রয়োজন তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী। তাঁহাকে যথার্থ পূজা করিবে এমন ব্যক্তির অভাব নাই; আমার পূজা না পাইলে তিনি অভাবগ্রস্ত হইবেন না, কিন্তু আমার জন্য তাঁহার এত প্রকার ব্যবহার, এত মধুর স্বভাবে বিহার!

আমি চাহি ঐশ্বর্য্য, অনাড়ম্বর আমার বুকে পূর্ণ আনন্দ দিতে পারে না। শ্রীগুরুস্বরূপে ঐশ্বর্য্যের বেশভূষা ও আচরণ করিলে তিনি যে কত দুঃখ পান তাহা কৃপা করিয়া দেখাইয়াছেন। সে কৃপা আমাকে সূক্ষ্মভাবে প্রতিক্ষণে

জানাইতেছে যে, এই পথে আমারই দুর্ব্বলতা বা অযোগ্যতা প্রকাশ পাইতেছে। আমার শ্রীগুরুস্বরূপকে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইতে যাই—আমার মনোবৃত্তির অনুরোধে, শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাতে নহে। আমার শ্রীগুরু এত বড় মহান্ ব্যক্তি এই কথা বলিতে এবং বলাইতে গৌরব, বোধ করি ইহাই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয় বা কাম্য। কিন্তু সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকিবে সেই শ্রীমুখের প্রসন্নতায় আর সতর্ক দৃষ্টি থাকিবে নিজ হৃদয়ের প্রতি। সুখে ও আনন্দে বুক যে ভরিয়া উঠে, তাহা কি প্রসন্নোজ্জ্বল গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিয়া না নিজসুখে তাহা সাবধানে দেখিতে হইবে। সেবকের নিজের প্রতি দৃষ্টি একেবারেই থাকিবে না, সেব্যের সুখদুঃখই নিজ সুখদুঃখ হইবে। কই, এ অবস্থা কি আমাদের হয়? শ্রীগুরুদেবের যাহা ভাল লাগে, আমার তাহা ভাল লাগে কই? আমার যাহা ভাল লাগে তাহাতে আমি মত্ত, তাঁহার সহিত সম্পর্কের কি এই লক্ষণ? অথচ তাঁহার পরিচয় দিতে আমার কত আগ্রহ। আমি "তাঁহার"—এ পরিচয় আমি কেন দিব? সে যোগ্যতা কি আমার আছে? পরিচয় না দিবার চেষ্টা শত থাকিলেও অনায়াসে যে পরিচয় প্রকাশ হইবে তাহাতেই তাঁহার সুখ, এই পথই নির্ম্মল পথ, কিন্তু কঠিন। কঠিন এইজন্য যে, এখানে আত্মপ্রকাশের গন্ধ নাই। আমার শ্রীগুরুস্বরূপের প্রতি আমার যে সকল ব্যবহার তাহা আত্মসুখপূর্ণ, ইহা কিন্তু তাঁহার ভোগ্য নহে। আমি কোথায় তাঁহার ভোগ্য হইব, তাহা না হইয়া বিপরীত লক্ষণ দেখা দিতেছে—তাঁহাকে আমি ভোগ্য করিয়াছি, করিতে চাহিতেছি, করিতে না পারিলে কত চেষ্টা করিতেছি, চেষ্টার বিফলতায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া যাই, তার পর বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশের পর যাহা হইবার তাহা হয়। কিন্তু সে করুণ-দৃষ্টি বিনাশ হইতে দেয় না, জীবিত রাখিয়াই রোগের উপশম করেন, ইহাই তাঁহার অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য। একবার বলিয়াছিলেন, "কোন সভা-সমিতিতে তোমরা কেউ যাও, এ আমার ভাল লাগে না।" শুনিয়া মনে হইয়াছিল, এ কথা কেন বলিলেন? কিন্তু আজিকার এই ঘোর অন্ধকারে সে কথার গুরুত্ব বেশ প্রকাশ পাইতেছে। একটু আনন্দের আশায় কোথাও ছুটিয়া যাই কিন্তু পরিবর্ত্তে বুকভরা দুঃখ লইয়া ফিরিয়া আসি। মুখের দিকে চাহিয়া বলি—ওগো, হাত ধর, অন্ধকারে পথহারা আমি, কিছু যে আর দেখিতে পাইতেছি না, অন্ধকার—কেবলই অন্ধকার, হাত ছাড়িও না, ধর—ধর। জয় শ্রীগুরু!

শ্রীগুরুসেবাভিখারী কাঙ্গাল

শ্রীচরিতসুধা একত্রে ৬ খণ্ড	১০৲
" এক এক খণ্ড	২৲
সাধককণ্ঠমালা বাঁধান	২৸০
" অবাঁধাই	২।০
শ্রীপ্রেমসহচরী	২৲
শ্রীসঙ্গীতমাধবম্	৩৲
শ্রীচরিতমাধুরী, ১ম খণ্ড	৩৲

(শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত)

প্রাপ্তিস্থান :

বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী

পোঃ আলমবাজার, কলিকাতা-৩৫

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত

শ্রীশ্রীললিতা সখী (পূর্ব্বাশ্রম-কাহিনী)	২৲
" " " (সখী-জীবন-কাহিনী)	২॥০
" " " দুই খণ্ড একত্রে	৪৲
প্রেমানন্দ সংবাদ	॥০
প্রাণের কথা	।০
কীর্ত্তন-গীতি-সংগ্রহ (পরিবর্দ্ধিত আকারে তৃতীয় সংস্করণ)	২॥০

সমস্ত পুস্তকেরই ডাকমাশুল পৃথক

ভিঃ পিতে পাঠান হয় না

প্রাপ্তিস্থান :

মাশিলা "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, জেলা হাওড়া

ও

বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী

এবং

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়